

স্বদেশসেবক অশ্বিনীকুমার

(মুখপত্র)

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার

বৌদ্ধভারত, বুদ্ধের জীবন ও বাণী, শিখগুরু ও শিখজাতি প্রভৃতি

গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীশরৎকুমার রায় প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

প্রাপ্তিস্থান—

চক্রবর্ত্তী চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্,

১৫, কলেজস্কোয়ার,

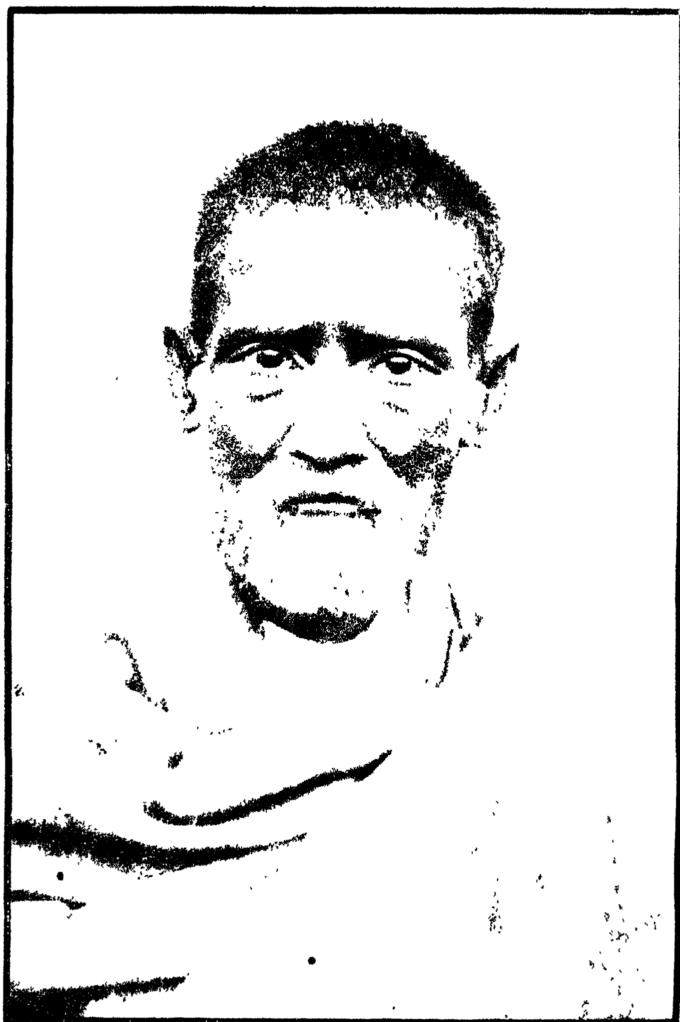
কলিকাতা

১৩৩৭ .

মূল্য দেড়টাকা মাত্র

গ্রন্থকারকর্ত্তৃক প্রকাশিত
৩৬।৪।৩, বেণেটোলা লেন,
কলিকাতা

প্রিণ্টার—শ্রীপঞ্চানন দাস,
সত্যনারায়ণ প্রেস,
২৫, দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট, কলিকাতা



চিরকুমার নিষ্কলঙ্কচরিত্র

স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার রায়

উৎসর্গ

যিনি শৈশবে আমাদের মাতৃহীন, নারীশূন্য পরিবারে মাতার
কর্ত্তব্যপালন করিতেন, যাঁহার দেওয়া অন্নে, যাঁহার সরল
স্নেহে আমার শরীর ও মন পুষ্ট হইত, আমার সেই
নিষ্কলঙ্কচরিত্র চিরকুমার সহোদর স্বর্গীয়
অশ্বিনীকুমার রায় মহাশয়ের নামে
শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে এই ভক্ত-
চরিত গ্রন্থখানি উৎসর্গ
করা হইল।

ত্রয়োদশী তিথি,
১০ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৩,
কলিকাতা

প্রণত
শ্রীশরৎকুমার রায়

বিষয়সূচী

চিত্রসূচী

নিবেদন

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় পরম ভক্ত ও মহাপ্রেমিক ছিলেন। শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি যে-সমস্ত কার্য্য করিয়াছিলেন সেই সকলের মূলে ছিল মানবপ্রীতি। এই প্রেমিক মহাত্মার অযাচিত প্রচুর স্নেহ ও পুণ্যসঙ্গ লাভ করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া আমি নিজেকে ভাগ্যবান্ বলিয়া মনে করি। ১৮৯৩ অব্দের জানুয়ারী হইতে ১৯০৬ অব্দের ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ চৌদ্দবৎসর আমি বরিশালে ছিলাম। অশ্বিনীকুমার আমার শিক্ষক, গুরু ও পিতৃস্থানীয় ছিলেন। তাঁহার মুখে তাঁহার জীবনকথা শুনিবার এবং তাঁহার জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ আমার ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। এই কারণেই স্বীয় অযোগ্যতা বিস্মৃত হইয়া এই মহাত্মার জীবনীরচনায় আমি সাহসী হইয়াছি। এই পুস্তকপ্রণয়নে আমি ডাক্তার শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ সেন প্রণীত "অশ্বিনীকুমার দত্ত," শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের "চরিতকথা," শ্রীযুত প্রিয়নাথ গুহ প্রণীত "যজ্ঞভঙ্গ," দেশপূজ্য স্যর সুরেন্দ্রনাথের "A Nation In Making" এবং পরলোকগত খোসালচন্দ্র রায় মহাশয়ের "বাখরগঞ্জের ইতিহাস" প্রভৃতি পুস্তক হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ, ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুত ললিতমোহন দাস, প্রিয়নাথ গুহ, নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, সুশীলকুমার দত্ত, গুণদাচরণ সেন, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, রজনীকান্ত গুহ, ভবরঞ্জন মজুমদার প্রভৃতি মহোদয়গণ এই পুস্তকের উপকরণ-সংগ্রহে আমাকে যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছেন।

দ্বিতীয় সংস্করণে 'সূচনা,' 'গুণগ্রাহী ও রসগ্রাহী অশ্বিনীকুমার,' 'ব্রাহ্মসমাজ ও অশ্বিনীকুমার' এই তিনটি নূতন রচনা এবং অপর বহু নূতন আখ্যান সংযোজিত হওয়ায় পুস্তক প্রায় একশত পৃষ্ঠা বাড়িয়াছে, কিন্তু পুস্তকের মূল্য পূর্ব্ববৎ দেড়টাকাই রাখা হইল। অশ্বিনীকুমারের সহধর্ম্মিণী পূজনীয়া শ্রীযুক্তা সরলাবালা দত্ত, শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এবং মদীয় সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন মজুমদার অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রথম সংস্করণের পুস্তক পাঠ করিয়া নানাস্থলে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনের পরামর্শ-দানে গ্রন্থখানির উৎকর্ষসাধনে আমাকে আশাতীত সহায়তা করিয়াছেন। নরেন্দ্র বাবু ও ভবরঞ্জন বাবু পুস্তকের আদ্যোপান্ত প্রুফ্ সংশোধন এবং অপর বহুপ্রকারে সাহায্য করিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

বিনীত

শ্রীশরৎকুমার রায়

সূচনা

ফলের দ্বারা যেমন বৃক্ষের পরিচয় পাওয়া যায়, সেইরূপ কার্য্যের দ্বারা কর্ম্ম-কর্ত্তার যথার্থ স্বরূপ বুঝা যাইতে পারে। সাধারণতঃ যিনি সৎকার্য্য করেন তিনি প্রশংসিত হন আর যে ব্যক্তি অসৎকার্য্য করে সে নিন্দিত হইয়া থাকে। আমরা বলি, ইনি বহু সৎকার্য্য করিয়াছেন, দরিদ্রকে ধনদান করিতেন, রোগীর সেবা করিতেন, অতএব ইনি মহাপ্রাণ ব্যক্তি। মানবের মহত্ত্ব বিচারের এই যে সাধারণ পদ্ধতি আমরা ইহার নিন্দা করি না। কিন্তু এইপ্রকার বিচারপদ্ধতিদ্বারা মানুষের মনুষ্যত্বের পূর্ণ ছবি আমাদের মানসনেত্রে উদ্ভাসিত হয়, এরূপ মনে হয় না।

মানুষ তাহার কৃত কর্ম্মরাজির সমষ্টি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। যে-কোন ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মা তাঁহার জীবিতকালে যে কয়টি সৎকার্য্য করিয়াছেন তাঁহার অন্তরে তাহার অপেক্ষা কত শতগুণ অধিক পুণ্যকর্ম্ম সাধনের আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইত আমরা তাহার হিসাব কোথায় পাইব? পুণ্যপ্রেমের কত ভাবরাজি তাঁহার অন্তরে অস্ফুটভাবে অঙ্কুরিত হইয়া বিলীন হইয়াছে মানুষ তাহা জানিবার, বুঝিবার, দেখিবার সুযোগ পায় নাই, কিন্তু যিনি অন্তর্য্যামী তাঁহার হিসাবের

খাতায় সেইগুলিও জমার ঘরেই পড়িয়াছে। আর যে মহৎ উদ্দেশ্যগুলি মহাপ্রাণ ব্যক্তির অন্তরে—অনিশ্চিত আকারে অস্পষ্টভাবে দেখা দিয়াছিল সেই সকলের মধ্যে যতখানি মহত্ত্ব, যতখানি গৌরব নিহিত আছে সাধারণ মানুষ তাহা কি করিয়া দেখিবে, কি প্রকারে বুঝিবে? সেই সকল যে বিশ্বদেবতা দেখিয়াছেন, তাঁহার হিসাবে—সেই সমস্তও ধরা পড়িয়াছে।

যাঁহারা কবি, যাঁহারা ঋষি তাঁহাদের অন্তরে সকল তত্ত্ব আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঋষি-কবি ব্রাউনিং তাঁহার লিখিত "Rabbi Ben Ezra" নামক সুপ্রসিদ্ধ কবিতায় লিখিয়াছেন——

All instincts immature,
All purpose unsure,
That weigh not as his work, yet swelled
The man's account.

Rabbi তাঁহার বিচারকদিগকে সাগ্রহে বলিতেছেন—তোমরা যে আমাকে বিচার করিবার জন্য আমার কৃত কাজগুলি গণনা করিতেছ, কেবল ঐ কাজগুলি গণনা করিলেই কি আমার সত্যবিচার হইবে? কখনই নহে। আমার অন্তরে অঙ্কুরিত অস্ফুট আকাঙ্ক্ষাগুলি, অনিশ্চিত উদ্দেশ্যগুলিও আমার হিসাবে ধরিতে হইবে।

মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের চরিত-কথা আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আমরা পাঠকগণকে ঋষি-কবি ব্রাউনিংয়ের উক্ত মহাবাণীটি স্মরণ করাইয়া দিতে চাহি। গ্রন্থমধ্যে আমরা তাঁহার জীবনের কার্য্যাবলীর স্থূল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিব। সেই বিবরণে তাঁহার মহত্ত্ব ব্যক্ত হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু উহাতে তাঁহার মনুষ্যত্বের পূর্ণস্বরূপ দৃষ্ট হইবে ইহা আমরা মনে করি না।

যে বিদ্যালয়ের পুণ্যপ্রভা একদা নিখিল বঙ্গ আলোকিত করিয়াছিল, অশ্বিনীকুমার সেই ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি তাঁহার পৈতৃক বাসভূমি বাটাজোড় গ্রামেও একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং শিক্ষাবিস্তারকল্পে পল্লীগ্রামে কয়েকটি অবৈতনিক নিম্নপ্রাইমারী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছিলেন। যাহারা হিসাবী তাহারা হয়ত এইটুকুকেই তাঁহার শিক্ষাক্ষেত্রের কার্য্য বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু বস্তুতঃ কি তাই ? আমরা তাহা মনে করি না। অশ্বিনীকুমারের অন্তরে এই মহা আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইয়াছিল যে, তিনি বিদ্যার্থী যুবকদিগকে যথার্থ সুশিক্ষা দান করিয়া খাঁটি মানুষ করিয়া তুলিবেন। এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি স্বনামধন্য বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সুলভে বিদ্যাদান করিবার জন্য স্কুলকলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার কলেজে বিদ্যার্থীরা তিন টাকা বেতনে পড়িতে পাইত। সর্ব্বোপরি তিনি তাঁহার বিদ্যালয়কে বিদ্যাবিক্রয়ের বিপণি না করিয়া মানুষ গড়িয়া

তুলিবার আশ্রমে পরিণত করিতে সতত সচেষ্ট ছিলেন। এইক্ষেত্রে বিচারপতি রাণাড়ের প্রতিষ্ঠিত ফার্গুসন্ কলেজ তাঁহার আদর্শ ছিল। তাঁহার এই মহাচেষ্টার পুণ্যপ্রভাব সমগ্র বরিশাল জিলায়, কেবল বরিশালে কেন, নিখিল বঙ্গে নিপতিত হইয়াছে। "সত্য-প্রেম-পবিত্রতা" ছিল এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জীবনের ধ্যানমন্ত্র। বরিশাল সহরে অশ্বিনীকুমার সেই চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশবাসীর অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিবার জন্য যে আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়াছিলেন উহারই ফলে এখনও শিক্ষায় বরিশাল নিখিল বঙ্গে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বরিশাল জিলায় পাঁচ হইতে পনর বৎসর বয়সের বালক-বালিকার সংখ্যা সাত লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার তেতাল্লিশ, এতন্মধ্যে এক লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার দুই শত আশী জন লেখাপড়া শিক্ষা করে। অর্থাৎ বরিশাল জিলায় পাঁচ হইতে পনর বৎসর বয়সের বালকবালিকার শতকরা প্রায় একুশ জন লেখাপড়া শিখিয়া থাকে। বরিশালবাসীর মনে অশ্বিনীকুমার এই শিক্ষানুরাগ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেকথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।

পরদুঃখকাতর অশ্বিনীকুমার আপনার হস্তে বিসূচিকা রোগীর সেবা করিয়াছেন। তিনি কত জনের এইরূপ সেবা করিয়াছেন আমরা তাহার নির্ভুল হিসাব দিতে পারিব না। তিনি যখন ওলাওঠা রোগীর সেবা করিতে আরম্ভ করেন তখন

বরিশালে কিংবা বঙ্গদেশের অপর কোন স্থলে সেবকদল গঠিত হয় নাই। বরিশালের সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়ে তখন ওলাউঠা রোগী রাখিবার কোন ঘর ছিল না। এখন যেখানে মেয়ে হাঁসপাতাল উহার দক্ষিণে একটি নালার উপরে একখানা ক্রমনিম্ন চালাঘরে রোগী রাখা হইত। জোয়ারের সময়ে কখনো কখনো সেই চালায় জল উঠিত, মাথা নীচু না করিয়া কেহ এই চালাঘরে প্রবেশ করিতে পাইত না। অশ্বিনীকুমার আবশ্যক মতে এই ঘরে আসিয়া রোগী সেবা করিতেন। তাঁহার সস্নেহ পরিচর্য্যায় এক ব্যক্তি রোগমুক্ত হইয়া মিউনিসিপ্যাল নির্ব্বাচনে তাঁহাকে ভোট দিয়াছিল। ঘটনাক্রমে এই ব্যক্তি অশ্বিনী-কুমারের প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রজা ছিল ; তিনি লোকটিকে এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন—"তুই যদি আমাকে ভোট না দিস্‌তো তোর ঘর কাটিয়া তোকে ভিটা ছাড়া কর্‌ব।" উত্তরে সেই লোকটি বলিয়াছিল "তা' দিতে হয় দিবেন, কিন্তু যিনি জজের ছেলে, ঘরে যার কোন সুখের, কোন আরামের অভাব নাই, তিনি রাত দুপুরে সেই সব ছেড়ে এসে, ওলাউঠার সময়ে আমাকে সেবা করতেন, তাঁকে আমি ভোট দিবই। এর জন্য আমি সব দণ্ড সইতে প্রস্তুত আছি।" আর এক মুমূর্ষু ওলাউঠা রোগীকে অশ্বিনীকুমার অপর কোন প্রকার যান না পাইয়া নিজের পৃষ্ঠে করিয়া পথিপার্শ্ব হইতে হাঁসপাতালে বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। এই রোগী রোগমুক্ত হইয়া দেশে গিয়া অশ্বিনী-কুমারকে এক পত্রে লিখিয়াছিল—"বাবু, আমার পিঠের চাম্‌ড়া

দিয়া যদি আপনার পায়ের জুতা তৈয়ার করিয়া দেই তথাপি আপনার ঋণ হইতে আমি কদাচ মুক্ত হইতে পারিব না।" যে প্রেম, যে মহাভাবের আবেশে প্রেমিক অশ্বিনীকুমার এই সকল রোগীর সেবা করিতেন, সেই প্রেম, সেই মহাভাব তাঁহার কৃত-কার্য্যের সমষ্টির কত উর্দ্ধে বিরাজ করে আমরা পাঠকদিগকে তাহাই চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

দেশের দুর্গতি দূর করিবার জন্য যাহারা বিদেশীর মুখের দিকে কাতর নয়নে চাহিয়া আছেন, দেশসেবক অশ্বিনীকুমার কোনদিন ঐ সকল দেশসেবীদের সহিত একমত হইতে পারেন নাই। তাঁহার দৃষ্টি ছিল ঘরের দিকে; পরের দিকে চাহিবার মত তাঁহার মনের গতি ছিল না। আবেদন-নিবেদন-মূলক আন্দোলনের সহিত তাঁহার যোগ ছিল; কিন্তু উহার প্রতি কস্মিন্‌কালেও তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। তিনি দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদিগকে সকল দিক্ দিয়া অগ্রসর করিয়া দিবার অভিলাষী ছিলেন। এই ভাবের ভাবুক ছিলেন বলিয়া তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে জাতীয় মহাসমিতির এক অধিবেশনে কংগ্রেসকে তিন দিনের তামাসা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"মহাসমিতির কার্য্য নিখিল ভারতের সর্ব্বত্র সংবৎসর ধরিয়া চালাইতে হইবে, তিন দিন সভা করিয়া কেবল বক্তৃতা ও প্রস্তাব করিলে চলিবে না। জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যের জন্য বেতনভোগী প্রচারক পাঠাইতে হইবে।" তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিলেও

উহাতে কংগ্রেস-কেশরী ফেরোজসাহ্ ক্রুদ্ধ হইয়া অশ্বিনীকুমারের কাপড় ধরিয়া টানিয়া বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার আপনাকে জয়যুক্ত ও গৌরবান্বিত করিবার জন্য দেশের সেবা করিতেন না, জননী জন্মভূমির দুঃখমোচনই তাঁহার দেশ-সেবার উদ্দেশ্য ছিল। জাতীয় মহাসমিতির আর এক অধিবেশনে অশ্বিনীকুমার কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের "নন্দলাল" কবিতা আবৃত্তি করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমরা অনেকেই নন্দলালের মত স্বদেশসেবক। দেশের জন্য সর্ব্বতো-ভাবে আপনাকে দান করিতে না পারিলে আমাদের দ্বারা দেশের কোন মঙ্গল সাধিত হইতে পারিবে না।"

আজিকার কথা নহে, প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, অশ্বিনী-কুমার বাঙ্গালীকে সর্ব্বতোভাবে "স্বদেশী" গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি যখন তাঁহার রচিত স্বদেশী সঙ্গীতগুলি "ভারতগীতি" নামক পুস্তিকায় প্রচার করেন। তখন জাতীয় মহাসমিতি সবেমাত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; উক্ত সঙ্গীত-পুস্তিকায় তিনি তাঁহার সরল ভাষায় বলিয়াছেন—

বাঙ্গালী বড় বুদ্ধিমান্ কে বলে সংসারে ?
এমন বোকা কোথাও না দেখি কাহারে।
দেশের প্রতি নাই মমতা, বিদেশীয়ের পায়ের জুতা
যা' করে ইংরাজ তাই ভাল তার বিচারে।
বাঙ্গালী বাবু যারা, এমন হতমূর্খ তারা
শুট্‌কী চুরটের লেগে, অম্বুরী তামাক ছাড়ে।

সাচ্চা আতর গোলাপ ত্যজে, বিলাতী বিলাসে মজে
কত টাকা উড়ায় তারা, ভস্ম ল্যাভেণ্ডারে।
দু'দিন ইস্কুলে গেলে, দেশী খাওয়া যান ভূলে
পরমান্ন ছেড়ে তুষ্ট গোমাংস আহারে।

এই যে আচারে-ব্যবহারে, আহারে-বিহারে, বাক্যালাপে, পোষাকে বিদেশী মোহ, এই মোহই বাঙ্গালীর মনকে দাসত্বের শত বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই মোহনিদ্রা হইতে জাগাইবার জন্য অশ্বিনীকুমার তাঁহার স্বদেশবাসীকে আহ্বান করিয়া বলিতেছেন—

স্বদেশের হিত লাগি প্রাণ ঢেলে দাওরে
আর্য্য নামে কি সম্ভবে জীবনে দেখাও রে।

সেই পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমার স্বদেশসেবায় হিন্দু-মুসলমান সকলকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন—

"আয়রে আয় ভারতবাসী, আয় সবে মিলে
প্রণমি ভারতমাতার চরণ কমলে।
আয়রে মুসলমান ভাই আজি জাতি ভেদ নাই
এ কাজেতে ভাই ভাই আমরা সকলে।

ভক্তিযোগবক্তা অশ্বিনীকুমারের জীবনে ভক্তির রাগিণী নিরন্তর ঝঙ্কৃত হইত। তাঁহার সকল কর্ম্মই ভগবৎ প্রেমের অফুরন্ত প্রস্রবণ হইতে উৎসারিত হইত। তিনি ছিলেন মহাপ্রেমিক। চির-কৌতুকী সদানন্দ অশ্বিনীকুমারকে প্রত্যক্ষ করিবার সৌভাগ্য যাহাদের ঘটিয়াছিল, তাহাদের মানসনেত্রে

তাঁহার সেই হাস্যসুন্দর মুখের পুণ্যজ্যোতিঃ এখনও জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। সেই মুখের মধ্যে এমন পবিত্র ভাগবত-শ্রী ছিল, তাহা একবার দেখিলে চিরজীবনে আর ভুলিবার সাধ্য ছিল না।

আনন্দের উপাসক অশ্বিনীকুমার আনন্দের মধ্যে জন্ম লাভ করিয়া চিরজীবন আনন্দে যাপন করিয়া আনন্দ-লোকে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। তিনি যখন নির্ব্বাসিত হইয়া লক্ষ্ণৌ-কারাগারে ছিলেন, তখন কারাকক্ষের কঠিন প্রাচীর ও ধূলি-রাশিকে আপনার অন্তরের আনন্দে পূর্ণ করিয়া একাকী নৃত্য করিতেন এবং মনের আনন্দে ধূলিমুষ্টিকে চুম্বন করিতেন। তিনি তাঁহার এই আনন্দ, এই স্ফূর্ত্তি সঙ্গীতে সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন—

আমি যাঁরে করি পূজা
সে স্ফূর্ত্তি মুলুকের রাজা,
স্ফূর্ত্তিতে তাঁর বাজ্‌চে বাজন, স্ফূর্ত্তির হচ্ছে গান।

এই আনন্দের আবেশেই অশ্বিনীকুমার স্বরচিত সঙ্গীতে বলিয়াছেন—

(তখন) অনলে অনিলে জলে মধু-প্রবাহিনী চলে,
মেদিনী হয় মধুময়;
(তখন) প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হৃদয়ে মৃদঙ্গ বাজে,
মধুর মধুর ধ্বনি হয়।

প্রতীচ্য কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির ভিতর দিয়া কি ভাবে পরমেশ্বরের সহিত সম্মিলিত হইতেন, উহা দেখাইবার জন্য অশ্বিনীকুমার কবির চিত্রিত "পরিব্রাজকের" (The Wanderer) ছবির উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, - "পরিব্রাজক প্রভাতের অরুণ রবি, সূর্য্যাংশু-স্নাত বসুন্ধরা, মহাসাগরের অম্বুরাশি, সূর্য্যকিরণ-রঞ্জিত মেঘমালা প্রভৃতির মনোহর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ভগবৎ প্রেমে ডুবিয়া গেলেন, তাঁহার চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইল—

"Thought was not ; in enjoyment, it expired."

যে দেবতা আনন্দরূপে, অমৃতরূপে বিশ্বভুবনে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, তাঁহাকে দেখিবার মত এই যে ঋষি-দৃষ্টি, কবি-দৃষ্টি বা দিব্যদৃষ্টি ইহা লক্ষের মধ্যে একজনও লাভ করিতে পারেন না। ভাগ্যবান্ অশ্বিনীকুমার এইরূপ দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন। পূজনীয় শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখে শ্রুত একটি ছোট আখ্যানের উল্লেখ করিয়া অশ্বিনীকুমারের এই আনন্দানুভূতি বিবৃত করিতেছি।

অশ্বিনীকুমার তখন নবীন যুবক, বরিশাল সহরের ভক্তগণ-সঙ্গে লাখুটিয়ায় জমিদার স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের ভবনে প্রায় প্রত্যহ ধর্ম্মালোচনা করিতেন। নামগানে তিনি এমন মাতিয়া যাইতেন যে, কখনো নাচিতেন, কখনো কাঁদিতেন, কখনো বা সংজ্ঞাহীন হইয়া ধরাতলে পড়িয়া যাইতেন। এইরূপএক ধর্ম্ম সভায় তিনি একদিন উন্মুক্ত জানালার মধ্য দিয়া আকাশে চন্দ্রোদয় দেখিতেছিলেন। ভাবাবেশে তাঁহার

চোখ, নাক, গণ্ডস্থল আনন্দাশ্রুতে ভাসিয়া যাইতেছিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া জগদীশ বাবু এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে ছিলেন। নাসিকা হইতে জল পড়িতেছে দেখিয়া মৃদুস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার কি সর্দ্দি হইয়াছে ?" কৌতুকী অশ্বিনীকুমার উত্তর করিলেন—"হাঁ, এ চাঁদা-সর্দ্দি।"

চাঁদ দেখিয়া অশ্বিনীকুমার এই যে গভীর আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার রচিত "ভক্তিযোগে" ও "প্রেমে" বহু স্থানে তিনি নানা প্রকারে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রেম-পিপাসু যুবককে তিনি বলিয়াছেন—"কয়েকদিন চাঁদের দিকে তাকাও হৃদয় প্রেমে পূর্ণ হইবে। প্রকৃতির সুন্দর ছবি দেখ, নদীর কুল্ কুল্ ধ্বনি শ্রবণ কর, মলয় মারুত সেবন কর, ফুলটি কেমন ফুটিতেছে দেখিতে থাক, বৃষ্টিপাতের মধুর গম্ভীর আনন্দ অনুভব কর, হৃদয়ে প্রেম আসিবে। প্রকৃতির মনোহারিণী মূর্ত্তি দেখিতে দেখিতে প্রাণ ভালবাসায় পূর্ণ হয়। 'ফুলের গন্ধে মনে পড়ে তারে যারে ভালবাসি'। প্রেমময়ী প্রকৃতির নিকট উপস্থিত হইলেই তিনি হৃদয়-ভাণ্ড প্রেমে পূর্ণ করিয়া দেন। তাই চারিদিকের অগণ্য মনোহর দৃশ্য দেখিয়া প্রাণ বোঝাই করিয়া লও।"

আমাদের চারিদিকের এই বিশ্ব-প্রকৃতি আমাদের কাছে অর্থশূন্য, ভাষাশূন্য, ইহাই যাঁহারা কবি, যাঁহারা ভক্ত তাঁহাদের নিকট আনন্দের নির্ঝর। এই মধুরসের আস্বাদন পাইয়া অশ্বিনীকুমার গাহিয়াছেন—

বজ্ররব মেঘধ্বনি গুরু সোম রাহু শনি,
মধুরসে সকলই ভরপূর।

এই মধুরসে হৃদয়পাত্র পূর্ণ ছিল বলিয়া অশ্বিনীকুমার লিখিতে পারিয়াছেন—“এই অবস্থায় যখন পঁহুছিবে তখন আনন্দের আর সীমা থাকিবে না, তখন সম্মুখে যাহা দেখিবে জড়াইয়া ধরিবার জন্য ছুটিয়া যাইবে বৃক্ষের পত্রে পত্রে চুম্বন করিতে ইচ্ছা হইবে, পুকুরের প্রত্যেক জলবিন্দু, চাঁদের প্রত্যেকটি কিরণ তোমার প্রাণের ভিতর লুকাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে, রাস্তার ধূলিমুষ্টি হাতে তুলিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িবে, পাথরের ভিতর সুধাধারা বহিবে।”

আনন্দের উপাসক সদানন্দ অশ্বিনীকুমারের হৃদয়ভাণ্ড এমনই মধুরসে ভরপূর ছিল বলিয়া তিনি অতি সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত সকলকে ভালবাসিতে পারিতেন এবং এই ভক্তের চিত্ত শতদলের মধুগন্ধে আকুল হইয়া বাল-বৃদ্ধ-যুবক সকলে তাঁহার চারিদিকে ভিড় করিত।

মহাত্মা অশ্বিনীকুমার

প্রথম অধ্যায়

বংশপরিচয়

মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের পৈতৃক বাসভূমি বাটাজোড় বরিশাল জিলার অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রাম। এই গ্রামটি বরিশাল সহর হইতে সতর মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বরিশাল হইতে মাদারীপুর পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাস্তা আছে তাহা এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার পার্শ্বে যে খাল আছে তাহা দিয়া মাদারীপুর ও বিক্রমপুর অঞ্চলের লোকেরা নৌকাযোগে বাকরগঞ্জের নানাস্থানে গমনাগমন করিয়া থাকে।

অশ্বিনীকুমার এই গ্রামের প্রসিদ্ধ দত্তপরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ আদিশূরের সময়ে কান্যকুব্জ হইতে পাঁচ জন যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের সহিত পাঁচ জন সহচর কায়স্থ আসিয়াছিলেন। পুরষোত্তম দত্ত ইহাদের অন্যতম। তাঁহার

বংশধর সদানন্দ ও সনাতন দত্ত সর্ব্বপ্রথম বাটাজোড়ে বসতি স্থাপন করেন। বাটাজোড়ের দত্তবংশীয়েরা ইহাদের বংশসম্ভূত। ইহারা সুক্রিয়ান্বিত।

দানে বাটা ক্রিয়ায় জোড়।
তার নাম বাটাজোড়॥

ইহাদের সম্বন্ধে এইরূপ একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। ইহারা বাঙ্গোরোড়া পরগণার পুরাতন ও প্রসিদ্ধ তালুকদার। ইহাদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান রাজত্বের সময়ে নবাব সরকারে চাকুরী করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। অশ্বিনী-কুমারের পৈতৃক বাটীতে একটি দীর্ঘিকা আছে। সেইটিকে "মঘের আঁধি" বলা হয়। প্রবাদ আছে যে, মুসলমান নবাবদিগের শাসন সময়ে মঘেরা একরাত্রিমধ্যে ঐ দীঘি কাটিয়াছিল। এক্ষণে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে বাটাজোড়ের বিখ্যাত বাজারে সপ্তাহকালব্যাপী "মেলা" বসিয়া থাকে।

অশ্বিনীকুমারের প্রপিতামহ নিষ্ঠাবান্ ধার্ম্মিক গতিনারায়ণ দত্ত মহাশয় গ্রামে থাকিয়া স্বীয় পৈতৃক সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে তদীয় সহধর্ম্মিণী তাঁহার সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন। নন্দকিশোরও তাঁহার পিতার ন্যায় ধার্ম্মিক ছিলেন। জপতপেই তাঁহার সময় অতিবাহিত হইত। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ছিলেন। গ্রামবাসীরা সকল বিষয়ে তাঁহার সুপরামর্শ এবং নিরপেক্ষ

শালিসী বিচার মানিয়া লইতেন। কনিষ্ঠপুত্র গৌরমোহন মাদারীপুরে ওকালতী করিতেন। নন্দকিশোরের দ্বিতীয় পুত্র অশ্বিনীকুমারের জনক ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় ১৭৪৭ শকাব্দে ৩রা আশ্বিন রবিবার বাটাজোড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বয়স যখন পনর কি ষোল বৎসর তখন পর্য্যন্ত তিনি বাল-সুলভ খেলাধূলা ও আমোদআহ্লাদেই দিন কাটাইয়া দিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহার পিতৃদেব ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় সম্বন্ধে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পূজনীয় শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে একপত্রে লিখিয়াছিলেন,

—যখন আমাদের গ্রামে কেহই, আমাদিগের গ্রামে কেন, বাকরগঞ্জ জিলাতেই, প্রায় কেহই ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন নাই, তখন পিতৃদেব কাহাকেও কিছু না জানাইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। সেই সময়ে কলিকাতায় যাওয়া কি দুরূহ ব্যাপার ছিল তাহা ত বুঝিতেই পার। যতদূর মনে পড়ে, শুনিয়াছি কপর্দ্দকশূন্য অবস্থায় তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি স্বকীয় চেষ্টায় জলটুঙ্গির স্কুলে অর্থাৎ ভবানীপুরে লণ্ডন মিশনারি সোসাইটির স্কুলে তিন বৎসর ইংরাজী শিক্ষা করেন। তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৮ বৎসর বয়সে বানারিপাড়া স্কুলে ১৫৲ টাকা বেতনে মাষ্টার হন। মাষ্টারী করিতে করিতে তাঁহার মনে হইল—"একি ক্ষুদ্র বেতনের কার্য্য করিতেছি! বড় হইতে হইবে।" তখন একটা Competitive পরীক্ষা ছিল, সেই পরীক্ষায় যে কয়েকজন নির্ব্বাচিত হইত তাঁহারা মুন্সেফ হইতেন কিম্বা ইচ্ছা করিলে সদর দেওয়ানী আদালতে উকীল হইতে পারিতেন। বর্ত্তমান হাইকোর্টের নাম

তখন সদর দেওয়ানী আদালত ছিল। পিতৃদেব মাষ্টারী করিতে করিতে সেই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। অনেকে নাকি তাঁহাকে উপহাস করিয়াছিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিতেন না। লোকের উপহাস, নিন্দা গ্রাহ্য না করাই তাঁহার স্বভাব ছিল। তিনি আমাদিগকে বলিতেন—"দোপেয়েকে কখনও গ্রাহ্য করিবে না। যাহা খাঁটি বুঝিয়াছ করিয়া যাও, যাহার যাহা বলিতে হয় বলুক।" দেখিয়াছি কোন কাজে নিন্দা হইবে বলিলে, তিনি বলিতেন,—"তা'গে ভাবো তোমরা।"

তাই তাঁহার উচ্চলক্ষ্য দেখিয়া যাহারা হাসিত তিনি তাহাদিগের কথা তৃণবৎ উড়াইয়া দিতেন। আমাদিগের লক্ষ্য যাহাতে উচ্চ হয় তজ্জন্য তিনি প্রায়ই বলিতেন, "মারি ত হাতী, লুঠি ত ভাণ্ডার।" আরও বলিতেন, যেখানে থাক্‌বে সেইখানেই যেন প্রধান হয়ে থেকো। সেই Caesar এর কথা, "I shall rather be the first man in a village than the second in Rome" এই ভাব তাঁহার অনেক কথায়ই প্রকাশ পাইত। আমার টাকা উপার্জ্জনের বড় প্রবৃত্তি নাই দেখিয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "তা টাকা রোজগার কর না কর, তার জন্য মরি না, কিন্তু যে জায়গায় থাক্‌বে সে জায়গাটা যেন গরম হয়।" একটু উচ্চদিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য অনেক কথা বলিতেন। "আমার কিছু হবে না, আমি আর কি কর্‌তে পারি?" এরূপ দুর্ব্বলতার কথা শুনিতেই পারিতেন না। আত্মশক্তিতে বিশ্বাস আছে দেখিলে আনন্দিত হইতেন। "আমাদ্বারা হবে না, ওপথে বড় ভয় আছে, বিপদ্ আছে" এরূপ কথা একেবারেই পছন্দ করিতেন না। বলিতেন 'কলম্বস্ ডুবিয়া মরিবার ভয় করিলে কখনও আমেরিকা আবিষ্কার করিতে পারিতেন না।' তাঁহার "মানব" নামক পুস্তকখানির উপসংহারে

এরূপ ভাবের অনেক কথা আছে। তিনি চিরদিনই সাহসী ছিলেন! পেন্সন্ লইবার পরে হরিদ্বার, হৃষীকেশ, জ্বালামুখী প্রভৃতি দর্শন করিতে যান ; জ্বালামুখী হইতে মাণ্ডি, রাওয়ালেশ্বর প্রভৃতি হিমালয়ের মধ্যে অনেক স্থলে পদব্রজে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। পিতৃদেব যথেষ্ট কষ্টসহিষ্ণু ছিলেন, ঐ বৃদ্ধ বয়সে যেখানে সেখানে যেভাবে সেভাবে পড়িয়া থাকিতেন এবং দুর্গম পথে চলিতে কষ্ট বোধ করিতেন না। তাঁহার সঙ্গীয় ভৃত্য গোপাল ও আমার ভগিনীপতি কালীহর রায়ের মুখে এই সকল কথা শুনিয়াছি। কালীহরও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। গোপাল ও কালীহর এ পৃথিবীতে থাকিলে তাঁহাদের মুখে তাঁহার সাহস ও কষ্ট-সহিষ্ণুতার কথা অনেক শুনিতে পাইতে। যা'ক, মাষ্টারী করিতে করিতে মুন্সেফী ও সদর দেওয়ানী আদালতের ওকালতী পরীক্ষা দিবার কথা বলিতেছিলাম। সেই পরীক্ষায় নির্ব্বাচিত হইয়া সদর দেওয়ানী আদালতে উকীল হইয়া মাত্র পাঁচ মাস ওকালতী করেন। আমার পিতামহ বিষয়ী লোক ছিলেন না। তিনি নাকি দিনে দুপুরের পর অবধি ও রাত্রেও প্রায় একটা পর্য্যন্ত পূজা আহ্নিকে রত থাকিতেন। তখনকার দিনে ভূসম্পত্তি হইতে তাঁহার বার্ষিক ৯০০৲ টাকা আয় হইত। যদিও গৃহে অনেক লোক ছিল না, তথাপি তাহার তাহাতে কুলাইত না। তিনি ঋণদায়গ্রস্ত হইয়াছিলেন।

পিতৃদেবের জনহিতৈষণা ও স্বদেশ এবং স্বজাতি-প্রীতিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যখন পটুয়াখালীতে তিনি মুন্সেফ, ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও ডিপুটী কালেক্টর ছিলেন (এক সময়েই এই তিনের কার্য্য করিতেন), তখন আমার শৈশবে একদিন দেখিলাম, পিতৃদেব হাঁটুর উপরে ধুতি তুলিয়া প্রায় জানু সমান কাদা ভাঙ্গিয়া অতি দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন। কিঞ্চিৎকাল

পরে দেখিলাম, কতকগুলি লোক তাঁহার সঙ্গে কয়েক ব্যক্তিকে অতি কষ্টে লইয়া আসিল এবং তাহাদিগকে ঘুরপাক দিয়া কি অন্য প্রকারে তাহাদিগের নাকমুখ হইতে জল বাহির করিতে লাগিল। শুনিলাম, এক নৌকা ডুবিয়াছিল এবং ঐ লোকগুলিও ডুবিতেছিল। তাহারা বাঁচিয়া গেল। আর একদিন পটুয়াখালীর বাজারে আগুন লাগিয়াছিল, দেখিলাম, পিতৃদেব বেগে ছুটিয়া গিয়া তাহা নির্ব্বাণের ব্যবস্থা করিলেন। যখন যশোহরে ছোট আদালতে জজ্ ছিলেন, তখন তিনি উকীলদিগকে উপদেশ দিয়া গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণার্ত্ত লোকদিগের জন্য একটি জলসত্রের বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তৃষ্ণার্ত্তগণ মধুর সরবৎ পান করিতে পাইত। অনেক লোক অধিক সুদে টাকা ধার করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হয় তজ্জন্য অল্প সুদে টাকা দিবার জন্য তাঁহারই উদ্যোগে যশোহরে লোন্ আফিস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

যখন তিনি রঙ্গপুরে ছিলেন তখন একবার লাইব্রেরীর সংবাদপত্র ও পুস্তকাদি নেওয়া লইয়া ইউরোপীয় ও বাঙ্গালীগণের মধ্যে বিবাদ হয়, পিতৃদেব তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। ইউরোপীয় পরিচালিত সংবাদপত্র ইংরেজগণ প্রথমে নিবেন এবং বাঙ্গালী কি এ দেশীয় সম্পাদক-পরিচালিত সংবাদপত্র বাঙ্গালীগণ প্রথমে নিবেন, তদনুসারে কার্য্য চলিত। লাট্ রিপনের সময়ে মিউনিসিপালিটীতে সভ্য-নির্ব্বাচন-প্রথা প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে বরিশালে করদাতৃগণদ্বারা নির্ব্বাচন প্রথা প্রচলনের জন্য এক আবেদনপত্র পাঠান হইয়াছিল। সেই আবেদনের সময়ে কতক বরিশালবাসী উহার বিরোধী হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—"আমরা এরূপ নির্ব্বাচন চাহি না। সেই সময়ে একটি সভা করিয়া, যতদূর পাইতে পারি, ততদূর শাসনভার আমাদিগের হস্তগত করার চেষ্টা করা নিতান্ত কর্ত্তব্য এবং আমরা প্রথমে

উত্তমরূপে কৃতকার্য্য না হইলেও ক্রমে হইব এবং তজ্জন্য উদ্যম আবশ্যক; এই মর্ম্মে পিতৃদেব এক বক্তৃতা করেন, তদ্দ্বারা সেই আবেদনপত্র প্রেরণের বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল।

শিক্ষাবিস্তারের জন্য তাঁহার প্রাণে কিরূপ আকাঙ্ক্ষা ছিল, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ই তাহার প্রমাণ করিতেছে। জিলা স্কুলে ছয় শতের অধিক ছাত্র হইল, সে গৃহে আর স্থান হয় না, স্কুল কমিটী হইতে গৃহ বৃদ্ধির জন্য সরকারে লেখা হইল, গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া একটি বে-সরকারী স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব করিলেন। আমাকে কমিটী তাহা স্থাপন করিতে অনুরোধ করিলেন। বাবা তখন তাঁহার পদত্যাগ করিয়া হরিদ্বারে আছেন। যেমন তাঁহাকে লিখিলাম, অমনি স্কুল স্থাপনের আদেশ করিলেন। জুন মাসে বিদ্যালয় স্থাপিত হইল, আগষ্ট মাসে তিনি বরিশালে আসিলেন। আসিয়া স্কুলের গৃহগুলি নির্ম্মাণ করিতে তিনি যুবকের ন্যায় উৎসাহ দেখাইয়া বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন। বিদ্যালয় হইতে যেন কোন লাভ করা না হয়, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে আমাদিগকে অনুরোধ করেন। নামটি তাঁহার দেওয়া নয়, তিনি 'ন্যাসন্যাল স্কুল' নাম করিতে বলিয়াছিলেন। আমি বলিলাম—'সকলে অশ্বিনী বাবুর স্কুল বলে, টাকা আপনার, আমি আপনার নামে স্কুলের নাম করিব, এ বিষয়ে আপনার অবাধ্য হইলে দোষ হইবে না।' আমিই তাঁহার নামে ইহার নামকরণ করি।

মহিলাদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য পিতৃদেব বার্ষিক চল্লিশ টাকার একটি পুরস্কার স্থাপন করেন, অনেকেই তাহা অবগত আছেন। গ্রামে মাইনর স্কুলের জন্য তিনি একটি ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। উপনিষদ্ ও বেদান্ত প্রচারের জন্য কাশীধামে মাসিক দশ টাকার একটি বৃত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু দুইবার দুইটি ছাত্র বৃত্তি লইয়া

কিছুদিন পাঠ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন দেখিয়া সেই বৃত্তি রহিত করা হয়।

যে দিন তিনি পরলোকগমন করেন, সেই দিনই মধ্যাহ্নে তিনি আমাকে স্কুলটি কলেজে পরিণত করিতে বলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম, "মাত্র দেড় বৎসর স্কুলটি হয়েছে, পাঁচ বৎসর পরীক্ষার পরে এফ, এ, ক্লাস খোলা কর্ত্তব্য।" শুনিয়া বলিলেন, "তবে তাহাই করিও।" সেই দিনই সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পরে তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে চলিয়া গেলেন।

তাঁহার মানসিক শক্তি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলি। তাঁহার এমন একান্তাভিনিবেশ ছিল যে, শুনিয়াছি একদিন কি পাঠ করিতেছিলেন, এ দিকে তাঁহার পা কিঞ্চিৎ দগ্ধ হইয়াছে, তাহা কিছুই টের পান নাই। বোধ হয় এই প্রকার একান্তাভিনিবেশের ফলে অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। যাত্রাগান শুনিতে যাইয়া যে যে গান শুনিতেন তাহার পদগুলি বাড়ী আসিয়া অনায়াসে বলিয়া যাইতেন।

যেমন একদিকে মানসিক শক্তি ছিল—অন্য দিকে তাঁহার বিচার-কুশলতাও অসাধারণ ছিল। শুনিয়াছি তাঁহার বিচারের বিরুদ্ধে আপীল অতি অল্পই চলিয়াছে। একটা মোকদ্দমার কথা শুনিয়াছি, হাইকোর্টে তাঁহার নিষ্পত্তি রহিত হইয়াছিল; কিন্তু বিলাত আপীলে আবার তাহাই স্থির হইয়াছিল। যেমন এদিকে মানসিক শক্তি ছিল, তেমনি খাটিতেও পারিতেন। সময় নষ্ট করিতে দেখিতে পারিতেন না। দিবা-নিদ্রা কি তাসপাশা খেলা তাঁহার চক্ষুঃশূল ছিল। বাসার লোক রবিবারের আগমনে বড়ই সন্ত্রস্ত হইত। রবিবারে কর্ত্তা বাসায় থাকিয়া এখান-কার জিনিস ওখানে, ওখানকার জিনিস এখানে, টানাটানি করাইবেন, কি ঐরূপ যাহা হয় কিছু করাইবেন, ঘুমাইতে দিবেন না, ইহাই

তাহাদিগের ভয়ের কারণ ছিল। তাস খেলা সম্বন্ধে একদিনকার ঘটনা বলি। একদিন আমাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, আমি যাইয়া দেখি, কতকগুলি তাস বায়ুতে উড়াইয়া দিয়াছেন। আমাকে বলিলেন, "ওরে বাসায় কে তাস খেলেরে? ছ্যাখ্ দেখি হাওয়া কেমন সুন্দর তাস খেল্‌ছে।" পেন্‌সন নেওয়ার পরে তাঁহাকে কখনও কখনও দিনে কিঞ্চিৎ নিদ্রিত হইতে দেখিয়াছি, তৎপূর্ব্বে অসুখ ভিন্ন কখনও দেখিয়াছি মনে হয় না।

তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধেও মনে হয়, তিনি উচ্চ গ্রামেই বসতি করিতেন। উপনিষদ্ তাঁহার বড় প্রিয়পাঠ্য ছিল এবং অনেক সময়েই আমাদিগের নিকটে বারংবার বলিতেন,—"ওরে,নামও কিছু নয়রে, রূপও কিছু নয়রে, নাম, রূপের অতীত যা', তাই সত্য।" নাম ও রূপকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে আমাদিগকে সর্ব্বদা উপদেশ দিতেন।

বস্, এই অবধিই থাক্। একটানে যাহা লিখিয়া গেলাম, তাহাই বেশ। আমার ৬২ বৎসর শেষ হইতেছে, যদি রাত্র কাটাই কাল ৬৩ আরম্ভ হইবে। এই দিনে তোমাদিগের প্রণোদনায় বাবার কথা লিখিতে লিখিতে আনন্দ হইল। যে বাবাজিগণের সম্মুখে এই পত্র পড়িবে তাঁহাদিগকে প্রা ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তাঁহারা যেন আমার বাবার চরিত্রকাহিনী শুনিয়া তাঁহার গুণগুলি তাঁহাদিগের স্বকীয় চরিত্রে আরও উজ্জ্বলতর করিয়া নিজেরা ধন্য হন ও দেশকে ধন্য করেন। আমার বাবা দিব্যধাম হইতে তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন। তাঁহার নামাঙ্কিত বিদ্যালয়ে যে পতাকা উড্ডীন হইয়াছে তাহা জয়যুক্ত হউক, তদ্বিরোধী যাহা কিছু দূর হয়ে যাক্, রসাতলে বিলীন হয়ে যাক্। আমার বাবাজিগণের জয় জয়কারে দেশ মুখরিত হউক। কর্ত্তা তাঁহাদিগকে দিগ্বিজয়ী করুন। বৃদ্ধের আশাপূর্ণ হউক।

ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় স্বনামধন্য স্বর্গীয় বারিষ্টার মনোমোহন ও লালমোহন ঘোষ মহাশয়দের ভাগিনেয়ী প্রসন্নময়ীকে বিবাহ করেন। প্রসন্নময়ীর পৈতৃক নিবাস বানরীপাড়া গ্রামে। এই দম্পতী ১৮৫৬ অব্দের ২৫এ জানুয়ারী মহাত্মা অশ্বিনীকুমারকে পুত্ররূপে লাভ করেন। এই সময়ে ব্রজমোহন লাউকাঠি চৌকিতে [পটুয়াখালী] মুন্‌সেফী করিতেন, সেই স্থানেই অশ্বিনীকুমারের জন্ম হয়। দত্ত মহাশয়ের প্রচেষ্টায় পটুয়াখালীতে সব্‌ডিভিসন স্থাপিত হয়। যশোহরে বদলী হইয়া ব্রজমোহন ছোট আদালতের জজ্‌ পদ প্রাপ্ত হন। ব্রজমোহন যখন কৃষ্ণনগরে ছিলেন তখন তাঁহার মামাশ্বশুর বিখ্যাত আইনব্যবসায়ী মনোমোহন, লালমোহন ও মুরারী ঘোষ তথায় ছিলেন। স্বর্গীয় বিচারপতি আশুতোষ চৌধুরীর পিতা দুর্গাদাস চৌধুরী এবং কৃষ্ণনগর রাজতরফের দেওয়ান ৺ কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত ব্রজমোহনের প্রগাঢ় হৃদ্যতা ছিল।

ধর্ম্ম ও সুনীতির প্রতি ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল। তিনি তৎপ্রণীত "মানব" নামক গ্রন্থে মানুষের দেহতত্ত্ব বর্ণনা করিয়া পাপপুণ্যের অতি সুন্দর রূপক ছবি অঙ্কন করিয়াছেন। এই দার্শনিক গবেষণাপূর্ণ পুস্তকখানি ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং রেভারেণ্ড কালীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সুধীগণকর্ত্তৃক প্রশংসিত হইয়াছিল। শেষ জীবনে দত্ত মহাশয় গৈরিক বস্ত্র পরিধান

করিতেন এবং তখন তাঁহার চালচলন অনেকটা উদাসীন সন্ন্যাসীর মত ছিল।

পিতা ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের এই ধর্ম্মানুরাগ অশ্বিনাকুমারের চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নির্ব্বাসনদণ্ড প্রাপ্ত হইয়া অশ্বিনীকুমার যখন লক্ষ্ণৌ কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন তখন তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে একপত্রে লিখিয়াছিলেন—

"বাবা বেদান্ত বড় ভালবাস্‌তেন, তাঁর মুখে প্রথম বেদান্তের কথা শুনি। বেদান্ত তাঁর বেশী পড়া না থাক্‌লেও তার মূল কথা বড় ভালবাস্‌তেন। আর উপনিষদ্ পড়্তেন। উপনিষদের কিরূপ ভক্ত ছিলেন তা আজ মনে পড়্‌ছে। তার কাছে ছেলেবেলা, বেদান্তের কথা শুনেছিলাম বলে আজ বেশ কাটাতে পার্‌চি। আর মনে সুখ হয় যে তাঁর ঘরে জন্মেছিলাম।"

যাহাতে যাত্রীরা সুলভে স্বদেশীয়দের জাহাজে যাতায়াত করিতে পারে তজ্জন্য একসময়ে ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় দশ-হাজার টাকায় একখানি জাহাজ ক্রয় করিয়াছিলেন। জাহাজখানির নামকরণ করিয়াছিলেন "বাটাজোড়।", এই জাহাজ কখনো বরিশাল হইতে শিকারপুর, কখনো ঢাকা হইতে তালতলা, কখনো বরিশাল হইতে পটুয়াখালী যাতায়াত করিত। দত্ত মহাশয়ের মৃত্যুর পরে তাঁহার মধ্যম পুত্র কামিনীকুমার উক্ত জাহাজ, ছয় হাজার টাকায় বিক্রয় করেন। বিদেশীয় ষ্টীমার

কোম্পানী যাত্রীদের অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য করিতেন না, যে ভাড়া আদায় করিতেন তাহাও দরিদ্র লোকসাধারণের পক্ষে দুর্ব্বহ ছিল, ইহারই প্রতিকারার্থ দত্তমহাশয় জাহাজ লাইন খুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রায় চারি বৎসর কাল ঐ ষ্টীমার চলিয়াছিল।

অশ্বিনীকুমারের জননী প্রসন্নময়ী উচ্চকুলোদ্ভূতা ও নানা সদ্‌গুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। তাঁহার মনের বল অসাধারণ ছিল। অশ্বিনীকুমার তাঁহার জননীর কর্ম্মকুশলতা, সহিষ্ণুতা, ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি বহু সদগুণ লাভ করিয়া থাকিবেন।

অশ্বিনীকুমারের মধ্যম সহোদর কামিনীকুমার ধীশক্তি-সম্পন্ন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। পৈতৃক বিষয় সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। তিনি ইংরাজী সাহিত্য, ফরাসী ও লাটীন ভাষায় এবং ইতিহাসে ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তৎপ্রণীত "ভালবাসা" নামক একখানি পুস্তক তৎকালে আদৃত হইত। তিনি তাঁহার নাবালক তিন পুত্র ও দুই কন্যা অগ্রজের হস্তে অর্পণ করিয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

অশ্বিনীকুমারের কনিষ্ঠ সহোদর যামিনীকুমার কলিকাতায় বি, এ, পড়িবার সময়ে জ্বর রোগে মারা যান। তিনি ধর্ম্মপ্রাণ ও অমায়িক ছিলেন। যামিনীকুমার পিতার বহুগুণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।



অশ্বিনীকুমারের সহধর্ম্মিণী

শ্রীযুক্তা সরলাবালা দত্ত

১৫ পৃঃ

দ্বিতীয় অধ্যায়

অশ্বিনীকুমারের আদ্যজীবন

পিতার সঙ্গ ও প্রভাব

অশ্বিনীকুমার সুশিক্ষিত,সচ্চরিত্র,ধার্ম্মিক পিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা জননীর সস্নেহ তত্ত্বাবধানে বাল্যাবধি সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ সৌভাগ্য আমাদের এই অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন দেশে অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটে। বাটাজোড় গ্রামে স্বগৃহে স্বর্গীয় নীলকমল সরকারের নিকট অশ্বিনীকুমার তালপত্রে বর্ণমালা লিখিতে আরম্ভ করেন। এই শিক্ষকমহাশয়ের নিকট অশ্বিনীকুমারের অক্ষরপরিচয় হয়। উক্ত সরকার মহাশয় অতঃপর আমরণ অশ্বিনীকুমারের গ্রামস্থ বাটীতে গোমস্তার কার্য্য করিতেন। অশ্বিনীকুমারের পিতা রাজকার্য্য উপলক্ষে বঙ্গের নানা নগরে গমন করিতেন, শিশু অশ্বিনীকুমার পিতার সহিত থাকিয়া শৈশবে নানা স্থানে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন।

পুত্রের মনে যাহাতে কোনরূপ মিথ্যা অভিমান স্থান না পায় তৎপ্রতি শিশুকাল হইতেই পিতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। একদা কোন এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্রজমোহনের সহিত সাক্ষাৎকার মানসে আগমন করেন। তিনি পুত্র অশ্বিনী-

কুমারকে তামাকু সাজাইয়া আনিবার জন্য আদেশ করেন। বলা বাহুল্য পুত্র অম্লানবদনে পিতার আদেশ প্রতিপালন করেন। অশ্বিনীকুমার অন্যত্র চলিয়া যাইবার পরে আগন্তুক ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার ভৃত্যের অভাব নাই অথচ আপনি আপনার পুত্রকে তামাকু সাজাইবার জন্য আদেশ করিলেন কেন?" উত্তরে ব্রজমোহন বলিলেন—"আমার ছেলে যাহাতে কোন কাজকে হেয় বলিয়া মনে না করে, এই জন্য আমি তাহাকে যে-কোন কাজ করিতে আদেশ করি।"

ব্রজমোহন পুত্র অশ্বিনীকুমারের সহিত অবসর সময়ে পুরাণ ও ইতিহাসের নানারূপ গল্প করিতেন। দেশের নানাশাস্ত্র ও জ্ঞানবিজ্ঞান আলোচনায় যাহাতে তাঁহার আগ্রহ জন্মে তীক্ষ্ণধী পিতার সর্ব্বদা তৎপ্রতি লক্ষ্য ছিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অশ্বিনীকুমার ছেলেবেলা পিতার মুখে বেদান্তের কথাও শুনিয়াছেন। ব্রজমোহন তাঁহার পুত্রকে কদাচ কুসঙ্গে মিশিতে দিতেন না। পুত্রের সঙ্গীরা যাহাতে সচ্চরিত্র হয়, তৎপ্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরাগ ছিল। অতি শৈশবেই উহার চিহ্ন দেখা গিয়াছে। ঘট পাতিয়া ঠাকুর পূজা করা তাহার শৈশবের খেলা ছিল। শিশু বয়সে তিনি কাগজের ঢোলক বাজাইয়া হরিতলায় হরিনাম করিতেন।

ব্রজমোহন যখন বাঁকুড়া জিলার বিষ্ণুপুরে মুন্‌সেফী করিতেন

তখন অশ্বিনীকুমার সেখানকার উচ্চ ইংরাজী স্কুলের নিম্নশ্রেণীতে পড়িতেন। ঐ সময়ে একদা রাত্রিকালে সহরে বাঘ ডাকিতেছিল। অশ্বিনীকুমার পিতার সহিত এক শয্যায় শুইয়াছিলেন। বাঘের ডাক কিরূপ উহা শুনাইবার জন্য তিনি অশ্বিনীকুমারকে ডাকিয়া জাগাইলেন। অশ্বিনীকুমার বাঘের ডাক শুনিলেন। পিতা ঘুমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাঁহার আর ঘুম হইল না। তিনি বলিয়াছেন—"ঐ দিন আমার মনে এক অদ্ভুত ভাবোদয় হইয়াছিল। আমি শুনিয়াছিলাম মানুষ কখনো কখনো বাঘ হয়। বাবার কোলের মধ্যে শুইয়া আমার মনেও বার বার এই চিন্তা জাগিতেছিল—"বাবাই যদি বাঘ হয়!"

অশ্বিনীকুমার তাঁহার পিতার এমন সস্নেহ তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন যে, কোন প্রকার কলুষতা তাঁহার চরিত্র স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি আমাদিগকে ইহা বলিতেন—"পাপ কি, আমার বালক বয়সে আমি তাহা ধারণাই করিতে পারিতাম না।" ইহা হইতে কেহ কেহ হয়ত মনে করিতে পারেন যে, ব্রজমোহন তাঁহার পুত্রকে অতি কঠোর শাসনের মধ্যে রাখিতেন। বস্তুতঃ তাহা নহে। তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে কুসঙ্গে মিশিতে দিতেন না কিন্তু তাঁহাদিগকে স্বাধীনতার আব্‌হাওয়ার মধ্যেই মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন। সুরসিক ব্রজমোহন পুত্রদের সহিত নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদ করিতেন। অশ্বিনীকুমার বলিয়াছেন—"পিতাঠাকুর খুব ছড়া কাটিতে পারিতেন। আমরা যখন নৌকাযোগে এক স্থান হইতে

স্থানান্তরে যাইতাম, তখন কখনো কখনো আমাদিগকে তাঁহার সহিত ছড়া কাটিতে হইত। যথা, তিনি বলিতেন—

পশ্চিমে ডুবিছে সূর্য্য লোহিত বরণ।

কামিনী বা আমি হয়ত পাদপূরণ করিবার জন্য বলিতাম—

আকাশে উঠিছে ঐ তারা অগণন॥

এইরূপ ছড়া কাটিয়া, গল্প করিয়া তিনি আমাদিগকে প্রচুর আমোদ দিতেন।

ব্রজমোমহন দত্ত মহাশয় পুত্রদের সহিত কেবল অভিভাবকের মত নহে বন্ধুর মত ব্যবহার করিতেন। ছোট একটী আখ্যান হইতে ইহা বেশ বুঝা যাইতে পারিবে। একদা তিনি নৌকাযোগে পুত্র অশ্বিনীকুমারের সহিত যাইতেছিলেন। তিনি আপন মনে একটী গান রচনা করিয়া গাহিতেছিলেন। পিতাকে গুন্ গুন্ স্বরে গান করিতে শুনিয়া অশ্বিনীকুমার মাঝে মাঝে অন্যমনস্কভাবে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতেছিলেন। পিতা ব্রজমোহন তখন পুত্রকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—আমি কি গাহিতেছি শুনবি? আমি স্বরচিত একটি গান গাহিতেছি—"মদন রাজার দরবারে আর কার্য্য নাই ইত্যাদি।" তখন তিনি পুত্রকে ঐ গানের তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিলেন। কামরিপু দমন-বিষয়ক উপদেশ-বাক্য তিনি অসঙ্কোচে পুত্রকে বুঝাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন।

নীতিপরায়ণ ধার্ম্মিক পিতার প্রদত্ত এই শিক্ষা ছাত্রাবস্থায় অতি উগ্রভাবেই অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

অতঃপর তিনি যখন কলিকাতায় ছাত্রাবাসে থাকিয়া এম, এ, পড়িতেন, তখন একদিন অপরাহ্ণ-ভ্রমণের পরে আসিয়া বন্ধু ত্রিগুণাচরণ সেনের (স্বনামখ্যাত অধ্যাপক) মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার ঘরে দুইটি ছাত্র অতি অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া অশ্বিনীকুমার ঐ ঘরের সমস্ত দ্রব্য, মেজে, দেওয়াল প্রভৃতি দুই তিনবার উত্তমরূপে ধুইয়া শোধন করিয়া পরে ঐ ঘর ব্যবহার করিয়াছিলেন। অশ্লীলতার প্রতি সেই সময়েই তাঁহার এমনই বিদ্বেষ ছিল।

অশ্বিনীকুমার রংপুর হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা প্রদান করিয়া মাসিক দশ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স চৌদ্দ বৎসর। তখনই তাঁহার চরিত্রে অসামান্য দৃঢ়তা ও নৈতিক তেজ প্রকাশিত হইয়াছিল। স্বীয় নাম গোপন করিয়া "ভক্তিযোগে" তিনি তখনকার এই ঘটনাটি প্রকাশ করিয়াছেন—

একটি বালক চতুর্দ্দশ বৎসরের সময় মাতাপিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন একস্থলে বাস করিতেছিল। সেইস্থলে যাহাদিগের বাড়ীতে থাকিত, তাহারা প্রায় সকলেই ইন্দ্রিয়াসক্ত ও সুরাপায়ী। কেহ কেহ তাহার সম্মুখে বসিয়াই অনেক সময়ে নানারূপে প্রলোভন দেখাইয়া সুরাপান করিত। গৃহস্বামী বাড়ীতে বেশ্যা আনিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। একদিন কতকগুলি লোক সুরাপান করিতেছে এবং বালকটির নিকটে সুরার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ পান করিতে বারংবার

অনুরোধ করিতেছে। তাহাদিগের বাক্য শুনিতে শুনিতে বালকটির সুরাপানে ইচ্ছা জন্মিল। ক্রমে সে সুরাপাত্র ধরিবার জন্য হস্ত বাড়াইবার উপক্রম করিল। যেমন হস্ত বাড়াইবে অমনি তাহার বিদেশস্থ এক প্রাণের বন্ধুর (স্বর্গীয় ভুবনেশ্বর গুপ্ত) ছবি মনে পড়িল। সেই বন্ধুটির প্রতি তাহার গাঢ় অনুরাগ, দুজনে একত্র অনেক সময়ে সুরাপানের বিরুদ্ধে আলোচনা করিয়াছেন। মনে হইল, "আমি কি করিতে যাইতেছি। আমি আজ সুরাপান করিলে কি তাহার নিকট গোপন রাখিতে পারিব? প্রকাশ করিলে সে কি আর আমায় ভালবাসিবে?" একদিকে সুরাপানের মোহময় প্রবল প্রলোভন, অপর দিকে প্রেমের পবিত্র আকর্ষণ, কিঞ্চিৎ কাল পরে সংগ্রামে প্রেমেরই জয় হইল।

অতঃপর অশ্বিনীকুমার কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে এল্, এ অধ্যয়ন করেন। উক্ত কলেজেই তিনি বি, এ পড়িতে আরম্ভ করিয়া চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে উন্নাত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কিছুকাল কেন তাঁহার কলেজে অধ্যয়ন স্থগিত ছিল আমরা তাহা যথাস্থলে বলিব। কলিকাতায় অবস্থান কালে অশ্বিনীকুমার পোষাক পরিচ্ছদে ও জলখাবারে অনেক সময়ে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতেন, তাঁহার পিতৃদেব উহা বাহুল্য বলিয়া মনে করিতেন বন্ধুবৎসল অশ্বিনীকুমারের বস্ত্রাদি তাঁহার দরিদ্র সহাধ্যায়ীরা অসংকোচ ব্যবহার করিতেন, বন্ধুদিগকে লইয়া অনেক সময়ে তিনি আমোদ করিয়া-

খাবার খাইতেন, এই সকল কারণে—পঠদ্দশায় তাঁহার ব্যয় একটু বেশী হইত। অশ্বিনীকুমার আমাদিগকে বলিয়াছেন—

আমি কাপড়ে চোপড়ে ও নানাপ্রকারে যত টাকা খরচ করিতাম, আমার পিতা তাহা অতিরিক্ত বলিয়া মনে করিতেন। ঐ ব্যয় হ্রাস করিবার জন্য তিনি একদিন আমাকে বলিলেন, "দেখ, এখনও আমি নিজের জন্য অত টাকা খরচ করি না।" আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"তাহা তো হইবেই।" পিতা বলিলেন 'কেন?' আমি বলিলাম—"আপনি বা কে, আর আমি বা কে, আপনি বাটাজোড়ের কোন-এক নন্দকিশোর দত্তের ছেলে, আর আমি ছোট আদালতের জজ্—ব্রজমোহন দত্তের ছেলে!"

কলেজে অধ্যয়নকালে অশ্বিনীকুমার—Rowe, Tawney প্রভৃতি স্বনামধন্য অধ্যাপকদিগের পরমপ্রিয় ছিলেন। অশ্বিনীকুমারের বিশুদ্ধ ইংরাজী উচ্চারণ শুনিয়া ছাত্র ও অধ্যাপকগণ সকলে বিস্মিত হইতেন। তাঁহার রচিত একটি ইংরাজী প্রবন্ধ Rowe সাহেবের এমন ভাল লাগিয়াছিল যে, তিনি সেই লেখাটি বহু ছাত্রকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।

কেবল ইংরাজী উচ্চারণ নহে, অশ্বিনীকুমারের বাংলা কথা-বার্ত্তা এমন বিশুদ্ধ, উচ্চারণ এমন মধুর ছিল যে, তিনি যে "বাঙ্গাল" সহাধ্যায়ীরা তাহা বিশ্বাস করিতে চাহিত না। তিনি যখন একদিন কথা প্রসঙ্গে তাঁহার সহাধ্যায়ীদিগকে বলিলেন—আমার বাড়ী বাকরগঞ্জ জিলায়, তখন অনেকে সেই

কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিল। একজন বলিল—আচ্ছা তোমার বাড়ী যদি বাকরগঞ্জ জিলায় হয় ত তোমার দেশী একটা কথা বলত? অশ্বিনীকুমার অনন্যোপায় হইয়া বলিলেন——

"গুয়া বাগানে গরুডা ছারিয়া দেছে কেডারে, লাগুরডা পাইলে ছেরেঙ্গডা ভাইঙ্গা দেতাম।" অর্থাৎ সুপারি বাগানের মধ্যে কে গরু ছাড়িয়া দিল, গরুটাকে ধরিতে পারিলে উহার শিং ভাঙ্গিয়া দিতাম। বলাবাহুল্য অশ্বিনীকুমার এমন দেশী স্বরে দেশী কথা বলিয়াছিলেন যে,ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে তাহার বিস্মিত বন্ধুগণ উহার এক বর্ণও বুঝিতে পারেন নাই।

ধর্ম্মপ্রাণ, শ্রদ্ধাশীল অশ্বিনীকুমার যখন কলেজে পড়িতেন, তখন বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক পাঠেই তাঁহার মন সর্ব্বতোভাবে নিমগ্ন হইয়া থাকিত না। এই সময়ে তিনি প্রাচীন কালের শুশ্রূষু শিষ্যদের মত সর্ব্বজনপূজ্য সাধু-মহাত্মাদের সমীপে তাঁহার শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ভাণ্ড লইয়া উপস্থিত হইতেন। অশ্বিনীকুমারের অন্তরে যে রসের মধুচক্র নির্ম্মিত হইয়াছিল সেই রস তিনি এই সময়েই সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি যুবাকাল হইতে ধর্ম্মশীল ছিলেন।

পুণ্যশ্লোক মহাত্মাদের সংসর্গ

যাঁহাদের পুণ্যচরিত্রের প্রভাব অশ্বিনীকুমারের জীবন-পথের অমূল্য পাথেয়, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী এবং ঋষিতুল্য রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নাম বিশেষ

ভাবে উল্লেখযোগ্য অশ্বিনীকুমার তাঁহাদিগকে গুরুর অধিক আন্তরিক ভক্তি করিতেন। অশ্বিনীকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের ধর্ম্মনিষ্ঠা, নৈতিক তেজ ও সত্যানুরাগ স্বীয় জীবনে নিঃসন্দেহ আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয় সম্বন্ধে অশ্বিনীকুমার পরম শ্রদ্ধাসহকারে নানা কথা বলিতেন। তন্মধ্যে একটি আখ্যান তিনি তৎপ্রণীত "ভক্তিযোগ" গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—আমি এক মহাত্মাকে জানি, তিনি গৃহস্থ। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মেডিকেল কলেজের উচ্চশ্রেণীতে পড়িতেন, অত্যন্ত তেজস্বী ছিলেন ; এই পুত্র বৃদ্ধের ভরসাস্থল। বোধ হয়, পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। যে দিন মৃত্যু হয়, তাঁহার বাড়ীতে আমাদিগের একটি সভা ছিল। আমার দুইটি সহাধ্যায়ী সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখেন, বৃদ্ধ কোন ব্যক্তির সঙ্গে বাড়ীর প্রাঙ্গণে বসিয়া কি আলাপ করিতেছেন। তাঁহারা দুইজনে নিকটে এক আসনে বসিলেন। তন্মধ্যে এক জন কিঞ্চিৎ পরে উঠিয়া যে ঘরে আমাদের সভা হইত সেই ঘরের দিকে চলিলেন। বৃদ্ধ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি জন্য ও ঘরে যাইতেছেন ? তিনি উত্তর করিলেন, 'এডুকেশন্ গেজেট্' আনিবার জন্য। বৃদ্ধ স্থিরভাবে বলিলেন—"ও ঘরে যাইবেন না, ও ঘরে আমার ন—আজ এই চারিটার সময়ে মরিয়াছে।" আমার সহাধ্যায়ী ত শুনিয়া 'ন যযৌ ন তস্থৌ।' একি ! এইরূপ

যোগ্য পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে, বিন্দুমাত্র কাতরতা নাই, এইরূপ দৃশ্য ত আর কখনও দেখা যায় নাই, একেবারে অবাক্, নীরবে আসিয়া পুনরায় বসিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন, "আজ চলুন, আমরা দেওয়ানের বাড়ীতে সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসি।" যাঁহার প্রাণ ভগবদ্‌ভক্তিতে পূর্ণ নহে তিনি কি দুঃখের মধ্যে এমন স্থির থাকিতে পারেন ?

অশ্বিনীকুমার ছাত্রজীবনে এমন ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মার সাহচর্য্য লাভ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের আর একটি ঘটনা অশ্বিনীকুমারকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়াছিল। ঘটনাটি তিনি অনেকের নিকট নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—"লাহিড়ী মহাশয় একদিন কলিকাতা নগরের রাজপথে এক ফুট্‌পাথ্ দিয়া যাইতেছিলেন। আমি তাঁহার পিছনে পিছনে যাইতেছিলাম। একস্থলে কি ভাবিয়া হঠাৎ লাহিড়ী মহাশয় ব্যস্ততার সহিত দ্রুতপদে অপর ফুট্‌পাথে যাইয়া এক গলির মধ্যে প্রবেশ করেন। আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার অনুসরণ করিয়া গলির মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার হঠাৎ এ কি হইল ? আপনি এমন ব্যস্ততার সহিত এই গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন কেন ? তিনি তখন অপর ফুট্‌পাথের একটি লোককে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—ঐ লোকটির কাছে আমি কিছু টাকা পাই; যখনই দেখা হয় ওয়াধা করে, কিন্তু সে ওয়াধা রক্ষা করে না। ওয়াধা করিয়া তাহা রক্ষা না করিলে যে

মিথ্যা বলা হয়, এই বোধ উহার নাই। আজ দেখা হইলে ওয়াধ্বা করিয়া মিথ্যাচরণ করিত। আমার উহা সহ্য হয় না। উহাকে ঐ মিথ্যাচরণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমি এইরূপ ভারে পলায়ন করিয়াছি।”

অশ্বিনীকুমার এই যে মহাত্মার সঙ্গ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তিনি মিথ্যাচরণকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন তাহা এই ঘটনায় সুস্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। সত্যের যে বিমল জ্যোতিঃ অশ্বিনীকুমারের হৃদয় আলোকিত করিয়াছিল, সেই শিখা তিনি মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সংসর্গে লাভ করিয়া থাকিবেন ইহা অসম্ভব নহে।

লাহিড়ী মহাশয়ের তেজস্বিতার এক আখ্যান আমরা বহুবার অশ্বিনীকুমারের মুখে শুনিয়াছি। লাহিড়ী মহাশয় যখন কৃষ্ণনগরে প্রধান শিক্ষকের কার্য্য করিতেন তখন ছোট লাট্ স্যর রিভারস্ টম্‌সন্ একবার তথায় পরিদর্শনোপলক্ষে গমন করেন। কৃষ্ণনগরের মহারাজা বাহাদুর লাট্ সাহেবের সংবর্দ্ধনার্থ এক সভার আয়োজন করেন। আহূত হইয়া লাহিড়ী মহাশয় ঐ সভায় গমন করেন। লাহিড়ী মহাশয় স্যর রিভারস্ টম্‌সনের পূর্ব্বপরিচিত বলিয়া তাঁহাকে দেখিয়াই লাট্ সাহেব করমর্দ্দনার্থ হাত বাড়াইয়া দিলেন। কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় হঠাৎ দ।ক্ষণ হস্তখানি গুটাইয়া পশ্চাতে লইয়া গিয়া বলিলেন— “যে ব্যক্তি ইল্‌বার্ট্ বিলের পক্ষে মত দিয়া থাকেন আমি তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করি না।”

অশ্বিনীকুমার ছাত্রাবস্থায়ই রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের স্নেহাস্পদ হইয়াছিলেন। অনেকেই জ্ঞাত আছেন যে, অশ্বিনীকুমার সকল সম্প্রদায়ের সাধুমহাত্মাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিতেন। বন্ধুরা অনেক সময়ে ব্যঙ্গ করিয়া বলিতেন—অশ্বিনী বাবু 'ইব্রাহিম' ধর্ম্মাবলম্বী। অর্থাৎ তিনি 'ই'শার ভক্ত, 'ব্রা'হ্মধর্ম্মে অনুরাগী, 'হি'ন্দুধর্ম্মকে শ্রদ্ধা করেন, একেশ্বরবাদী 'ম'স্‌লেম্‌দের ধর্ম্মেরও প্রশংসা করিয়া থাকেন। তাঁহার এই সর্ব্বধর্ম্মানুরাগ ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংস, বিশেষতঃ রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সংসর্গ হইতে পাইয়া থাকিবেন। অশ্বিনীকুমারের মুখে শ্রুত

বসু মহাশয় সর্ব্বদা তাঁহার সম্মুখে গীতা, উপনিষদ্‌, বাইবেল, কোরাণ, হাফেজ, শিখদের ধর্ম্মপুস্তক, কবীরের উপদেশ, Leigh Hunt's "Religion of the Heart" প্রভৃতি ধর্ম্ম পুস্তক সাজাইয়া রাখিতেন। তিনি বলিতেন—এই সকল পুস্তক আমার অভিনব 'গ্রন্থ সাহেব'।

অশ্বিনীকুমার মৃত্যুর অনেক বৎসর পূর্ব্বে বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া দীর্ঘকালব্যাপী রোগভোগের পর আনন্দধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। কিন্তু এই অসুস্থতা কদাচ তাঁহার চিত্তের শান্তি এবং হাস্যসুন্দর মুখের চিরপ্রসন্নতা নষ্ট করিতে পারে নাই। সুখে দুঃখে তিনি আনন্দময় দেবতার উপর নির্ভর করিয়া শান্তি ও সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিতেন।

অশ্বিনীকুমারের মুখে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সম্বন্ধে একটি এইরূপ আখ্যান শুনিয়াছি—

ভক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া আমি একবার তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাজগৃহে গিয়াছিলাম। বসু মহাশয় তিন মাস যাবৎ অর্দ্ধাঙ্গ বাতব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। সুতরাং আমি গম্ভীর মুখে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করি। অভিবাদন করিবামাত্র তিনি উৎফুল্ল হইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন—"কি হে অশ্বিনী, এস, এস, কত দিন তোমায় দেখিনা।" এই বলিয়া এক হস্তেই আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। অপর হাতখানি তখন অবশ। 'কেমন আছেন?' এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "পরমানন্দে আছি।" পরক্ষণেই বলিলেন,—"কি এ শরীর সম্বন্ধে—এই পচাটার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ?" তারপরে তিনি গল্প আরম্ভ করিলেন। সেলি, বাইরণ্, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ্ হাফেজ্, গীতা, উপনিষদ্ হইতে যেমন খুসী শ্লোকের পর শ্লোক আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। তাঁর কি আনন্দ, কি ভাবোচ্ছ্বাস! এই মধুর বাক্য শুনিতে শুনিতে মহানন্দে তিন ঘণ্টা যে কেমন করিয়া কাটিয়া গেল তাহা বুঝিতেই পারিলাম না। বিদায়ের সময়ে আমি বলিলাম, আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনার অসুখ দেখিতে আসিয়াছিলাম বলিয়া গম্ভীর মুখে ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, আপনার আনন্দ আর ধরে না, তিন মাস বিছানায় পড়িয়া আছেন, আপনার কি কোন কষ্ট

বোধ হয় না ? তখন তিনি উত্তর করিলেন—"অশ্বিনী, আমি এখন বৃদ্ধ হইয়াছি, যাঁর কৃপায় এত বছর কত সুন্দর দৃশ্য, কত সুন্দর স্থান দেখিয়া অবর্ণনীয় আনন্দ পাইয়াছি, তাঁর ইচ্ছায় কি কয়েকটা বছর সন্তুষ্টচিত্তে রোগশয্যায় শুইয়া থাকিতে পারিব না ?" অশ্বিনীকুমার এমনই সোণার মানুষের ছোঁয়া পাইয়া স্বয়ং সোণা হইয়াছিলেন।

আধুনিক বরিশালের স্থষ্টিকর্ত্তা অশ্বিনীকুমার যে বরিশাল নগর তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন, উহার মূলেও রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আদেশ ছিল বলিয়া মনে হয়। বসু মহাশয় অশ্বিনীকুমারকে বলিয়াছিলেন—"অশ্বিনী, যদি কাজ করিতে চাও বরিশালে থাকিও, আর যদি খুব নাম করিতে চাও, কলিকাতায় আসিও।"

অশ্বিনীকুমারের চাল-চলন, বলিবার ভাবভঙ্গী, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি অনেকটা ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের তুল্য ছিল। কেশবের সহিত একত্র বাস করিবার সুযোগ না ঘটিলেও তিনি যে তাঁহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন অশ্বিনীকুমার তাহা স্বীকার করিতেন। তিনি বলিতেন—"অজ্ঞাতসারে কেশবের অনুকরণ করিয়া আমার জীবনে তাঁহার প্রভাব যৎখানি পড়িয়াছে, বোধ হয় আর কোন ব্যক্তির প্রভাব তেমন পড়ে নাই।" অধ্যয়নকালেই তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের সংস্রবে আইসেন। তাঁহার প্রভাবই অশ্বিনীকুমারকে বঙ্গদেশে সমাজসংস্কারক এবং ছাত্রমহলে সুনীতির প্রতিষ্ঠাতৃ-



ভক্ত কেশব

৩৮ পৃঃ

রূপে মহনীয় করিয়া তুলিয়াছে। কেশবের কাছে "অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা" পাইয়াই অশ্বিনীকুমার 'আগুনের হল্‌কা' হইতে পারিয়াছিলেন। এইরূপ সুশিক্ষা পাইয়াছিলেন বলিয়াই 'স্বদেশীর' যুগে তিনি গাহিতে পারিয়াছিলেন—

অগ্নিময়ী মাগো আজি ডাকি সকলে মা।
জগৎজোড়া ঐ যে আগুন, এক ফিন্‌কি দে তার মা॥
ঐ আগুনের একটু পেলে,
এই মড়া প্রাণ উঠ্‌বে জ্বলে,
রুদ্রদীপ্ত তেজানলে
পুড়ে হব সোণা।
বিকট ভীষণ দৈত্যবংশ
ঐ আগুনে মা কর্‌ব ধ্বংস
পাঁষণ্ড অসুর হীন নৃশংস
ধরায় রাখ্‌ব না।
মা, মা, মা।

অধ্যয়নকালে অশ্বিনীকুমার যে সকল পরমভাগবত মহাত্মার পুণ্যস্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব উহাঁদের অন্যতম। পরমহংসদেবকে অশ্বিনীকুমার বলিতেন—"রসের সাগর।" রসলোভী অশ্বিনীকুমার এই মহাত্মার নিকট বহুবার গিয়াছেন। একটি বিশেষ স্মরণীয় দিনে তিনি পরমহংদেবের আশ্রমে ছিলেন। সেদিন ব্রহ্মানন্দ কেশব

জাহাজে করিয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিবেন। ভক্তের সহিত ভক্তের মিলন হইবে। ভক্ত কেশবকে দেখিবার জন্য পরমহংসদেবের কি ব্যাকুলতা! জাহাজ আসিবার সময় যত অগ্রসর হইতেছিল পরমহংদেবের ব্যাকুলতা ততই বাড়িয়া যাইতেছিল। আবার নিজের অবস্থা বর্ণনা করিয়া তিনি নিজেই বলিতেছিলেন—

"পাতের উপর পড়ে পাত—
রাই বলে, ঐ এল বুঝি প্রাণনাথ।"

নদীর দিকের প্রত্যেকটি শব্দ শুনিয়া পরমহংদেবের অস্থিরতা বাড়িতেছিল। যখন ষ্টীমার ঘাটে আসিল তখন পরমহংসদেব বলিয়া উঠিলেন—

"(তোরা) জেনে আয় জাহ্নবীর তীরে হরি বলে কেরে।"

কেশবের কাছে যাইয়া পরমহংসদেব বলিলেন—"কেশব, তোমার চিরাদনই কি এই রীত ?"

কেশব যখন কলিকাতা ফিরিয়া যাইতেছিলেন, তখন পরমহংসদেব ষ্টীমারে উঠিয়া বসিলেন। ষ্টীমার ছাড়িবার সময় হইল তিনি আর নামেন না। পরমহংসদেবের ভাগিনেয় বলিলেন—"মামা, চল নেমে পড়ি, জাহাজ ছাড়বে এখন।"

পরমহংদেব নামিলেন না, বলিলেন,—"যার রাধা তার সঙ্গে গেল।"

আর একদিন আশ্বনীকুমার তাঁহার প্রিয় সুহৃদ্ জগদীশবাবুকে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই

জগদীশবাবুর প্রতি পরমহংসদেবের স্নেহের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি অশ্বিনীকুমারকে বলিলেন—"এটিকে কোথায় পেলে? ভাল, বড় ভাল!" তখন নানা কথা চলিতে লাগিল। আবার পরমহংসদেব জগদীশবাবুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"এটিকে কোথায় পেলে? বেশ, বেশ!"

অশ্বিনীকুমারের কথিত আর একটি ঘটনা নিম্নে দেওয়া গেল—কোন্ এক ব্যক্তি পরমহংসদেবের ওখানে মূল্যবান্ ছড়ি ফেলিয়া গিয়াছিলেন, পরমহংসদেব ভাগিনেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছড়ি ফেলে গেল কে?"

ভাগিনেয় বলিলেন—"বোধ হয়, সেই অশ্বিনীবাবু।"

পরমহংসদেব বলিলেন—"না।"

কিছুদিন পরে আমি যখন তাঁহার কাছে গিয়াছিলাম, ভাগিনেয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ছড়ি আপনার?" আমি বলিলাম—"না।" পরমহংসদেব বলিয়া উঠিলেন—"আমি ত বলিয়াছিলাম, অশ্বিনী নয়, যে শালা ফেলে গেছে তার মুখময় গু।"

পরমহংসদেব সম্বন্ধে অশ্বিনীকুমার বহু কথাই বলিতেন। আর একটি ঘটনা এই স্থলে বলা হইল—

জাতীয় মহাসমিতির এক অধিবেশনের পরে কাশীতে মহাত্মা ভাস্করানন্দ স্বামীর সহিত দেখা করিয়া অশ্বিনীকুমার দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের নিকট আসিয়াছেন। সেখানে তিনি ভাস্করানন্দ সম্বন্ধে কথা তুলিলেন। উহা শুনিয়া শিশু-

স্বভাব পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন—“সে ভাল, না আমি ভাল?” অশ্বিনীকুমার তখন বিপন্ন, এই প্রশ্নের তিনি কি উত্তর দিবেন? তখন অন্য কথা তুলিলেন। আবার কিছুক্ষণ পরে পরমহংসদেব সেই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—“আচ্ছা, সে ভাল না, আমি ভাল?” অশ্বিনীকুমার বলিলেন—“তিনি কত বড় জ্ঞানী।” পরমহংসদেব মলিনমুখে বলিলেন—“হাঁ, আমি মূর্খ, লেখাপড়া জানি না।” অশ্বিনীকুমার আবার বলিলেন—“তা হোক্‌গে, আপনি বড় আমুদে”। পরমহংসদেব প্রসন্নমুখে হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন—“সত্যি নাকি? আমি আমুদে?”

বিবাহ

অশ্বিনীকুমার যখন প্রেসিডেন্সী কলেজে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন তখন কিঞ্চিদধিক সতর বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় ছোট আদালতের জজ্‌ ও ধনী ছিলেন। তিনি পুত্র অশ্বিনীকুমারের বিবাহে খুব ঘটা করিয়াছিলেন। এই বিবাহেই উক্ত অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম ব্যাণ্ডের বাদ্য এবং হাতী আনয়ন করা হইয়াছিল। এই দুই নূতন ব্যাপারে উক্ত বিবাহ লোকসাধারণের মনে খুব উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল এবং লোকে বহুকাল পর্য্যন্ত এই বিবাহের গল্পগুজব করিত।

অশ্বিনীকুমারের শ্বশুরবংশ নথুল্লবাদের ‘রায় মিল্লবহর’

বাকরগঞ্জ জিলার অতি পুরাতন ভূম্যধিকারী ও বঙ্গজ কুলীন কায়স্থ বলিয়া পরিচিত।

বিবাহকালে অশ্বিনীকুমারের পত্নী সরলাবালার বয়স নয় বৎসর চারি মাস ছিল। স্কুল-কলেজে সুশিক্ষা লাভের সুযোগ না পাইলেও এই বুদ্ধিমতী মহিলাকে 'বিদুষী' বলা যাইতে পারে। মহাত্মা অশ্বিনীকুমার স্বয়ং তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। পুঁথিগত বিদ্যায় তিনি সুপণ্ডিতা না হইতে পারেন—কিন্তু অশ্বিনীকুমারের মত মনীষী মহাত্মার সংসর্গে এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু জগদীশ, মন্মথনাথ লাহিড়ী, নগেন্দ্রনারায়ণ, ক্ষেত্রনাথ, গুণদাচরণ, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তীক্ষ্ণধী ব্যক্তিগণের সহিত নানা বিষয়ে আলাপ ও আলোচনা করিয়া তিনি বিবিধ বিষয়ে যথার্থ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিদ্যার্থীরা পুস্তক পাঠ করিয়া ভারতবর্ষের যে সকল তীর্থ, নগর ও ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের বিবরণ জ্ঞাত হইয়া থাকে এই ভাগ্যবতী স্বামীর সহিত দেশভ্রমণ করিয়া সেই সকলের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। নূতন তথ্য জানিবার জন্য তাঁহার মনে সর্ব্বদা কি প্রকার একটি কৌতূহল জাগরিত আছে তৎসম্বন্ধে একটি সামান্য আখ্যান মনে পড়ে—একবার তিনি স্বামীর সহিত ধানবাদের সমীপস্থ গোবিন্দপুরে বাস করিতেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ, গুণদাচরণ, জগদীশ প্রভৃতি কতিপয় অন্তরঙ্গ বন্ধুও সেখানে গিয়াছিলেন। অপরাহ্নে তিনি স্বামীর সহিত সান্ধ্যভ্রমণে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ এবং আরও দুই একজন বন্ধু ছিলেন। সেখান দিয়া

গ্রাণ্ড্ট্রাঙ্করোড্ চলিয়া গিয়াছে। তিনি প্রশ্ন করিলেন…"এই রাস্তা কোথায় গিয়াছে, ইহাকে গ্র্যাণ্ড্ট্রাঙ্করোড্ বলা হয় কেন?" নরেন্দ্রনাথের উপর এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ভার পড়িল। তিনি বলিলেন…"সের শাহের আমলে এই রাস্তা নির্ম্মিত হয়, তখন রেলপথ ছিল না, তখন এই রাস্তা দিয়া সৈন্যগণ যাতায়াত করিত, দেশের বাণিজ্যদ্রব্য এই রাস্তা দিয়া এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে প্রেরিত হইত, লোকে রাজধানী দিল্লীনগরে এই পথে যাইত। ইংরাজরাজ কোন জিনিষ, কোন কীর্ত্তি নষ্ট হইতে দেন না। তাঁহারা এই পুরাতন রাস্তাটিকে যথাসম্ভব, পূর্ব্বের মতই রক্ষা করিয়াছেন। দেশে যদি কখন বিদ্রোহ হয়, বিদ্রোহীরা যদি রেলপথ নষ্ট করে, তখনও এই পথে ইংরাজের সৈন্য চলিতে পারিবে।" নরেন্দ্রনাথ থামিয়া যাইবার পরে অশ্বিনীকুমার বলিলেন, "ইনি যাহা বলিলেন তাহা মনে রাখিও, তৎসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখিও যে, সেকালে কত তীর্থযাত্রী সাধুমহাত্মা এই পথ দিয়া কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার প্রভৃতি তীর্থে গমন করিয়াছেন, তাঁহাদের পদরেণু এই পথকে পবিত্র করিয়া রাখিয়াছে, তাঁহাদের কেহ কেহ দস্যুহস্তে প্রাণ হারাইয়াছেন, সেই সকল সাধুর দেহাবশেষ এই পথের ধূলার সহিত মিশিয়া রহিয়াছে।"

অশ্বিনীকুমারের পত্নী সরলাবালা বুদ্ধিমতী ও সুশিক্ষিতা। সামাজিক, নৈতিক এবং দেশ-হিতকর সকল প্রসঙ্গই তিনি দক্ষতার সহিত আলোচনা করিতে পারেন, কিন্তু আচারে,

ব্যবহারে তিনি চিরদিন লজ্জাশীলা হিন্দুবধূর মতই চলিতেছেন বলিয়া কদাচ স্বামীর সহিত কোন সভায় প্রকাশ্যভাবে যোগদান করেন নাই।

অশ্বিনীকুমারের দাম্পত্য জীবনের একটি কথা সঙ্কোচের সহিত আমাদিগকে প্রকাশ করিতে হইল। তিনি বিবাহিত হইয়াও অবিবাহিত চির-কুমারের মত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিয়াছেন। সুন্দরী, সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর সহিত আমরণ গৃহধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়াও অশ্বিনীকুমার ব্রহ্মচর্য্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়া যে সংযম ও চরিত্রবল প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কল্পনাতীত।

বিবাহের পরে কয়েক বৎসর মধ্যে তিনি এক সময়ে গভীর অভিনিবেশসহকারে খ্রীষ্টভক্ত সাধু পলের রচনাবলী পাঠ করিতেছিলেন। তন্মধ্যে তিনি বহুস্থানে দৈহিক শুচিতারক্ষার বিষয় পাঠ করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হন। তিনি বিবাহিত, তিনি কি করিয়া সর্ব্বতোভাবে দৈহিক শুচিতা রক্ষা করিবেন ইহাই তাঁহার ভাবনার বিষয় হইল। তিনি তাঁহার তখনকার মনের ভাব সুদীর্ঘ আটপৃষ্ঠাব্যাপী এক পত্রে পত্নীকে জানাইলেন। তিনি তখন পঞ্চদশবর্ষবয়স্কা বালিকা। পরমেশ্বর যোগ্যের সহিতই যোগ্যের মিলন ঘটাইয়া থাকেন। বুদ্ধিমতী পত্নী অবিচলিত দৃঢ়তার সহিত পত্রোত্তরে জানাইলেন—“আমি তোমার সহধর্ম্মিণী, তুমি ধর্ম্মজীবনে উন্নত হইবার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ বিবেচনা কর, তাহাই করিও। আমি

কদাচ উহাতে বাধা দিব না, বরং যতদূর পারি তোমাকে সাহায্যই করিব।”

অশ্বিনীকুমার বিবাহিত ছিলেন। কিন্তু তিনি অবিবাহিত ব্রহ্মচারীর জীবনই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তন করিতেন। দেশহিত সাধনের নিমিত্ত অবিবাহিত ব্রহ্মচর্য্যব্রতধারীর দল গঠনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মনে ছিল। তাঁহার মনের এই আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা তদীয় সুযোগ্য বন্ধু শ্রীযুত জগদীশ মুখোপাধ্যায়, স্বর্গীয় মন্মথনাথ লাহিড়ী, শ্রীযুত নগেন্দ্রনারায়ণ রায়ের জীবনে কার্য্য করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার এই আদর্শ অংশতঃ অনেক ছাত্রের জীবনে কার্য্য করিয়া থাকিবে।

মিথ্যাচরণের জন্য অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত

বাল্যকাল হইতে অশ্বিনীকুমার উপাসনাশীল ছিলেন। বন্ধু ত্রিগুণাচরণ সেন ও ভুববনেশ্বর গুপ্তকে লইয়া তিনি একটি উপাসনা-সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। এই সভায় তাঁহারা তিন জনে পালাক্রমে উপাসনা করিতেন। যিনি সত্যস্বরূপ, যিনি জ্ঞানস্বরূপ, যিনি অনন্ত ইঁহারা সেই শুদ্ধ-অপাপবিদ্ধ, আনন্দময় দেবতার একনিষ্ঠ উপাসক ছিলেন।

এইরূপ উপাসনার ফলে এবং ধর্ম্মপ্রাণ কেশবের প্রভাবে ও থিয়োডোর পার্কারের পুণ্যময় জীবনচরিত পাঠ করিয়া অশ্বিনী-কুমারের শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে সত্যের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। অতি সামান্য অপবিত্রতাও তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইত। নিজের

জীবনের একটি মিথ্যা এই সময়ে তাঁহার কাছে উজ্জ্বলরূপে ধরা পড়িল। তখন পরীক্ষার্থীর বয়স ষোল না হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া যাইত না। প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়ে অশ্বিনীকুমারের বয়স অনুমান চৌদ্দ বৎসর ছিল। এক্ষণে সাধারণতঃ যাহা করা হয় তাঁহার বেলাও ঠিক তাহাই হইয়াছিল। প্রেসিডেন্সী কলেজে চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময়ে এই বিষয়টির অসত্যতা তাঁহার উপলব্ধি হইল। মিথ্যাদ্বারা স্বীয় জীবন কলঙ্কিত হইল ভাবিয়া ধর্ম্মশীল অশ্বিনীকুমার অস্থির হইলেন। তাঁহার মনে এই প্রশ্ন উঠিল,—এই মিথ্যাকে নীরবে মানিয়া লইলে আমি কেমন করিয়া সত্যস্বরূপ দেবতার আরাধনা করিব? মিথ্যাচরণ ও ঈশ্বরোপাসনা এই দুইয়ের সামঞ্জস্য হইতেই পারে না। এই মিথ্যা সংশোধনের জন্য তিনি তাঁহার মনোভাব প্রথমতঃ কলেজকর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় সত্যনিষ্ঠ যুবকের বক্তব্য শুনিয়াও কিছু প্রতিকার করিলেন না। কিন্তু এই মিথ্যাচরণের জ্বালা অসহ্য হওয়ায় অশ্বিনীকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের সহিত দেখা করিয়া বয়স সংশোধনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তিনি যুবককে বলিলেন—"এখন এই বিষয়টি হাতছাড়া হইয়াছে, আর কিছু করিবার সাধ্য নাই।" অশ্বিনীকুমারের এই আচরণকে পাগলামি মনে করিয়া তিনিও তাঁহাকে থামিয়া যাইবার জন্য মিষ্ট বাক্যে উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিদায় কারলেন।

স্বীয় অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য অশ্বিনী-

কুমার এই সময়ে কিছুদিনের জন্য পাঠে বিরত হন। তাঁহার চিত্ত যখন এইরূপে অশান্ত ছিল তখন তিনি চারিটি পয়সা মাত্র সম্বল করিয়া নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়াছিলেন। পিতাকে একপত্রে পাঠবিরতির সঙ্কল্প জানাইয়াছিলেন। বন্ধুবৎসল অশ্বিনীকুমারের বন্ধু ত্রিগুণাচরণ সেন ও জনার্দ্দন দাস তাঁহাদের শ্রদ্ধেয় সুহৃদের সহিত কিয়দ্দূর গমন করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, ভক্ত অশ্বিনীকুমার মনের আনন্দে একাকী অপরিচিত পথে চলিতেছিলেন! দ্বিতীয় দিন দ্বিপ্রহরের ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর হইয়া তিনি পুঁজির চারিটি পয়সার দুই পয়সা ব্যয় করিয়া আখ ও কলা ক্রয় করিলেন। এতদ্দ্বারা ক্ষুধাতৃষ্ণা কথঞ্চিৎ নিবারণ করিয়া আবার পথ চলিতে লাগিলেন। তখন চৈত্রমাস, প্রখর সূর্য্যকিরণের মধ্যে সমস্ত দিন পথ চলিয়া দিবা-বসানে অশ্বিনীকুমার শ্রান্ত-ক্লান্ত হইয়া পথিপার্শ্বস্থ এক গৃহস্থের বাড়ী উপস্থিত হইলেন। তিনি তথায় পানীয় জল প্রার্থনা করিলেন। জল ও মুড়ি-মুড়কি পাইয়া সাগ্রহে ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণ করিলেন। এই বাড়ীর মহিলারা তরুণবয়স্ক পর্য্যটকের ক্লান্তসুন্দর মুখ দেখিয়া স্নেহস্বরে বলিয়াছিলেন—"আহা, ছেলেটি বিরাগী হইয়াছে।" এখান হইতে তিনি নিকটবর্ত্তী হাটে গমন করিয়া এক বৃক্ষমূলে নিদ্রিত হইয়া পড়েন। যখন রাত্রি প্রায় এক প্রহর তখন প্রিয়দর্শন যুবক অশ্বিনীকুমার এক স্নেহশীল ভদ্রলোকের দৃষ্টিপথে পতিত হন। তিনি তাঁহাকে কিয়দ্দূরে লইয়া গিয়া একখানি তক্তপোষ দেখাইয়া

দিলেন অশ্বিনীকুমার সেই শয্যাশূন্য তক্তপোষে আপনার হাত উপাধান করিয়া শয়ন করিলেন। প্রেমময় দেবতার অযাচিত প্রেম ধ্যান করিতে করিতে পরমানন্দে সুনিদ্রায় তিনি রাত্রি যাপন করেন। তৃতীয় দিন তিনি চন্দননগরে এক বন্ধুভবনে অভ্যর্থিত হইলেন। বন্ধুদের অনুরোধে এখানে তিনি উপাসনা করিয়াছিলেন। প্রত্যূষে তিনি ভাবাবেশে গান গাহিতে গাহিতে আবার পথ চলিতে লাগিলেন। প্রেমের আবেগে এক ধাঙ্গড়কে বক্ষে জড়াইয়া ধরিবার ইচ্ছা তাঁহার হইয়াছিল। তিনি উচ্চকণ্ঠে গাহিতেছিলেন—"আমার মন ভুলাল যে কোথায় আছে সে।" ভাববিহ্বল অশ্বিনীকুমার পথিমধ্যে একটি বৃক্ষকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া গাহিয়াছিলেন, "বল দেখিরে তরুলতা, আমার জগজ্জীবন আছেন কোথা ?"

এইদিন অশ্বিনীকুমার মাধবপুর নামক স্থানে এক ধনী বৃদ্ধের ভবনে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ অশ্বিনীকুমারের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অশ্বিনীকুমার বলিলেন, —"আমার পিতা যশোহরে সরকারী চাকুরী করেন!" বৃদ্ধ বিরক্তিসহকারে বলিলেন—"চাকুরী করেন, আরে কি চাকুরী করেন, শুনি না ? অশ্বিনীকুমার উত্তর করিলেন—"ছোট আদালতের জজ্।" যে ব্যক্তি পথে পথে উদাসীনের ন্যায় দরিদ্রভাবে ঘুরিয়া বেড়ায় তাঁহার পিতা যে, "জজ্" হইতে পারেন বুদ্ধিমান্ বিষয়ী বৃদ্ধ তাহা কিছুতে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন—"উঃ, উনি আবার

জজের ছেলে।” এই অভদ্র-ভাষণে সত্যনিষ্ঠ অশ্বিনীকুমার আশ্রয়দাতা বৃদ্ধের বাক্যের তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। তিনি বলিলেন—“আপনারা সর্ব্বদা মিথ্যা বলেন কিনা, তাই লোকে যে সত্য কথা বলিতে পারে তাহাও বিশ্বাস করিতে পারেন না।” প্রতিবাদকালে অশ্বিনীকুমারের মুখে এমন ভাব প্রকটিত হইয়াছিল যে তদ্দর্শনে ভৎ‍র্সিত হইয়াও বৃদ্ধের আর বাঙ্ নিষ্পত্তি করিবার সাধ্য রহিল না। আহারান্তে অশ্বিনীকুমার উচ্ছিষ্ঠ মোচনে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন, তখন উক্ত বৃদ্ধই তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। এই দিন এক পুষ্করিণীর ঘাটে অশ্বিনীকুমার সুনিদ্রায় নিশাযাপন করেন।

অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে অশ্বিনীকুমার আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। এই দিন আর কোন স্থানে আতিথ্য গ্রহণের সুযোগ ঘটিল না। পুঁজির অবশিষ্ট দুই পয়সা দ্বারা মুড়িমুড়কি কিনিয়া জঠরানল নিবৃত্ত করিলেন। পথিমধ্যে এক গোযান-চালকের সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইলেন। অল্পকালমধ্যে শকটবাহক মধুরভাষী অশ্বিনীকুমারকে তাহার গাড়ীতে উঠিতে অনুরোধ করিল। আতপতপ্ত পথশ্রান্ত অশ্বিনীকুমার সাগ্রহে শকটারোহণ করিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। চাঁদের স্নিগ্ধ আলোকে চারিদিক যেন হাসিতেছিল। এই শোভা দেখিতে দেখিতে তিনি অনতিবিলম্বে নিদ্রাভিভূত হইলেন। পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য এক চিকিৎসা-ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের গৃহে অতিথি হইলেন। চিকিৎসক

মহাশয় অশ্বিনীকুমারকে সস্নেহে ভোজন করাইয়া বলিলেন— "এখন যেমন গরম পড়িতেছে, তাহাতে এমনভাবে রৌদ্রে পথ চলিলে তুমি শীঘ্রই অসুস্থ হইবে। তোমার আর এরূপ ভ্রমণ করা সঙ্গত নহে।" অশ্বিনীকুমার স্নেহশীল চিকিৎসক মহাশয়ের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এখান হইতেই যশোহরে ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন। এইখানে এক ব্যক্তি তাঁহার পরিচয় জানিতে পাইয়া তাঁহাকে ট্রেণে ফিরিবার জন্য পাথেয় প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, অশ্বিনীকুমার উহা গ্রহণ করেন নাই।

ভ্রমণযাত্রার সপ্তম দিনে তিনি বর্দ্ধমান হইতে পদব্রজে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। দ্বিপ্রহরে ক্লান্ত হইয়া এক পুষ্করিণীর কর্দ্দমাক্ত জলে স্নান করিয়া ক্লান্তি দূর করিলেন। অনন্যোপায় হইয়া উক্ত অপেয় জল পান করিয়া তিনি তৃষ্ণা নিবারণ করেন। মনের সুখে পথক্লেশ সহিতে সহিতে অশ্বিনীকুমার অপরাহ্নে পথিপার্শ্বে এক বিদ্যালয় গৃহ দেখিতে পাইয়া তথায় গমন করেন। সেখানে বিদ্যালয়ের ভৃত্য তাঁহাকে পানীয় জল প্রদান করিল। এই ভৃত্যের নির্দ্দেশ মত তিনি এক ব্যক্তির বাড়ীতে অতিথি হইয়া সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। প্রভাত সময়ে আবার পথ চলিতে চলিতে গঙ্গাতীরে এক খেয়াঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রিক্তহস্ত অশ্বিনীকুমারের খেয়ার কড়ি ছিল না। একটি পয়সার অভাবে তিনি তথায় বসিয়া রহিলেন। অশ্বিনীকুমারের আকৃতিপ্রকৃতি,

চলন-বলন সমস্তের মধ্যেই অসাধারণত্বের সুস্পষ্ট ছাপ ছিল। তাঁহার মধুর বাক্যে মোহিত হইয়া এক ভদ্রলোক তাঁহাকে পয়সাটি দিয়াছিলেন।

খেয়া পার হইয়া অশ্বিনীকুমার পরপারে আসিয়াছেন। চৈত্রের অপরাহ্ন, আকাশ ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন, আসন্ন ঝটিকার প্রাক্কালীন্ ভীষণ স্তব্ধতায় তখন চারিদিক ভীত-চকিত। অশ্বিনীকুমার তখন অপর কোন আশ্রয় দেখিতে না পাইয়া এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে তথায় উপবিষ্ট দেখিয়া এক ব্যক্তি চীৎকার করিয়া বলিল—"তুমি এমন সময়ে ওখানে বসিয়া আছ কেন? ভীষণ ঝড় আসিতেছে দেখিতে পাইতেছ না?" অশ্বিনীকুমার ধীরকণ্ঠে বলিলেন—"তা' উপায় কি?" লোকটি বলিল—"নিকটে থানার ঘর আছে, শীঘ্র আমার সঙ্গে চল।" অশ্বিনীকুমার থানায় পঁহুছিতে না পঁহুছিতে ভীষণ শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভগবৎ-প্রসাদে থানায় তাঁহার আশ্রয় হইল। ভোজনান্তে তিনি এক কনেষ্টবলের তক্তপোষে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করেন। নবম দিন অশ্বিনীকুমারের শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি আর পূর্ণোদ্যমে চলিতে পারিতেছিলেন না। ক্লান্তি দূর করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে পথিপার্শ্বে বৃক্ষমূলে শয়ন করিতেছিলেন। দ্বিপ্রহরে ভিক্ষালব্ধ তণ্ডুল চর্ব্বণ করিয়া জলপানে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি করিয়া রাত্রিকালে এক সঙ্গিসহ গদখালী থানায় উপস্থিত হন। এখানে এক ভদ্রলোক তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

"একি এ যে আমাদের জজ্‌বাবুর ছেলে!" এখানে তিনি যথোচিত অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন। পরদিন সত্যনিষ্ঠ অশ্বিনীকুমার যশোহরে উপস্থিত হইয়া পিতৃচরণ বন্দনা করেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা ও যশোহরে ধর্ম্মসভা

অনুতপ্ত অশ্বিনীকুমার মিথ্যার প্রায়শ্চিত্তের জন্য যখন কলেজের পাঠে বিরত ছিলেন তখন তিনি যশোহরে পিতার তত্ত্বাবধানে থাকিয়া সংস্কৃত ধর্ম্মগ্রন্থ ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজকদিগের জীবনী আগ্রহ সহকারে অধ্যয়ন করিতেন। এতন্মধ্যে Foxe's "Book of Martyrs" বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অশ্বিনীকুমারের অধ্যয়ন অনুরাগ অসাধারণ ছিল। ভাষাতত্ত্ববিৎ হইবার আকাঙ্ক্ষা কোন দিনও তাঁহার চিত্ত অধিকার করিতে পারে নাই। তিনি ছিলেন রসজ্ঞ ভক্ত। ইংরাজী, সংস্কৃত, পারসী প্রভৃতি নানাভাষার গ্রন্থে ভক্তিতত্ত্বের যে সকল মহামূল্য বাণী রহিয়াছে, সেই সকল ভক্তবাণীর রসগ্রহণই ছিল অশ্বিনীকুমারের ভাষা শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনার উদ্দেশ্য। তুলসীদাসের রামায়ণ অধ্যয়ন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি হিন্দিভাষা, 'গ্রন্থসাহেব' পড়িবার জন্য গুরুমুখী ভাষা, ভক্ত হাফেজের বাণী পড়িবার জন্য পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। হাফেজের বহু বয়াৎ তিনি সরল সরস ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। সেই বাণীসমূহ "মণিমালা" নামে বরিশালের "ব্রহ্মবাদী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে।

পুরীতে অবস্থানকালে তিনি উড়িয়া ভাষা শিক্ষা করিয়া "দার্ঢ্য ভক্তি রসামৃত" নামক ভক্তচরিতমালা পাঠ করেন। মহামতি তিলক-সম্পাদিত "কেশরী" পত্রিকা পড়িবার জন্য তিনি মারাঠী-ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল ভাষা শিখিয়াছিলেন ঐ সকলের প্রত্যেক ভাষায় তাঁহার বিশেষরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল কিনা জানিনা। কিন্তু ইহা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, তিনি অল্প-বিস্তর যে-ভাষাই জানিতেন সেই সেই ভাষায় লিখিত ভক্তচরিত ও ভক্তি-তত্ত্বের রসগ্রহণে তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এই সকল ভক্তবাণী তিনি এমন ভাবে ব্যাখ্যা করিতেন যে, তাহা শুনিলে শ্রোতাদের হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইত। পারসী ভাষায় তাঁহার জবান্ (উচ্চারণ) এমন সাফ (পরিষ্কার) ছিল যে, মৌলবীরা সেই উচ্চারণের প্রশংসা করিতেন। ব্রজমোহন কলেজে যখন তিনি ছাত্রদিগকে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ্ পড়াইতেন তখন গীতা হইতে, রবীন্দ্রনাথের কবিতা হইতে নানা শ্লোক আবৃত্তি করিয়া তাহাদিগকে মোহিত করিয়া ফেলিতেন।

অশ্বিনীকুমারের সংস্কৃত ভাষায় ও বিবিধ শাস্ত্রে কিরূপ গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল তৎপ্রণীত 'ভক্তিযোগ', 'কর্ম্মযোগ', ও 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' প্রভৃতি পুস্তক পাঠে তাহা অবগত হওয়া যায়। ব্রজমোহন কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত কামিনীকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সহিত অশ্বিনীকুমারের সংস্কৃত শাস্ত্রালাপ হইত। তিনি বলেন,—"অশ্বিনীকুমার সংস্কৃত ভাষার বিশেষ অনুরাগী

ছিলেন। তিনি প্রত্যহ আমার সহিত কিছুকাল সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতেন। তিনি অনর্গল নির্ভুল সংস্কৃত বলিতে পারিতেন। অশ্বিনীকুমার শ্রীমদ্‌ভাগত, উপনিষদ্‌সমূহ, এবং ঋগ্বেদ প্রভৃতি এমন সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করিতেন যে, তাহা শুনিয়া সাধারণে ঐ সকল গ্রন্থের অর্থ বুঝিত এবং রসাস্বাদন করিয়া মোহিত হইত। অশ্বিনীকুমারের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। ইংরাজী, সংস্কৃত, পারসী, বাঙ্গলা সকল ভাষার সুন্দর দীর্ঘ কবিতা একবার মাত্র পড়িয়া তিনি নির্ভুল আবৃত্তি করিতে পারিতেন। নারদ ও শাণ্ডিল্যঋষিপ্রণীত সূত্রগুলি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।" একবার কর্ণেল অল্‌কট্‌ বরিশালে দেড় ঘণ্টাকাল ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। বক্তৃতান্তে অশ্বিনীকুমার সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া দেড় ঘণ্টাকাল বাঙ্গলা ভাষায় বক্তৃতা করিয়া কর্ণেল সাহেবের প্রদত্ত বক্তৃতার প্রত্যেকটি বাক্যের অর্থ শ্রোতাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারের স্মৃতিশক্তি এমনই প্রখর ছিল।

অশ্বিনীকুমারের বয়স যখন আঠার বৎসর তখন তিনি যশোহরে "সাধারণ ধর্ম্মসভা" স্থাপন করিয়া তথায় স্বয়ং উপাসনা ও শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন। আঠার বৎসর বয়সের তরুণ যুবকের প্রাণস্পর্শী ধর্ম্মোপদেশ শুনিয়া সভায় কখন হাসি, কখন ক্রন্দনের রোল উঠিত। ষাট সত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধ শ্রোতারা এই যুবকের মুখে ধর্ম্মকথা শুনিয়া আনন্দে উন্মত্ত হইতেন এবং অসঙ্কোচে তাঁহাকে পাপ কি, পুণ্য কি, ত্রিতাপ কি ইত্যাকার বহু প্রশ্ন

করিতেন। অশ্বিনীকুমার সকলের প্রশ্নাবলীর সদুত্তর প্রদান করিয়া তাঁহাদের বিস্ময়োৎপাদন করিতেন।

এই ধর্ম্মসভার এই একটি বিশেষত্ব ছিল যে তথায় সার্ব্বভৌম ধর্ম্মই প্রচারিত হইত। উক্ত সভায় এক ইয়ুরোপীয় ধর্ম্মযাজক খৃষ্টধর্ম্ম, জনৈক পণ্ডিত হিন্দুশাস্ত্র এবং এক মৌলবী এস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। এবম্প্রকার বৈচিত্র্যই ঐ ধর্ম্মসভার প্রতি জনসাধারণের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মসভার আদর্শে উত্তরকালে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের "বান্ধব সমিতি" নামক ধর্ম্মসভা গঠিত হইয়াছিল।

যশোহরে অবস্থানকালে অশ্বিনীকুমারের সহিত পূজনীয় জগদীশবাবু এবং পরলোকগত প্রিয়নাথ রায়ের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়। এই সময়কার একটি ঘটনা অশ্বিনীকুমার তৎপ্রণীত "ভক্তিযোগ" গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ঘটনাটি এই—

একস্থানে দুইটি যুবক বাস করিত। একটি স্কুলে, অন্যটি কলেজের উচ্চশ্রেণীতে পড়িত। একদিন কোন কারণবশতঃ উভয়ের মধ্যে বিবাদের সৃষ্টি হয়। পরদিন স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় তাহা জানিতে পারিয়া স্কুলের ছাত্রটিকে কলেজের ছাত্রটির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বলেন। ছাত্রটি বলিল—"আমি কোন অপরাধ করি নাই যদি করিয়া থাকি ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।" এই বলিয়া সে অভিমানে কাঁদিতে লাগিল।

ছাত্রটি প্রত্যহ যুবকটির বাড়ী যাইত। কিন্তু বিবাদ হওয়ার পরে সে আর যায় না। ইহাতে যুবকটির যারপর নাই কষ্ট হইতে লাগিল। সে যখনই উপাসনা করিতে বসিত তখনই তাহার মনে পড়িত, ভক্ত যীশু বলিয়াছেন—"যদি তুমি তোমার নৈবেদ্য নিবেদন করিবার জন্য বেদীর নিকটে আনিয়া থাক এবং সেই সময়ে তোমার মনে পড়ে, কোন ভ্রাতা তোমার প্রতি কোন কারণে বিরক্ত হইয়াছেন, আগে যাও, তাঁহার সহিত মিলন করিয়া আইস, পরে তোমার নৈবেদ্য নিবেদন করিও।" সে ভাবিত, যতক্ষণ না যুবকটির সহিত মিলন হইবে, ততক্ষণ ভগবান্ তাহার প্রার্থনা কি স্তবস্তুতি গ্রাহ্য করিবেন না। তিনি প্রেমময়, হৃদয়ে বিন্দুমাত্র অপ্রেম থাকা পর্য্যন্ত ভগবানের নিকট উপস্থিত হইবার অধিকার নাই। ইহাই ভাবিয়া সে অধীর হইয়া পড়িল। এদিকে তাহার জ্বর হইয়াছে সুতরাং সে অপর যুবকটির নিকটে উপস্থিত হইতে পারিল না। যাই জ্বর আরোগ্য হইল, অমনি ছুটিয়া গিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—"ভাই, আমাদের মধ্যে মিলন হওয়া প্রয়োজন, কেন এরূপ অপ্রেমের ভাবকে হৃদয়ে স্থান দিব?" সে নিতান্ত বিরসমুখ হইয়া বলিল—"তাহা হইবে না, কাচ ভাঙ্গিলে কি আর তাহা জোড়ান যায়?"

এই বাক্য শুনিয়া সে দিবস তাহাকে নিরস্ত হইয়া আসিতে হইল, বলিয়া আসিল, "আমি পুনরায় কাল উপস্থিত হইব, প্রত্যেক দিন আসিব, যে পর্য্যন্ত পুনরায় মিলন না হয়।" তারপর

দিন পুনরায় সে বাড়ীতে উপস্থিত হইল, কিন্তু এদিবস আর তাহাকে বাড়ীতে পাইল না। পরদিন যে স্কুলে সেই যুবকটি পড়িত সেই স্কুলে এক সভা ছিল। ছাত্রদিগের অনুরোধে অপর যুবকটি তথায় উপস্থিত হইল। একটি ছাত্র রচনা পাঠ করিল। তাহার পাঠ শেষ হইলে যাই সেই রচনা সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিবার অনুরোধ হইল, অমনি একটি ছাত্র দাঁড়াইয়া বলিল—"অদ্য আমরা এস্থলে রচনা শুনিতে, কি তৎসম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে উপস্থিত হই নাই, আমাদিগের কোন বন্ধুর অনুরোধে সভায় উপস্থিত হইয়াছি। তাহার নাকি কি বক্তব্য আছে।" এই ছাত্রটির বাক্য শেষ হইবামাত্র ছাত্রটি উঠিয়া বলিতে লাগিল—"ইহারা সকলে আমার অনুরোধে এখানে উপস্থিত। সে দিন হয়ত কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, আমি—বাবুর নিকট ক্ষমা চাহিয়াছি, তাহা চাহি নাই, চাহিবার কোন কারণ নাই।" এইরূপ বলিয়া তাহার প্রতি কতকগুলি কটূক্তি করিতে লাগিল। শিক্ষক মহাশয় অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া তাহাকে শাস্তি দিবেন ভাবিলেন, কিন্তু কলেজের ছাত্রটি তাঁহাকে বারংবার নিষেধ করায় তাহা পারিলেন না। আজ সে দৃঢ় হইয়া আসিয়াছে, মিলন করিতেই হইবে! যাই স্কুলের ছাত্রটি বসিল অমনি কলেজের ছাত্রটি উঠিয়া পুনরায় মিলন প্রার্থনা করিল। স্কুলের ছাত্রটি ঘন ঘন শ্বাস ছাড়িতে ছাড়িতে বলিল—"মিলন, মিলন হইতেই পারে না। Reconciliation, reconciliation can not take place!"

এই কথায় বিন্দুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া কলেজের ছাত্রটি প্রেমের মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিল এবং তাহার নিকট আবার ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহার প্রাণস্পর্শী কথাগুলি সকলকে আকুল করিয়া তুলিল। বক্তা ও শ্রোতা সকলেরই চক্ষু প্রায় জলে পরিপূর্ণ। স্কুলের ছাত্রটি ধীরে ধীরে গাত্রোত্থান করিয়া টেবিলের উপর হইতে আপনার পুস্তকগুলি তুলিয়া লইল। তখন কলেজের ছাত্রটি আরও মর্ম্মান্তিক যাতনা পাইয়া বলিল—"কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, চলিয়া যাইও না, আমার এই কয়েকটি কথা শুনিয়া যাও, আমাকে ক্ষমা কর, নির্দ্দয় হইও না।" এইরূপে করুণস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কত কি বলিতে লাগিল। সে মনে করিয়াছিল স্কুলের ছাত্রটি বুঝি তাহার কথা শুনিতে চায়না বলিয়া গাত্রোত্থান করিয়া সভা হইতে চলিল। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রেম সর্ব্বজয়ী, তাহার সেই মিলনের মিষ্ট কথাগুলি তাহার প্রাণে লাগিয়াছে আর সে থাকিতে পারিল না, ছুটিয়া বক্তার নিকটে গিয়া তাহার দুখানি হাত ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে, "আমায় ক্ষমা করুন" বলিতে বলিতে অস্থির হইয়া পড়িল। এই মিলন আর কখনও বিরোধের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

এলাহাবাদে অশ্বিনীকুমার

যশোহর হইতে অশ্বিনীকুমার পিতৃনিদেশে এলাহাবাদে "প্লীডারসিপ্" পড়িতে গমন করেন। উক্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদিন এলাহাবাদে ওকালতি করিয়াছিলেন।

তখন ৺কালীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় অশ্বিনীকুমারের সঙ্গে ছিলেন। ইনিই অতঃপর অশ্বিনীকুমারের "ভারতগীতি" পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই এলাহাবাদ নগরে অবস্থান কালে "বঙ্গবাসী" পত্রিকার সম্পাদক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সহিত অশ্বিনীকুমারের বন্ধুত্ব হয়। এলাহাবাদে অশ্বিনীকুমার অতি অল্পদিন ছিলেন। একদিন আদালতে চলিয়া যাইবার পরে দিবাভাগেই তাঁহার বাসায় চুরি হয়। টাকাকড়ি, জিনিষপত্র সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমারের চিত্ত চঞ্চল হইল, তিনি মাকে লিখিলেন—"মা, আমার এখানে থাকিতে ইচ্ছা হয় না, আমি দেশে ফিরিতে চাই, পাথেয় পাঠাইয়া দাও।"

বি, এ পরীক্ষা ও শিক্ষকতা

এলাহাবাদ হইতে অশ্বিনীকুমার কৃষ্ণনগরে ফিরিয়া আইসেন। এইরূপে দুই বৎসর অতিবাহিত হইল। বয়স মিথ্যালিখনের প্রায়শ্চিত্ত শেষ করিয়া তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে বি, এ পড়িতে আরম্ভ করেন। এই কলেজ হইতেই তিনি বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন কলেজিয়েট্ স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কৃষ্ণনগর স্কুলে শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার ছাত্র ছিলেন। উত্তর কালে ইনি ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই নগরে অবস্থানকালে তিনি পরলোকগত স্যর আশুতোষ চৌধুরী, শরৎকুমার লাহিড়ী, লালমোহন ঘোষ,

মনোমোহন ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়দিগের সহিত সুপরিচিত হইয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার যখন কৃষ্ণনগরে অধ্যয়ন করিতেন তখন তদানীন্তন ছোট লাট্ স্যর এস্‌লি ইডেন্ কলেজ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কলেজের পক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমার স্বরচিত একটি সনেট্ অর্থাৎ চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিয়া ছোটলাট্ সাহেবকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ইহার পরে দ্বিতীয় বার যখন ছোটলাট্ বাহাদুর কৃষ্ণনগরে গমন করেন তখন ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎকারকালে অশ্বিনীকুমারকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। দত্ত মহাশয় উহাতে সম্মত হন নাই।

ঊনিশ বৎসর বয়সে অশ্বিনীকুমার যখন চাত্রা স্কুলের প্রধান শিক্ষক হইয়া তথায় গমন করেন, তখন ঐ স্কুলের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ছাত্রগণ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল ছিল। তাহারা কুৎসিত বাক্য বলিয়া খুব আমোদ পাইত। অশ্বিনীকুমার ছাত্রদের নৈতিক দুর্গতি দেখিয়া বিমর্ষ হইলেন। কিন্তু তিনি কঠোর শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি জানিতেন, নির্দ্দোষ পবিত্র আনন্দের আস্বাদন পায় না বলিয়াই ছাত্রদের মন কুৎসিত আমোদের দিকে প্রধাবিত হয়। অশ্বিনীকুমার তাহাদের মন ফিরাইবার জন্য তাহাদিগকে লইয়া গঙ্গায় নৌকায় বেড়াইতেন, তাহাদের সহিত গান বাজ্‌না, আমোদ আহ্লাদ করিতেন। ছাত্রগণ এই সোণার চশ্‌মা-পরা ছোট মাষ্টারটিকে

পাইয়া বসিল। তাহারা সত্য সত্যই তাঁহার ঘাড়ে চড়িত, পিঠে চাপড় মারিত, দুয়ার ভাঙ্গিয়া রান্না ঘরে প্রবেশ করিয়া খাদ্যদ্রব্যগুলি খাইয়া যাইত। অশ্বিনীকুমার এই সমস্ত অত্যাচার সহিতেন, কিন্তু ছাত্রদিগকে কুকথা বলিতে, কুসঙ্গে মিশিতে দিতেন না। একদিন একটি অধিক বয়সের যুবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "স্যর, আপনার কি বিয়ে হয়েছে?" অশ্বিনীকুমার যখন বলিলেন—"হাঁ", তখন সে চুপ করিয়া রহিল। একটু পরে অশ্বিনীকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি এই প্রশ্ন করিতেছ কেন?" যুবকটি বলিল—"আর বলিলে কি হইবে? আমার একটি বিবাহযোগ্যা মেয়ে ছিল।" অশ্বিনীকুমার গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলেন। আর একদিন এক ছাত্র বলিল—"স্যর, আপনি আমাদিগকে অশ্লীল বাক্য বলিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমরা বড় বিপদেই পড়িয়াছি, কোন্‌টা শ্লীল, কোন্‌টা অশ্লীল অতদূর বুঝিবার সাধ্য আমাদের নাই। আপনি ঐ লাইব্রেরীতে সমস্ত অশ্লীল শব্দগুলির এক তালিকা টাঙ্গাইয়া রাখুন আমরা ঐগুলি মুখস্থ করিয়া রাখিব, আর কখনও ঐ শব্দগুলি বলিব না। ছোট ছেলেদেরও ঐগুলি মুখস্থ করাইয়া সাবধান করিয়া দিব, তাহারাও বলিবে না।"

ছাত্রটির উক্ত বাক্য শুনিয়া অশ্বিনীকুমার হাসিয়া ফেলিলেন। ক্লাসে হাসির রোল উত্থিত হইল।

আর একদিন অশ্বিনীকুমার বিদ্যালয় গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, স্কুলগৃহের দেওয়ালে সর্ব্বত্র A. K. D. (অশ্বিনী

কুমার দত্ত) লেখা রহিয়াছে। তিনি বলিলেন, "আজ আমার প্রতি এ অনুগ্রহ কে করিয়াছেন?" একটি ছাত্র বলিল—"স্যর, এতদিন আমরা দেওয়ালে অশ্লীল কথা লিখিতাম, আজ তাহা লিখি নাই, আজ আপনার নাম লিখিয়াছি।" তখন অশ্বিনীকুমার গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"তোমাদের মধ্যে কে এই কাজ করিয়াছ, বল।" একটি ছাত্র উঠিয়া স্বীকার করিল। অশ্বিনীকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি শাস্তি হইবে বল?" সে বলিল—"আমি স্বহস্তে দেওয়ালের সমস্ত লেখা পুছিয়া দিতেছি।" ছাত্রদের সহিত হেড্‌মাষ্টারের এমন অবাধ মেলামেশা গ্রামবাসীদের আলোচনার বিষয় হইল। বিদ্যালয়ের সেক্রেটরী নন্দলাল গোস্বামী মহাশয় বালক হেড্‌মাষ্টারকে ডাকিয়া ধম্‌কাইলেন। কিন্তু তিনি ধমক্ মানিলেন না। কয়েক মাস মধ্যে ছাত্রদের আশ্চর্য্য নৈতিক পরিবর্ত্তন দেখিয়া গোস্বামী মহাশয় বিস্মিত হইলেন।

এম, এ ও বি, এল্ পরীক্ষা

অশ্বিনীকুমার কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে ইংরাজী সাহিত্যে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

তখনকার একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমরা বহুবার তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—"আমার বয়স যখন উনিশ কি কুড়ি তখন একদিন হঠাৎ আত্মচিন্তা করিতে করিতে মনে হইল, এই বয়সেই আমি অন্ততঃ উনিশ রকমের পাপ করিয়াছি।

নিজের এইরূপ দুর্গতি দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। চিত্তের স্ফূর্ত্তি দূর হইল। সে দিন আর কোন কাজে উৎসাহ রহিল না। সমস্ত দিনটা নিরানন্দে কাটিয়া গেল। সে দিন রবিবার ছিল। অপরাহ্ণে ত্রিগুণা ও ভুবনেশ্বর আসিয়া বলিল—'চল, সমাজে যাইবে চল'। আমার মন এমন অবসন্ন ছিল যে, সমাজে যাইবার জন্য কোনরূপ উৎসাহ বোধ করিতেছিলাম না। ত্রিগুণা একরূপ টানাটানি করিয়া আমাকে লইয়া গেল। কিন্তু মন্দিরে প্রবেশ করিয়াই শুনিলাম, সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল মহাশয় গাহিতেছেন—

"ধর ধৈর্য্য ধর, ক্রন্দন সম্বর,
আশা কর, নিরাশ হ'য়ো না, হ'য়ো না।"
পাপীর ক্রন্দনধ্বনি, শুনিবেন জননী,
চিরদিন দুঃখ রবেনা, রবেনা।

গান শুনিয়া আমি যেন নব জীবন পাইলাম। এ যেন আমাকেই বলা হইতেছে, ভগবান্ আমাকে আশা দিতেছেন। উপাসনান্তে মন্দির হইতে বাহির হইয়া আমি মনের আনন্দে বন্ধুদের পৃষ্ঠে গুম্ গুম্ করিয়া 'কীল' মারিতে লাগিলাম। তাহারা বিস্মিত হইয়া বলিল, ব্যাপার কি? আমি বলিলাম, "কীল খাবি না? আমায় নিয়ে গিয়েছিলি মড়া, আর আমি বেরিয়ে এসেছি জ্যান্ত।"

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় বলেন, "অশ্বিনী-



ব্যবহারাজীবী অশ্বিনীকুমার

পৃঃ ৬৫

কুমার যুবাবয়সেই ধর্ম্মজীবনে উন্নত ছিলেন। আমরা যখন ছাত্র-জীবনে মির্জ্জাপুরে ছাত্রাবাসে থাকিতাম, তখন তিনি এক সময়ে প্রত্যহ আমাদের ছাত্রাবাসে প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার প্রাণোন্মাদিনী প্রার্থনায় আমরা মোহিত হইতাম। ছাত্রাবাসে সর্ব্বদা যেন ধর্ম্মের সমীরণ প্রবাহিত হইত। আমাদের সঙ্গে শ্রীযুক্ত নবকান্ত গুহ থাকিতেন। তাঁহার চিত্ত ভাবে এমন মাতোয়ারা হইয়াছিল যে, আকাশে মেঘ উঠিলে তিনি ছাদে যাইয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিতেন।"

ওকালতি

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি ছোট লাট্ স্যর এস্‌লি ইডেন্ মহোদয় অশ্বিনীকুমারকে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ অশ্বিনীকুমারের পিতা এমন শক্তিশালী উচ্চ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন যে, তিনি ইচ্ছা করিলে তাঁহার সুশিক্ষিত পুত্র অশ্বিনীকুমারকে উচ্চ বেতনে উচ্চ রাজকার্য্যেই নিযুক্ত করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু দত্ত মহাশয় দীর্ঘকাল চাকুরী করিয়াছিলেন বলিয়াই চাকুরীর মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি বলিতেন—"আমার বংশে আর কেহ গোলামী করে, ইহা আমি ইচ্ছা করিনা।"

বি, এল্ পাশ করিয়া অশ্বিনীকুমার স্বেচ্ছায় বরিশাল সহরে আইনের ব্যবসায় করিতে আইসেন। ওকালতি আরম্ভ করিবার সময়ে তিনি তাঁহার খুল্লতাত বিখ্যাত ব্যবহারজীব

স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট উৎসাহ পাইয়াছিলেন। বরিশাল সহরে অশ্বিনীকুমারই সর্ব্বপ্রথম এম, এ, বি, এল উপাধিধারী উকীল। তাঁহার প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি, সুললিত ইংরাজী ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করিবার ক্ষমতা, বিশুদ্ধ উচ্চারণ অত্যল্পকালমধ্যে তাঁহাকে সর্ব্বজনপ্রিয় করিয়া তুলিল। তাঁহার সওয়ালজবাব শুনিবার জন্য শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলে আদালতে ভিড় করিত। তিন বৎসরকাল ওকালতি করিয়া তিনি বরিশাল সহরের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় প্যারীলাল রায়,দীনবন্ধু সেন ও গোরাচাঁদ দাস ব্যতীত অপর কেহ তাঁহার সমকক্ষ বলিয়া গণ্য হইতেন না। বরিশালের ন্যায় ক্ষুদ্র সহরে আইনব্যবসায়ে তাঁহার মাসিক আয় চারি পাঁচ শত টাকা হইয়াছিল। মাননীয় ৺ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, "তীক্ষ্ণধী অশ্বিনীকুমার অনন্যচিত্ত হইয়া আইনের ব্যবসায় করিলে তিনি স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সমকক্ষ হইতে পারিতেন।" কিন্তু যে সত্যনিষ্ঠাহেতু অশ্বিনীকুমার ছাত্রজীবনে কিয়ৎকাল অধ্যয়নে বিরত ছিলেন, সেই সত্যনিষ্ঠাই তাঁহাকে ওকালতি ব্যবসায়ে দীর্ঘকাল নিরত থাকিতে দেয় নাই। এই সময় ধর্ম্মসভার কার্য্যে, দেশের কাজে তাঁহার যেমন অনুরাগ ছিল ওকালতির প্রতি উহার শতাংশের একাংশও ছিল না। প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ তিনি এমন হেলায় নষ্ট করিতেছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতা ও আত্মীয়-স্বজনেরা সর্ব্বদা দুঃখ প্রকাশ করিতেন।

এই ব্যবসায়ে তাঁহার আদৌ অনুরাগ ছিল না, অবশেষে এমন হইয়াছিল যে, তিনি যেন-তেন প্রকারে কাজ শেষ করিয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতেন। অনেক সময় মনে মনে বলিতেন—"মা আমায় ঘুরাবি কত।" অবশেষে যে ঘটনায় তিনি আইনের ব্যবসায় ত্যাগ করেন সেই ঘটনাটি এই—

বরিশালে এক সব্‌জজ্‌ ছিলেন, তাঁহার এইরূপ খেয়াল ছিল যে, নিম্ন আদালতে যে-সকল দলিল তলপ করা হইত না উচ্চ আদালতে দরকার হইলেও তিনি তাহা উপস্থিত করিতে দিতেন না। অশ্বিনীকুমার এই সব্‌জজের আদালতে এক মামলায় তাঁহার মক্কেলের পক্ষে যে বিষয় ধরিয়া যুক্তি প্রদর্শন করিতেছিলেন নিম্ন আদালতে তাহার দলিল দাখিল করা হয় নাই। বিপক্ষের বৃদ্ধ উকীল তখন বলিলেন, এই যে বিষয়ে যুক্তি দেখান হইতেছে এই বিষয়ে নিম্ন আদালতে কি কোন দলিল দাখিল করা হইয়াছিল? অশ্বিনীকুমার যদি সত্য উত্তর দিয়া বলেন, "না" তাহা হইলে তাঁহার মক্কেল মামলায় হারিয়া যায়। তিনি চতুরভাবে হাঁ, না, কিছুই না বলিয়া তাঁহার হস্তস্থিত সমস্ত দলিল বিচারকের সম্মুখে ধপাস্‌ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—"মহাশয়, এইত সমস্ত দলিল রহিয়াছে, পেশ করা হইয়াছে কিনা দেখিয়া লউন।" এই মামলায় অশ্বিনীকুমার আপনার অন্তরের অন্তরে এই মিথ্যাচরণের তীব্র জ্বালা এমন ভাবে অনুভব করিয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে আর আইনের ব্যবসায় করা সম্ভবপর হইল না।

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষক অশ্বিনীকুমার

অশ্বিনীকুমার শিক্ষকরূপেই বিশেষভাবে পূজিত হইয়া-থাকেন। ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় বর্জ্জন করিয়া তিনি শিক্ষাদান করাই তাঁহার জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই শিক্ষাক্ষেত্রেই তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য আশ্চর্য্যরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি একাধারে ছাত্রদের শিক্ষক, বন্ধু ও পিতা ছিলেন। কেবল সদুপদেশের দ্বারা নহে, নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি ছাত্রদের মনে সদ্‌ভাব জাগরিত করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। যাহারা শিক্ষার্থিরূপে তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহারা জানেন অশ্বিনীকুমারের সঙ্গগুণে শত শত বালক ও যুবকের চরিত্রে পুণ্যপ্রেমের রং ধরিত। বিদ্যার্থীরা তাঁহাকে বিদ্যালয়ে অধ্যাপকরূপে, গৃহে সহৃদয় বন্ধুরূপে, রোগীর শয্যাপার্শ্বে সহযোগী সেবকরূপে, ধর্ম্মসভায় আচার্য্যরূপে প্রাপ্ত হইত। বালক ও যুবকদিগের অন্তর্নিহিত সদ্‌গুণগুলিকে তিনি নানা দিক্ হইতে ফুটাইয়া তুলিবার সহায়তা করিতেন। অশ্বিনী-কুমারের লোকোত্তর চরিত্রের অসামান্য প্রভাবই বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতার মূল কারণ। ছাত্রগণ যাহাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে অশ্বিনীকুমার সর্ব্বদা

সেই চেষ্টা করিতেন বলিয়াই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশদেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এমন একদিন গিয়াছে যখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র-মাত্রেই একটু বিশেষত্বের ছাপ প্রাপ্ত হইত। ছাত্রগণ এই বিশেষত্ব কোথায় পাইত? চরিত্রবলসম্পন্ন অশ্বিনীকুমারই তাহাদের সম্মুখে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে বিদ্যমান ছিলেন। ছাত্রগণ দেখিত, অশ্বিনীকুমার এমন আশ্চর্য্য পুরুষ যে, তিনি যাহা উপদেশ দিয়া থাকেন স্বয়ং তাহা আচরণ করেন। অশ্বিনীকুমারের যে সত্যানুরাগ তাঁহাকে ব্যবহারাজীবের অর্থকরী উপজীবিকা ত্যাগ করিয়া বিনা বেতনে শিক্ষকের ব্রতগ্রহণে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল, তাঁহার যে নরসেবাবৃত্তি তাঁহাকে অকুণ্ঠিত চিত্তে বিসূচিকারোগীর সেবায় নিয়োজিত করিত সেই সত্যানুরক্তি ও সেবার দৃষ্টান্ত ছাত্রদের তরুণ চিত্তের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার না করিয়া পারিত না।

'আপনি আচরি ধর্ম্ম পরকে শিখায়।

উপদেষ্টা যাহা বলেন, তিনি তাহা স্বয়ং করেন এমন দৃষ্টান্ত সংসারে দুর্ল্লভ। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অশ্বিনীকুমারকে এমনি উপদেষ্টারূপে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ই অশ্বিনীকুমারের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মক্ষেত্র। তিনি বলিতেন,—"ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ইতিহাসই আমার জীবনচরিত।" ১৮৮৪ অব্দের ২০এ জুন অশ্বিনীকুমার নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন প্রচার করেন—বর্ত্তমান

সময়ে বরিশাল নগরে একটি ইংরাজী বিদ্যালয়ের অভাব আছে। এখানকার সরকারী ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, স্থানাভাববশতঃ উক্ত বাটীতে শিক্ষাকার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন যে, স্কুল গৃহের কুঠরীসংখ্যা আর বৃদ্ধি করা যায় না। ছাত্রবেতন বৃদ্ধির জন্যও প্রস্তাব হইয়াছিল। যদি কেহ ইতোমধ্যে বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রসর হন, সরকার তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত। এই সময়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন নিতান্ত প্রয়োজন হওয়ায় আগামী ২৭এ জুন হইতে এই নগরে ইংরাজী এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত শিক্ষার উপযোগী এক স্কুল স্থাপিত হইয়া রীতিমত কার্য্য আরম্ভ হইবে, জুন মাসের বেতন দিতে হইবে না, জুলাই মাস হইতে ছাত্রদিগের বেতন দিতে হইবে। কতিপয় কৃতবিদ্য উপযুক্ত শিক্ষক আসিতেছেন। যে ছাত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় স্কুলে প্রথম হইবে তাহাকে তাহার ইচ্ছামত ৫০৲ টাকার একটি পুরস্কার দেওয়া হইবে। বরিশালের সরকারী স্কুলে যেমন পাঠ্য পুস্তক নির্দ্দিষ্ট আছে এই স্কুলে সেইরূপ পাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হইল। এই বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য স্থানীয় কতিপয় উপযুক্ত লোকদ্বারা এক কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠন করা হইবে।

আপনার ঐকান্তিক ইচ্ছায় সরকারী শিক্ষাসমিতি ও তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের অনুরোধে

অশ্বিনীকুমার তাঁহার পিতা ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

১৮৮৪ অব্দের ২৭এ জুন ৮৪টি ছাত্র লইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। দ্বিতীয় দিনে ছাত্রসংখ্যা ১১৪, তৃতীয় দিনে ১৭৯ এবং চতুর্থ দিনে ২৩৪ হইল। সরকারী বৎসর শেষ হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ ৩১এ মার্চ্চ ছাত্রসংখ্যা ৩৭৫ হয়; ১৮৮৬ অব্দের ৩১এ মার্চ্চ ছাত্রসংখ্যা ৪৪২ হইয়াছিল। এইরূপে অত্যল্পকাল মধ্যেই নব-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি বৃহৎ আকার ধারণ করিল। প্রথমে জেলরোডে ৺হরিঘোষের ভাড়াটিয়া পাকাবাড়ী ও তৎসংলগ্ন টিনের ঘরে স্কুল বসিত।

বরিশালের অন্যতম উকীল স্বর্গীয় পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই বিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ৺কামিনী কুমার দত্ত, ৺মন্মথনাথ লাহিড়ী, ৺কামিনীকান্ত বিদ্যারত্ন, ৺খোসালচন্দ্র রায়, ৺রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,৺রসিকলাল রায়, ও ৺রামচন্দ্র দাসগুপ্ত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠাকালেই এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ণবাবুর পরে বাবু বিষ্ণুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহোদয়গণ যথাক্রমে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৮৪ অব্দের শেষভাগে স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিযুক্ত হন। ১৮৮৬ অব্দে তিনি প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। তিনি পনর বৎসরের অধিক কাল দক্ষতার সহিত এই পদে কার্য্য করিয়া কলেজের সহকারী অধ্যক্ষপদে উন্নীত হন।

তাঁহার সময়েই ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের খ্যাতি দেশবিদেশে পরিব্যাপ্ত হয়। কালীপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে অশ্বিনীকুমারের মনে অতি উচ্চ ধারণা ছিল। তাঁহার তুল্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক অতি বিরল। অশ্বিনীকুমার বলিতেন, "বরিশালে দুই ব্যক্তিকে আমি তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য নিষ্ঠাসহকারে সম্পাদনের জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, এক জন গোপাল মেথর, অন্যজন কালীপ্রসন্ন।" বস্তুতঃ কালীপ্রসন্ন বাবু কোন কারণে কোন দিন তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে রেখামাত্র ভ্রষ্ট হন নাই। ব্রজমোহন বিদ্যালয়টিকে তিনি তাঁহার প্রাণের মত ভালবাসিতেন। একসময়ে তিনি সরকারী বিদ্যালয়ে মাসিক দেড়শত টাকা বেতনে চাকুরী পাইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের মায়া কাটাইয়া তিনি সেই চাকুরী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি তাঁহার স্নেহপ্রীতির দ্বারা সকলকে আপনার করিয়া লইতে পারিতেন। আমরা যখন তাঁহার চরণতলে শিক্ষালাভের সুযোগ পাইয়াছিলাম তখন কালীপ্রসন্ন বাবুর সম্বন্ধে এই ছড়াটি প্রচলিত ছিল—

"হেড্‌মাষ্টার কালীপ্রসন্ন
রূপ নাই তাঁর, গুণে ধন্য"

কালীপ্রসন্ন বাবু ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে যেমন ভালবাসিতেন, কোন শিক্ষক কোন বিদ্যালয়কে তেমন ভালবাসিতে পারেন, আমরা ইহা কল্পনা করিতেও পারি না।

কালীপ্রসন্ন বাবুর পরে সুপণ্ডিত, ঋষিকল্প শ্রীযুক্ত



শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায়

জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের আসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁহার সুশিক্ষাগুণে ও চরিত্রপ্রভাবে শত শত বালক মানসিক ও নৈতিক উন্নতিলাভ করিয়া ধন্য হইতেছে। অশ্বিনীকুমারের আহ্বানে তাঁহার প্রবর্ত্তিত শিক্ষার নূতন আদর্শকে সফল করিয়া তুলিবার জন্য যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে তদীয় সুযোগ্য বন্ধু জগদীশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অর্থের লোভে নহে, শিক্ষাবিস্তার করিয়া যথার্থ মানুষ তৈয়ার করিবার জন্যই ইনি শিক্ষকতাব্রত গ্রহণ করেন। জগদীশের এম্, এ পড়িবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু বি, এ পাশের পরে যখন তিনি তাঁহার পরার্থপর বন্ধুর স্বার্থগন্ধশূন্য আহ্বান প্রাপ্ত হইলেন, তখন আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া উক্ত মহৎ কর্ত্তব্য সাধনে বন্ধুর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইলেন। চিরকুমার জগদীশ অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন মেধাবী পুরুষ। বহুশাস্ত্রে ইহাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য। ইনি এক সময়ে প্রবেশিকা শ্রেণীতে ইংরাজি সাহিত্য, ইণ্টার-মিডিয়েট্ ক্লাসে লজিক ও সংস্কৃত এবং বি এ,শ্রেণীতে জ্যোতিষ-শাস্ত্র পড়াইতেন। গীতা, ভাগবত, ষড়দর্শন প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে জগদীশের পাণ্ডিত্য অতি গভীর। উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্র তিনি আত্মচেষ্টায় অতি সুনিপুণভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন।

বরিশাল সহরে তিনি কিছুকাল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য করিতেন। এক সময়ে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে

গীতাপাঠের জন্য একটি ক্লাস খোলা হইয়াছিল। জগদীশ ছয় বৎসরকাল এই ক্লাসে নিয়মিতরূপে অধ্যাপনা করিতেন। ষাট সত্তর জন ছাত্র তাঁহার নিকট গীতা অধ্যয়ন করিত। স্কুল ও কলেজ স্বতন্ত্র হওয়ার পরে এই ক্লাসটি উঠিয়া যায়। কতিপয় অনুরাগী বন্ধুর অনুরোধে ১৯০৪ কি ১৯০৫ অব্দ হইতে জগদীশ প্রত্যেক রবিবার প্রাতে তাঁহার আশ্রমে শাস্ত্রপাঠ ও ব্যাখ্যায় সম্মত হন। প্রথমে এই সভায় শ্রোতৃসংখ্যা অল্প ছিল। কিন্তু এখন শত শত নর-নারী এই আদর্শচরিত্র ভক্তের মুখনিঃসৃত ধর্ম্মকথা শুনিবার জন্য প্রত্যেক রবিবার তাঁহার আশ্রমে গমন করিয়া থাকেন। হিন্দু, ব্রাহ্ম, ছাত্র, শিক্ষক, উকীল, মোক্তার, ডেপুটী, মুন্সেফ, সর্ব্বশ্রেণীর লোক এই ধর্ম্মসভার নিয়মিত শ্রোতা।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে ইহা দেখা যায় যে, বরিশাল নগরবাসীর শিক্ষার অভাবপূরণের জন্য অশ্বিনী-কুমারের ঐকান্তিক আগ্রহে ব্রজমোহন বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার ছাত্রদিগকে কিরূপ শিক্ষাদান অভিলাষী হইয়াছিলেন তাহাই দ্রষ্টব্য। উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার দিন নিম্নলিখিত মুদ্রিত উপদেশপত্র পাইয়া থাকে—

এই বিদ্যালয় তোমাকে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক সুশিক্ষা প্রদান করিবে। আমরা বিদ্যালয়ে ও গৃহে উভয় স্থলেই তোমার ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিব। তোমার প্রতি

আমাদের তত্ত্বাবধান বিদ্যালয় ছুটি হইবার সঙ্গেই শেষ হইবে না, তুমি বিদ্যালয়ে অলস হইলে যেরূপ দণ্ড পাইবে, বাড়ীতে দুর্ব্ব্যবহার করিলেও তেমন শাস্তি পাইবে। নিম্নলিখিত উপদেশবাক্যগুলি প্রণিধানপূর্ব্বক প্রতিপালনের চেষ্টা করিও।

(১) তোমরা প্রতিদিনের পাঠ, কার্য্য ও খেলার একখানি সময়সূচী প্রস্তুত করিবে এবং সর্ব্বদা সেই সময়সূচী মানিয়া চলিবে।

(২) প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিবে। দৈনন্দিন কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কর্ত্তব্য সম্পাদনার্থ মনের বল ভিক্ষা করিয়া পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও।

(৩) কখনও অতিরিক্ত অধ্যয়ন করিও না। অধ্যয়নে নিয়মনিষ্ঠ হইবে, কদাচ উচ্ছৃঙ্খল হইবে না। বৎসরের অধিকাংশ সময় অলসতায় যাপন করিয়া শেষ অংশে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া অসুস্থ হইও না। যে পাঠ কণ্ঠস্থ করিতে হইবে তাহা প্রত্যূষে পড়িবার ব্যবস্থা করিবে। আগামী কল্যের পাঠ তৈয়ার করিবার পূর্ব্বে অদ্য যাহা পড়িয়াছ সেই পাঠ একবার ভাবিয়া দেখিও, শয়ন করিবার পূর্ব্বে সন্ধ্যায় কি পড়িলে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখিবে। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে একবার পরমেশ্বরের নাম করিও।

(৩) তুমি যখন পাঠ কর তখন তোমার মেরুদণ্ড যথাসম্ভব সরল রাখিয়া বসিবে।

(৫) যখন পাঠে নিযুক্ত থাক তখন কাহারও সহিত কথা বলিও না। কাজের সময় কাজ করিবে খেলার সময় খেলিবে। নিঃশব্দে পড়িলে যদি পাঠে তোমার মনঃসংযোগ না হয় তাহা হইলে উচ্চকণ্ঠে পড়িও। অর্থ না বুঝিয়া কোন বাক্য কদাচ কণ্ঠস্থ করিবার জন্য বারংবার আবৃত্তি করিও না। যদি তুমি মনঃসংযোগ করিয়া ধীরে ধীরে পড় তাহা হইলে দেখিবে যে, এক একটি বাক্য এক কি দুইবার পড়িলেই মুখস্থ হইয়া যাইবে।

(৬) বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্য উপাদেয় উৎকৃষ্ট পুস্তক পড়িবার জন্য বিদ্যালয় ছুটির পরে এক ঘণ্টা সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিও। ইহাতে তোমার চিত্ত সতেজ ও সরস হইবে। সাবধান, কদাচ কুৎসিত গ্রন্থ পাঠ করিও না।

(৭) অভিধান ব্যবহারে অমনোযোগী হইও না, উচ্চারণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, প্রত্যেকটি শব্দের উচ্চারণ লক্ষ্য করিয়া উহা সুস্পষ্টরূপে পড়িবে। 'বিশুদ্ধ উচ্চারণ সুসভ্যসমাজে প্রবেশাধিকার পাইবার উত্তম পরিচয়পত্র।'

(৮) অধ্যয়ন সম্বন্ধে তুমি যে সকল বিধি তোমার পক্ষে অনুকূল ও সুবিধাজনক বলিয়া মনে কর, সেই সকল বিধি কদাচ তোমার সহাধ্যায়ী কিংবা অপর কোন ছাত্রের নিকট গোপন রাখিও না। যাহারা বিদ্যাচর্চ্চায় তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তাহাদের সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করিও, কিন্তু কদাচ কাহার প্রতি ঈর্ষার ভাব পোষণ করিও না।

(৯) তোমার শিক্ষক মহাশয় অধ্যাপনাকালে যাহা বলেন সর্ব্বদা তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শুনিও।

(১০) মাতাপিতাকে সম্মান করিও। গুরুজনদের নিকট সর্ব্বদা নম্র থাকিও। বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে সমীহ করিও। মনে রাখিও বশ্যতা যৌবনের অলঙ্কার-স্বরূপ।

(১১) কখনও স্পর্দ্ধিতভাবে বিচরণ করিও না, বিনীত ভাব অবলম্বন কর।

(১২) বাক্যালাপে সতর্ক হও। কখনও অশ্লীলবাক্য বলিবে বা লিখিবে না। যেখানে অশ্লীল আলোচনা চলিতে থাকে সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইও।

(১৩) খাওয়া-পড়ায় সাদাসিধা হইবে।

(১৪) সর্ব্বদা পবিত্র হইও। অপবিত্র অভ্যাস শত শত উন্নতিশীল যুবকের ধ্বংস সাধন করিয়া থাকে।

(১৫) সরল ও সাহসী হও। কদাচ মিথ্যাকথা বলিও না।

(১৬) চরিত্রবান্ বালক ও আদর্শচরিত্র বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গ করিও। অসচ্চরিত্র বালকের সংসর্গ সর্ব্বদা পরিহার করিবে। "তুমি কাহাদের সহিত মেলা মেশা কর, বল, আমি তোমার চরিত্র কিরূপ তাহা বলিয়া দিব।" এই প্রবাদ বাক্যটি সকল সময়ে মনে রাখিও।

(১৭) তোমার আমোদপ্রমোদ যেন নির্দ্দোষ হয়। তাস পাশা, দাবা প্রভৃতি কখনও খেলিও না।

(১৮) তুমি যে যে কাজ কর তাহাতে নিয়মনিষ্ঠ ও সময়-নিষ্ঠ হইও।

(১৯) যে সকল খেলায় শরীরের সামর্থ্য বাড়ে তুমি সেই সকল খেলা খেলিও। সায়ংকালে এক ঘণ্টা কাল নির্ম্মল বায়ু-প্রবাহিত স্থানে ভ্রমণ করিও। শারীরিক সামর্থ্য যুবক মাত্রেরই গৌরবের সামগ্রী।

(২০) মনে রাখিও—সাধু যাহার সঙ্কল্প পরমেশ্বর তাহার সহায়।

ছাত্রদের শরীর, মন ও আত্মার বিকাশের জন্য যাহা করণীয় সংক্ষেপতঃ তাহা সমস্তই এই উপদেশপত্রে রহিয়াছে। অশ্বিনী-কুমারের রচিত এই উপদেশপত্র পাঠ করিলে ইহা বুঝা যায় যে ছাত্রদিগকে কেবল পরীক্ষায় পাশ করাইবার জন্য তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই। ছাত্রদের সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্ব লাভই ছিল তাঁহার কামনা। এই জন্যই তিনি উপদেশ পত্রের প্রারম্ভেই ছাত্রদিগকে জানাইয়া দিতেন—"তোমাদের সহিত আমাদের সম্বন্ধ দশটা চারিটা নহে—আমরা যেমন বিদ্যালয়ে তেমন বাড়ীতে তোমাদের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিব।" বস্তুতঃ তাহাই তিনি করিতেন।

অদ্ভুতকর্ম্মা অশ্বিনীকুমার কথায় ও কাজে এক ছিলেন। তাঁহাকে রাত্রি আটঘটিকার পরে শত শত দিন লণ্ঠন হাতে করিয়া ছাত্রদের বাড়ী বাড়ী যাইয়া তাহাদের সংবাদ লইতে দেখিয়াছি। তাঁহার সস্নেহ সম্ভাষণ ও অমায়িকতায় ছাত্রগণ

এমন আনন্দ অনুভব করিত যে,ছাত্রাবাসে অনেক ছাত্র উৎসুক-ভাবে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিত। তিনি যে আদর করিয়া জোড়ে জোড়ে পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া দিতেন তাঁহার সেই আদর ও সেই পবিত্র স্পর্শ লাভের জন্য ব্যাকুলতাপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ছাত্রদের মনে জাগিয়া থাকিত। এমন সময় ছিল যখন অশ্বিনী-কুমার ব্রজমোহন কলেজের প্রত্যেকটি ছাত্রকে চিনিতেন। সকলের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল। ছাত্রগণ তাহাদের এই শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপকের সহিত বন্ধুভাবে মিশিবার সুযোগ পাইত। শত শত ছাত্র তাঁহার আশ্চর্য্য ভালবাসায় মোহিত হইয়া তাহার নিকট হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দিত। তিনি আগ্রহের সহিত ছাত্রদের সুখদুঃখ,সবলতাদুর্ব্বলতা, পাপপুণ্যের কথা শুনিতেন। তাহাদের মানসিক দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য তিনি কখন কখন তাহাদিগকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া তাহাদের সহিত অশ্রুপূর্ণ লোচনে পরমেশ্বরের নাম করিতেন। এইরূপ পুণ্য ও প্রেমের দ্বারা তিনি ছাত্রদের যথার্থ হিতসাধনের চেষ্টা করিতেন। এমন প্রেমিক ও পুণ্যাত্মা শিক্ষক দুর্ল্লভ।

অশ্বিনীকুমারের ঘরখানি লোকসমাগমে সমস্ত দিন ও রাত্রির প্রায় দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত হাটের মত মনে হইত। বালবৃদ্ধযুবক সকলেই তাঁহার সঙ্গ লোভনীয় বলিয়া মনে করিতেন। সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সহিতই তিনি মনের আনন্দে আলাপ করিতেন, কিন্তু ছাত্রদের সংসর্গেই যেন তাঁহার আনন্দসাগর উথলিয়া উঠিত। হৃদয়ের দুয়ার খুলিয়া যাইত। তাঁহার বিদ্যালয়ের জনৈক

কর্ত্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষক যখন শিক্ষকতা ছাড়িয়া কার্য্যান্তরে গমন করিতে যাইতেছিলেন তখন অশ্বিনীকুমার কাশীধামের রাণামহল হইতে তাঁহাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"তুমি যে কাজে যাইতেছ তাহাতে আমারও সহানুভূতি আছে। তবে যে কাজে ছিলে উহা তাহা অপেক্ষাও গুরুতর। যুবকদিগের চরিত্রগঠন অপেক্ষা মহত্তর কোন কার্য্য আছে আমি তাহা মনে করি না। আর বালক ও যুবকের সঙ্গে নিজেরই বা কত লাভ! আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র যে এমন আছেন তাহা ঐ সঙ্গ গুণে—কিংবা তাঁহারা লোকোত্তর ব্যক্তি তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র।" যুবকদিগের চরিত্রগঠনরূপ পবিত্র কার্য্যই অশ্বিনীকুমারের জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রত ছিল এই ব্রতসাধনের নিমিত্ত তিনি আপনাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন এবং যুবক ও বালকদের সঙ্গেই তাঁহার পুণ্যময় জীবনের অধিকাংশ কাল ব্যয়িত হইয়াছে। অশ্বিনীকুমারের মহৎ চরিত্রের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া বহু আত্মত্যাগী সুশিক্ষক সামান্য বেতনে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সেবা করিয়াছেন। তাঁহাদেরই আন্তরিক আনুকুল্যে অশ্বিনীকুমারের ব্রজমোহন বিদ্যালয় ভারত-বিখ্যাত আদর্শ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হইতে পারিয়াছিল। পরম ভাগবত চিরকুমার জগদীশ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কালীপ্রসন্ন, দরিদ্রবান্ধব কালীশচন্দ্র, অক্লান্তকর্ম্মী অক্ষয়কুমার, আদর্শশিক্ষক সত্যানন্দ, ধর্ম্মপ্রাণ মনোমোহন, মহাকর্ম্মী সতীশচন্দ্র, তেজস্বী ব্রজেন্দ্রনাথ, জ্ঞানপিপাসু রজনীকান্ত, সাধু-স্বভাব ক্ষেত্রনাথ প্রভৃতি সুশিক্ষকগণের নাম ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ইতিবৃত্তে চিরদিন

সুবর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। অর্থের আকর্ষণে নহে, মানুষ তৈয়ার করিবার পবিত্র আকাঙ্ক্ষা লইয়া ইহাঁরা "সত্য, প্রেম, পবিত্রতার" পতাকাবাহী অশ্বিনীকুমারের বিত্থালয়ের সেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাঁদের সেবায় ব্রজমোহন বিত্থালয় শিক্ষার পুণ্যময় কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সরকারী শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ, ছোট বড় রাজকর্ম্মচারিগণ,দেশ-বিদেশের বহুগুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি মুক্তকণ্ঠে এই বিদ্যালয়ের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। অধ্যাপক সুপণ্ডিত কানিংহাম্ সাহেব ব্রজমোহন বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া মোহিত হইয়া লিখিয়াছিলেন—"বঙ্গদেশে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের মত উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় থাকিতে বাঙ্গালী ছাত্রেরা অক্স্ফোর্ড, কেম্ব্রিজে বিদ্যাশিক্ষা করিবার জন্য কেন যায়, আমি তাহা বুঝিনা।" ১৮৯৭-৯৮ অব্দের সরকারী বার্ষিক শিক্ষাবিবরণীতে শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন—"The school is unrivalled in point of discipline and efficiency. It is an institution that ought to serve as a model to all schools, Government and private." অর্থাৎ "ছাত্রদের ব্যবহারের শিষ্টতা ও শিক্ষার উৎকর্ষের হিসাবে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সমকক্ষ দ্বিতীয় কোন বিদ্যালয় নাই। এই বিদ্যালয় সরকারী ও বেসরকারি সকল বিদ্যালয়ের আদর্শ হওয়া উচিত।" ব্রজমোহন বিদ্যালয়, দুই একবার নহে, বহুবৎসরই প্রবেশিকা পরীক্ষার ফলে

শতকরা হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। ১৮৭৯ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় শতকরা ২২ জন ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল, ঐ বৎসর ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শতকরা ৮২ জন বালক উত্তীর্ণ হইয়াছিল।

এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর এক বৎসর অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই ব্রজমোহন দত্ত মহাশয় স্কুলটিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্ততঃ পাঁচ বৎসরকাল বিদ্যালয়ের কার্য্য লক্ষ্য না করিয়া ইহাকে কলেজে পরিণত করা বিধেয় নহে, এইরূপ কথা উত্থাপিত হওয়ায় দত্ত মহাশয়ের ইচ্ছা তখন কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। ১৮৮৬ অব্দের ৩১এ জানুয়ারী মহামতি দত্ত মহাশয় পরলোক গমন করেন।

বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলে উৎসাহিত হইয়া পাঁচ বৎসর পরে অশ্বিনীকুমার ও তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় পরলোকগত পিতৃদেবের অভিলাষানুসারে ১৮৮৯ অব্দের ১৪ই জুন বিদ্যালয়টিকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন। শ্রীযুক্ত জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম, এ, বি, এল মহোদয় কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তারপর শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর কাল বিচক্ষণতার সহিত কলেজের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনা করেন।

ব্রজেন্দ্রনাথ যেমন সুশিক্ষিত, তেমন তেজস্বী পুরুষ।

তিনি অশ্বিনীকুমারের সুযোগ্য ছাত্র ও সহকর্ম্মী ছিলেন। কোন অত্যাচার তিনি নীরবে সহ্য করিতে পারিতেন না। নদীয়া জিলার কুষ্ঠিয়া মহকুমায় তাঁহার বাড়ী। সেখানে নীলকুঠির অত্যাচারে দরিদ্র লোকসাধারণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ একদা গ্রীষ্মাবকাশে যখন দেশে গিয়াছিলেন তখন তাঁহার এক প্রতিবেশী কলুর স্ত্রীর উপর নীলকুঠির কর্ম্মচারীরা অত্যাচার করে। তিনি উহার প্রতিবাদ করিয়া হাটের মধ্যে লাঠির প্রহারে আহত হন। নীলকরের ভয়ে স্থানীয় কোন লোক ব্রজেন্দ্রনাথের সাহায্য করিতে সাহসী হইলেন না। অশ্বিনীকুমার এই সংবাদ পাইয়া ব্রজেন্দ্রনাথকে বরিশাল নগরবাসীর প্রদত্ত চাঁদা হইতে সংগৃহীত ৫০০৲ টাকা এবং কলেজ হইতে তিনমাসের বেতন অগ্রিম পাঠাইলেন। বিপন্ন ব্রজেন্দ্রনাথকে সাহায্য করিবার জন্য অশ্বিনীকুমার কলিকাতায় গমন করেন। তাঁহার সাহায্যে ব্রজেন্দ্রনাথ নীলকরদের সহিত মামলায় হাইকোর্টে জয়লাভ করেন। এই মামলার পরে নীলকরদের অত্যাচার কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, পরে দেশবাসীর আন্দোলনের ফলে ঐ অত্যাচার একেবারে বন্ধ হয়। ব্রজমোহন বিদ্যালয় ব্রজেন্দ্রনাথের তুল্য একজন তেজস্বী পুরুষকে কলেজের কর্ণধার প্রাপ্ত হইয়া নিঃসন্দেহ উপকৃত হইয়াছিল। এই সময়েই ব্রজমোহন কলেজের খ্যাতি দেশদেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রের যে কিঞ্চিৎ বিশিষ্টতা আছে ইহা

তখন জনসাধারণ স্বীকার করিত। ১৮৯৮ অব্দে বি, এ ক্লাস খুলিয়া অশ্বিনীকুমার তাঁহার এই বিদ্যালয়কে প্রথম শ্রেণীর কলেজে পরিণত করেন। বঙ্গের তদানীন্তর ছোট লাট্ স্যর জন্ উড্‌বরণ সরকারী শিক্ষাবিবরণীতে এই কলেজের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"This moffusil college promises some day to challenge the supremacy of the metropolitan (Presidency) college." অর্থাৎ "এইরূপ আশা করা যায় যে এই কলেজ কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবে।"

এই সময়ে বরিশালে 'রাজচন্দ্র কলেজ' নামে অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বী কলেজ ছিল। বরিশালের মত ক্ষুদ্র সহরে খুব কাছাকাছি দুইটি কলেজ ছিল বলিয়া উভয় কলেজের মধ্যে আড়াআড়ির ভাব অনেক সময় উগ্র হইয়া উঠিত। ইহাতে দুই কলেজকেই অনিষ্ট স্বীকার করিতে হইত। বরিশালের তদানীন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট্ বিট্‌সন্ বেল্ ব্রজমোহন কলেজের মঞ্জুরী সমর্থন করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছিলেন তাহাতে লিখিয়াছিলেন—Barisal may be said to be the Oxford of East Bengal. If Oxford could maintain fourteen colleges, I do not see any reason why Barisal should not be able to maintain two. ১৯০৩ অব্দে অশ্বিনীকুমার এই

দুই কলেজ সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হন। অতঃপর রাজচন্দ্র কলেজ উঠিয়া যায়।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতা

ব্রজমোহন বিদ্যালয় বঙ্গদেশের এক কোণে একটি ক্ষুদ্র সহরে অবস্থিত। এই বিদ্যালয়টি কি কি বিশিষ্টতার জন্য একসময়ে ভারতবিখ্যাত হইয়াছিল এক্ষণে তাহাই আলোচনা করা যা'ক।

শিক্ষার্থীরা যাহাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করে অশ্বিনীকুমার সেই উদ্দেশ্য মনের সম্মুখে রাখিয়া বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। কিন্তু কেবল সরকারী শিক্ষাসমিতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়-নির্দ্ধারিত পাঠ্যপুস্তকগুলি উত্তমরূপে পড়াইলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। এই অধ্যাপনায় ছাত্রদের বুদ্ধি মার্জ্জিত ও বিকাশ প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু একমাত্র এই শিক্ষার দ্বারা ছাত্রদের সর্ব্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বলাভ সম্ভবপর হইবে কিরূপে? শিক্ষার্থীরা যাহাতে বাল্যকাল হইতে সুনীতি অভ্যাস ও ধর্ম্মানুরাগ লাভ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে অশ্বিনীকুমার ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে "বান্ধবসমিতি" নামে এক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। যে সমস্ত বিষয় আলোচনা করিলে চরিত্রের বল, জনহিতৈষণা ও ঈশ্বরপ্রীতি বৃদ্ধি হয়, যেরূপ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মালোচনায় হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলে যোগ দিতে পারে এবং যে সকল বিষয়ে মনোযোগী না

হইলে যুবকগণ নীতিহীন হইয়া পড়ে সেই সমস্তের আলোচনার জন্য ঐ বান্ধবসমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। শনিবার সন্ধ্যার পরে এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। শিক্ষকগণের কেহ কিংবা সমাগত কোন শ্রদ্ধেয় ছাত্রবন্ধু সদ্‌গ্রন্থপাঠ কিংবা সদুপদেশ প্রদান করেন। ধর্ম্মসঙ্গীতদ্বারা সভার কার্য্য আরম্ভ ও শেষ করা হয়। "সত্য,প্রেম, পবিত্রতা" এই সমিতির মূলমন্ত্র।

বান্ধবসমিতিতে সর্ব্বপ্রথমে কিছুদিন কেবল সুনীতি-মূলক উপদেশ প্রদত্ত হইত। কিন্তু ঈশ্বর আরাধনা বাদ দিয়া কেবল নীতিমূলক উপদেশ প্রদান করিলে সেই শুষ্ক নীতি শিক্ষার্থীদের মনের উপর যথোচিত কার্য্য করিতে পারিবে না, এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে ধর্ম্মপ্রাণ অশ্বিনীকুমারের অনেক দিন লাগিল না। তখন হইতেই বান্ধবসমিতিতে ধর্ম্মোপদেশ দানের ব্যবস্থা হইল। ইহাতে চমৎকার সুফল ফলিল। ভক্ত অশ্বিনীকুমারের মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী ঈশ্বরোপাসনা শ্রবণে শত শত যুবক ও বালক অশ্রুমোচন করিত। অনেকের তরুণ চিত্তে ধর্ম্ম-জীবন লাভের শুভ আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইত। ভাবাবেশে আবিষ্ট হইয়া অশ্বিনীকুমার অশ্রুমোচন করিতে করিতে যখন পরমেশ্বরের আরাধনা করিতেন,তখন তাঁহার তরুণ শ্রোতৃমণ্ডলীও সেই আরাধনা শুনিয়া অশ্রুসিক্ত হইত। ধর্ম্মপ্রাণ জগদীশ, শ্রদ্ধাশীল ব্রজেন্দ্রনাথ,নিষ্ঠাবান্ রজনীকান্ত,পূতচরিত্র কালীশচন্দ্র, ধর্ম্মশীল মনোমোহন প্রভৃতি বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণও পর্য্যায়-ক্রমে এই সান্ধ্য সভায় ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন।

এই বান্ধবসমিতি একদিকে যেমন ছাত্রদের মনে ধর্ম্মভাব জাগরিত করিয়া দিয়া তাহাদের যথার্থ কল্যাণ সাধন করিত, অন্য দিকে এই সম্মিলনে শিক্ষক ও ছাত্রদের পরস্পরের পরিচয়ের সুযোগ ঘটিত। ছাত্রগণ শিক্ষকদের হৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইত। শিক্ষকগণও ছাত্রদের চরিত্রের বিচিত্রতা অবগত হইয়া তাহাদিগকে যথাযথ সুশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন। বান্ধবসমিতি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের অত্যুৎকৃষ্ট গৌরবময় প্রতিষ্ঠান।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, অশ্বিনীকুমার সর্ব্বধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। বান্ধবসমিতিতে সার্ব্বভৌম ধর্ম্মই প্রচারিত হইত। অশ্বিনীকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সরলকুমার "বরিশাল" পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

জয়পুর হইতে জ্যেঠামহাশয় একখানা সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই আমাদিগকে বলিতেন, এই বিষ্ণু তোমরা পাইবে না, ব্রজমোহন স্কুলপ্রাঙ্গণে রাখিতে হইবে। কিন্তু একটু স্বতন্ত্র রকমে। প্রথম হইবে একটী সুন্দর ছোট মন্দির—তাহাতে ভাগবত, বাইবেল, কোরাণ ও আবেস্তা রাখিতে হইবে—মন্দিরের চারিদিকে চারিটি দরজা থাকিবে। একটি দরজার সামান্য দূরে একটি মন্দিরে এই শ্বেতপ্রস্তরের বিষ্ণু মূর্ত্তি; অপর দরজার সম্মুখে একটি মসজিদ্; তৃতীয় দরজার সম্মুখে একটি গির্জ্জা এবং অপরটির সামনে দেয়ালঘেরা একটু

জায়গা অগ্নি উপাসনার জন্য থাকিবে। এই মন্দির-প্রতিষ্ঠার সাধটি তাঁহার মনে অনেক কাল ছিল।

ঐক্য, মৈত্রী, দয়া, পরোপকার, রোগীর সেবা প্রভৃতি সুনীতি কেবল মুখে মুখে শিক্ষা দান না করিয়া কার্য্যতঃ এই সকল শিখাইবার জন্য ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে—Union Brothers, Purity Brothers, Band of Hope, Band of Mercy, Little Brothers of the Poor, Debating Society, Sporting Club, Fire Brigade, Fine Arts Society, Band of Labourers এই দশটি ছোট বড় প্রতিষ্ঠান ছিল। এইরূপ নানা প্রতিষ্ঠান সংস্থাপনের পরিকল্পনা সর্ব্বপ্রথমে স্বর্গীয় শিক্ষক অক্ষয়কুমার সেন মহাশয়ের মনে উপস্থিত হয়।

পূজনীয় জগদীশবাবু নিম্নলিখিত সঙ্গীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলির উদ্দেশ্য বিবৃত করিয়াছিলেন। এইটিই "ব্রজমোহন বিদ্যালয় সঙ্গীত।" আমরা যখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন এই সঙ্গীতটি বরিশাল নগরে পথে, ঘাটে, মাঠে, ছাত্রাবাসে সর্ব্বত্র গীত হইত। ছাত্রগণ যখনই বিদ্যালয় হইতে বিনোদনের (Excursion) জন্য দলবদ্ধ হইয়া বেড়াইতে যাইত, নদীগর্ভে নৌকায় ভ্রমণ করিত, কিংবা বনভোজনে যাইত তখন তাহারা মনের আনন্দে গাহিত—

আয় ভাই আয়, মাতি নব বলে,
এই মহাব্রত, সাধিব সকলে;

অদম্য উৎসাহে, যতন করিলে,
স্বরগ হইবে মরত ধাম ॥
ঘৃণা অভিমানে দিবনা বেদনা,
পশুপক্ষিকীট তাঁহারি রচনা ;
প্রচারি জীবনে দয়ার মহিমা,
অহিংসা-মন্ত্র জপি অবিরাম ॥
সত্যের নিশান তুলিয়া গগনে,
পবিত্রতামৃত পূরিয়া পরাণে,
প্রেমডোরে বাঁধি ভাই ভগ্নীগণে,
চল পূর্ণ হবে যত মনস্কাম ॥
অগ্নিদাহে কেহ সর্ব্বস্ব খোয়ায়,
দাঁড়ায়ে না রবো,পুতুলের প্রায়,
রোগীর শিয়রে, মৃত্যুর শয্যায়,
জাগিব গাহিব তাঁহারি নাম ॥
সাহিত্যসাগরে রতন খুঁজিয়ে,
বিশ্বশিল্পী পায়ে শিল্পজ্ঞান লয়ে,
সঙ্গীতের সুধা চৌদিকে ঢালিয়ে,
মানবমহত্ত্বে তুলিব তান ॥
অণু মোরা বটে তবু ক্ষুদ্র নই,
শত শত ভাই এক প্রাণ হই,
শত শত দাঁড় পড়ে দেখ অই
ছুটেছে তরণী না মানে উজান ॥

গুরুজনপদধূলি মাথে নিয়ে,
সত্যপ্রেমশুদ্ধি পতাকা উড়ায়ে,
ভাসানু তরণী, ধ্রুব তারা চেয়ে,
ঐ দেখা যায় স্বরগ ধাম ॥

পূজনীয় জগদীশ বাবুর রচিত এই সঙ্গীতটির মধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের ছোট বড় ছাত্রদের মধ্যে যাহাতে প্রীতির বন্ধন সংস্থাপিত হয়, প্রত্যেক ছাত্র যাহাতে আপনাকে এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠানভুক্ত বলিয়া গৌরব অনুভব করে 'ঐক্যসংঘের' সভ্যগণ সেইরূপ চেষ্টা করিতেন।

ছাত্রগণ জীবপ্রীতির কথা কেবল পুস্তকে না পড়িয়া যাহাতে বাল্যকাল হইতে কার্য্যতঃ অহিংস হয় 'জীবপ্রীতিসংঘের' সভ্যগণ এই ভাবের বিকাশসাধনে প্রচেষ্ট হইতেন। বালকগণ যাহাতে গৃহপালিত জীবজন্তুর প্রতি অত্যাচার না করে, এই সকল প্রাণীর সহিত যাহাতে তাহাদের প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হয় সংঘের সভ্যগণ উহারই তত্ত্বাবধান করিতেন। রাজপথে যে সকল পশু আহত বা পীড়িত হইয়া পড়িয়া থাকিত সেই সকল জন্তুর সেবার সুব্যবস্থা করা হইত।

বরিশাল ছোট নগর, সেখানে কোনস্থানে আগুন লাগিলে উহা নিবাইবার জন্য 'ফায়ার ব্রিগেড্' বা অগ্নিনির্ব্বাপক দল নাই। এই অভাব পূরণের জন্য ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে

এইরূপ একদল গঠন করা হইয়াছিল, এই দলের উৎসাহ-সঞ্চারের মন্ত্র ছিল—

অগ্নিদাহে কেহ সর্ব্বস্ব খোয়ায়
দাঁড়ায়ে না রবো পুতুলের প্রায়।

আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের সময় এই সেবকদলের আশ্চর্য্য কার্য্য দেখিয়া বরিশালবাসী নরনারী বিস্ময়ে অভিভূত হইত। এই সেবকগণের কার্য্যে অক্সফোর্ড্ মিশনের কর্তৃপক্ষ একবার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। ছাত্রগণ প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন-করিয়া, কখন বা আপনারা আহত হইয়া বিপন্ন গৃহীদের জীবন ও দ্রব্যাদি রক্ষা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত।

সাধারণতঃ অধিকাংশ ছাত্রই পঠদ্দশায় সিগারেট্ কিংবা তাম্রকূট সেবনের কু-অভ্যাস প্রাপ্ত হয়। কোন কোন ছাত্র এই সময়ে পানদোষেও আক্রান্ত হইয়া থাকে। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যাহাতে এইরূপ কু-অভ্যাসের দাস না হয় বিদ্যালয়ের একদল ছাত্র সংঘবদ্ধ হইয়া সেইরূপ চেষ্টা করিত। ইহাদের চেষ্টায় বহু ছাত্র ধূমপানের কু-অভ্যাস হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিত।

আমরা যখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে পড়িতাম তখন উক্ত বিদ্যালয়ের সকল শ্রেণীর ছাত্রগণ প্রত্যেক শনিবার স্ব-স্ব ক্লাসে সভায় মিলিত হইয়া নানাপ্রকার সদালোচনা করিত। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এই সকল সভায় সভাপতির কার্য্য করিতেন। কোন একটি নির্দ্ধারিত বিষয়ে ছাত্রগণের মধ্যে

কেহ কেহ রচনা লিখিত, কেহ কেহ মৌখিক বক্তৃতা করিত। সর্ব্বশেষে সভাপতি শিক্ষক মহাশয় আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে স্বীয় মন্তব্য প্রকাশ করিতেন। ছাত্রদের মনে অধ্যয়নস্পৃহা জাগরিত করিয়া দিবার জন্য কোন কোন শিক্ষক ছাত্রদিগকে কৌতূহলোদ্দীপক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পড়িয়া শুনাইতেন।

বিদ্যালয়ে এই যে সকল প্রতিষ্ঠান ছিল, সেই সমস্তের কার্য্য এবং বিদ্যালয়ের নৈতিক অবস্থা আলোচনার নিমিত্ত একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা ছিল। প্রত্যেক শ্রেণী হইতে দুই জন প্রতিনিধি ঐ সভায় প্রেরিত হইতেন। কতিপয় শিক্ষক এবং ছাত্র প্রতিনিধিগণ আবশ্যক মতে কার্য্যালোচনার জন্য মিলিত হইতেন।

দরিদ্রবান্ধবসমিতি

দরিদ্রবান্ধবসমিতি (Little Brothers of the Poor) ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ গৌরবময় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের সভ্যগণ শিক্ষকগণের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে পীড়িত ও আর্ত্তের সেবা করিয়া থাকেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার অসহায় বিসূচিকা রোগীর দুঃখে বিগলিত হইয়া এই পুণ্যময় সেবকদল গঠন করেন। 'বিবেকানন্দ সেবাসদন,' 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী' প্রভৃতি সেবাসমিতিসমূহের প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্বে বরিশালে সেবকদল গঠিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় কলিকাতায় "দাসাশ্রম" নামক এই প্রকারের একটি প্রতিষ্ঠান ছিল।

লাখুটিয়া নিবাসী (বর্ত্তমানে ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রচারক) বাবু বরদা-প্রসন্ন রায় মহাশয় আসিয়া একদিন দরিদ্রবন্ধু অশ্বিনীকুমারকে এই সংবাদ দিলেন—"ওলাউঠা রোগাক্রান্ত এক মুসলমান মৃত্যুশয্যায় শায়িত আছে, তাহার চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিবার কেহ নাই, এখনই তাহার জন্য কিছু না করিলে এই নিরাশ্রয় ব্যক্তি কয়েক দণ্ডের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।" এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অশ্বিনী-কুমার তৎক্ষণাৎ এই বিসূচিকারোগীর সেবা করিবার জন্য গমন করিলেন। বরদা বাবু এবং অপর কতিপয় বন্ধুর সহায়তায় তিনি রোগীর চিকিৎসা ও পরিচর্য্যার সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা করিলেন। আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি তখন ক্ষুদ্র বরিশাল নগরটি ওলাউঠা রোগের আবাসভূমি ছিল। তখন লোকে এই রোগকে এমন ভয় করিত যে, রোগীর সেবাতো দূরের কথা, অনেকেই রোগীর কাছে যাইতেও সাহসী হইত না। সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহোদয় তখনকার একটি ঘটনা নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—"বরিশালে একবার ভীষণ কলেরা সংক্রামকভাবে ঘটে। কোন হিন্দু ভদ্রলোকের বাটীতে তাঁহার ভৃত্যের ঐ রোগে মৃত্যু হয়, কিন্তু তখন এমন বিভীষিকা উপস্থিত হইয়াছিল যে শ্মশানে যাওয়া দূরে থাকুক ব্যারামের কথা শুনিলে কেহ কাহারও বাড়ী যাইত না। তখন ব্রাহ্মভক্ত আচার্য্য

গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন, ঐ মৃত ভৃত্য পড়িয়া রহিয়াছে শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমরা অন্য ধর্ম্মাবলম্বী, শব ছুঁইলে ত কোন দোষ হইবে না ?" তদুত্তরে গৃহস্বামী বলিলেন—'ছোঁয়ায় দোষ হওয়া দূরে থাকুক, শব বাড়ী হইতে দূর হইলেই বাঁচি।' তখন গিরিশ বাবু একাকী স্কন্ধে বহন করিয়া শব শ্মশানে লইয়া যাইয়া দাহকার্য্য নির্ব্বাহ করিলেন।" বিসূচিকা রোগসম্বন্ধে তখন বরিশাল সহরে লোকের মনে এমনই বিভীষিকা ছিল। ফলে নিরাশ্রয় দুঃস্থ ওলাউঠা রোগী বিনা চিকিৎসায়, বিনা পরিচর্য্যায় ভবলীলা সাঙ্গ করিত। অশ্বিনীকুমার এই অসহায় রোগীদের সেবার জন্য 'দরিদ্রবান্ধব-সমিতি' স্থাপন করেন। এই সদনুষ্ঠানে ব্রাহ্মভক্ত গিরিশচন্দ্র মজুমদার, বরিশাল জিলাস্কুলের শিক্ষক বাবু মহিমচন্দ্র রায়, বঙ্গবিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু চন্দ্রনাথ সেন, কবিরাজ মথুরানাথ সেন এবং বরদাপ্রসন্ন বাবু তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সেই দুর্দ্দিনে এই হৃদয়বান্ সেবকদল বরিশালে কি বিস্ময়কর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন এখন তাহা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা দুরূহ। ১৮৮৯ অব্দে অক্লান্তকর্ম্মী পরলোকগত বাবু অক্ষয়কুমার সেন মহাশয় "দরিদ্রবান্ধবসমিতির" পরিচালনা-ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে ছাত্রগণ রোগীর সেবারূপ পুণ্যব্রতে দীক্ষিত হইয়া গাহিত—

"রোগীর শিয়রে মৃত্যুর শয্যায়
জাগিব গাহিব তাঁহারি নাম।"

১৮৯৪ অব্দের জানুয়ারী মাসে অক্ষয় বাবুর আকস্মিক পরলোকপ্রাপ্তিতে ব্রজমোহন বিদ্যালয় এক অসামান্য একনিষ্ঠ উৎসাহী কর্ম্মী ও হৃদয়বান্ সেবককে হারাইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হইলেন।

অতঃপর পণ্ডিত কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ মহাশয় "দরিদ্র-বান্ধবসমিতির" পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটিকে সম্যক্ পরিপুষ্ট করেন। সেবাধর্ম্ম কালীশচন্দ্রের জীবনের ব্রত ছিল। এই মহৎব্রত সাধন করিয়া তিনি ধন্য হইয়াছেন এবং তাঁহার পুণ্যচরিত্রের প্রভাবে শত শত যুবক সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া এক্ষণে নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে এই পুণ্যব্রত আচরণ করিতেছে। ধর্ম্মপ্রাণ কালীশচন্দ্র বরিশাল সহরে বিপন্নের বন্ধু, আর্ত্তের সহায়, দরিদ্রের বান্ধব, ছাত্রদের সুহৃদ্ বলিয়া সকলের শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। গুণগ্রাহী অশ্বিনীকুমার কালীশচন্দ্রকে আপন বিদ্যালয়ে শিক্ষক পাইয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ মনে করিতেন। কালীশচন্দ্র প্রায় বিশ বৎসর কাল দরিদ্রবান্ধবসমিতির পরিচালনা করিয়া বরিশালবাসী বালবৃদ্ধযুবক সকলের মনে পুণ্যময় সেবাধর্ম্মের ভাব মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন। বরিশাল নগরে লোকের মনে সেবাধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ এমনভাবে উজ্জ্বল হইয়া আছে যে, এখন আর এই নগরে ব্রাহ্মণচণ্ডাল, হিন্দুমুসলমান, স্পৃশ্যঅস্পৃশ্য রোগাক্রান্ত হইয়া কেহ চিকিৎসা ও পরিচর্য্যার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। অশ্বিনীকুমার ও তাঁহার সহযোগীরা যে পবিত্র

ব্রতের অনুষ্ঠান জন্য সেবকদল গঠন করিয়াছিলেন এখন সেই ব্রত সমগ্র নগরবাসী গ্রহণ করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। বরিশালের দরিদ্রবান্ধবসমিতির আদর্শে বঙ্গের বহুনগর ও পল্লীগ্রামে সেবকদল গঠিত হইয়াছে।

অক্লান্তকর্ম্মী পুণ্যশ্লোক কালীশচন্দ্রের কর্ম্মভূমি বরিশাল। তাঁহার জন্মভূমিও বরিশাল নগরের অদূরবর্ত্তী রামচন্দ্রপুর নামক একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। তিনি ব্রজমোহন কলেজের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক পণ্ডিত কামিনীকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অনুজ। কালীশচন্দ্র দুঃখদারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া আত্মচেষ্টায় সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। পরমেশ্বর তাঁহার হৃদয়টি দয়ার মধুর রসে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সেবকদলের দলপতি হওয়ায় বরিশালবাসী তাঁহার হৃদয়মাধুর্য্যের ও বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিলেন। ১৩২১ অব্দের ৩১এ শ্রাবণ বরিশালবাসী নরনারী তাহাদের এই ভক্তিভাজন দেবোপম সুহৃদ্‌কে হারাইয়া শোকে মুহ্যমান হইয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহার বিদ্যালয়ের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ পূতচরিত্র কালীশচন্দ্রকে হারাইয়া গভীর মনোবেদনা পাইয়াছিলেন।

পরদুঃখকাতর কালীশচন্দ্র যে দরিদ্রবান্ধবসমিতির প্রাণস্বরূপ ছিলেন, সেই সমিতি শত শত রোগী ও অসহায় ব্যক্তির সেবা করিত। সেনাধ্যক্ষের আদেশে সৈন্যগণ রণক্ষেত্রে যেমন অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়া থাকে এই সমিতির সেবকগণ



পণ্ডিত কালীশচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ

সেইরূপ দলপতির আদেশে মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করিয়া বিসূচিকা-রোগীর সেবা করিতেন। এই সেবকদলের মহত্ত্বব্যঞ্জক সেবাকাহিনীর কোন ধারাবাহিক বিবরণ কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। এই স্থলে সেবকগণের কার্য্যপ্রণালীর পরিচায়ক দুইটি মাত্র ঘটনা প্রদত্ত হইল—

একদিন এই সংবাদ আসিল বরিশাল নগরসংলগ্ন এক পল্লীগ্রামে এক বাটীতে বার জন লোক ভীষণ ওলাউঠা রোগে আক্রান্ত হইয়াছে। প্রতিবেশীরা ভীত হইয়া ইহাদিগকে ফেলিয়া প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছে। তৎক্ষণাৎ একদল সেবক ঘটনাস্থলে যাত্রা করিলেন। আর দুইদল সেবক চিকিৎসক ও ঔষধাদি সংগ্রহার্থ প্রস্থান করিলেন। প্রথমদল যাইয়া দেখিলেন, ইতোমধ্যে রোগীদের তিনজন প্রাণত্যাগ করিয়াছে, জীবিত ও মৃত রোগীরা ভেদবমি ও নানাপ্রকার অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। ক্ষণবিলম্ব না করিয়া সেই উচ্চবংশীয় কলেজের যুবকগণ আপনাদের হস্তে মল, মূত্র ও সমস্ত অপবিত্র জিনিষ পরিষ্কার করিয়া চিকিৎসক মহাশয়ের আগমনের পূর্ব্বেই ঘরটিকে যথাসম্ভব রোগীদের বাসোপযোগী করিয়া ফেলিলেন। এই সেবকগণের মহত্ত্বপূর্ণ সেবাগুণে ছয়টি রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল।

বরিশাল নগরে রাজপথের পার্শ্বে একদিন সেবকগণ এক বাতব্যাধিগ্রস্তা বৃদ্ধাকে কুড়াইয়া পাইলেন। চারিজন বলিষ্ঠ যুবক একখানি খাটিয়ায় করিয়া বৃদ্ধাকে সুবিধাজনক এক-

স্থানে লইয়া গেলেন। দশবারজন সেবক সেই স্থানটি পরিষ্কার করিয়া সেখানে বাঁশ খড় প্রভৃতি দ্বারা নিজেদের হস্তে একটি ছোট ঘর তৈয়ার করিলেন। চলচ্ছক্তিহীনা বৃদ্ধা সেখানে বাস করিত। এই বৃদ্ধার সর্ব্বপ্রকার সেবা সেবকগণ পালাক্রমে করিতেন। বৃদ্ধার ঘর পরিষ্কার করা, তার খাবার জিনিষ বাজার হইতে আনা, খাদ্যপানীয় দেওয়া, ঘরে সন্ধ্যাবাতি দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত কাজ সেবকগণ করিতেন। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সেবাপরায়ণ ছাত্রদের সেবায় মোহিত হইয়া এক প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারী বলিয়াছিলেন —"বিদেশে মরিলে যেন এই বরিশাল সহরেই আমার মৃত্যু হয়।" ব্রজমোহন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের এক পুত্র কলিকাতায় মারা যায়। তখন সৎকারের জন্য লোকাভাব হওয়ায় তিনি খেদে বলিয়াছিলেন —"অভাগা ছেলে মর্‌লি ত বরিশালে মর্‌লি না কেন ?"

পুণ্যশ্লোক কালীশচন্দ্র উল্লিখিতরূপ নিঃস্বার্থ সেবাব্রতে বরিশালনিবাসী যুবকদিগকে দীক্ষিত করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া আনন্দধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সেবার ভাবটি সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য বরিশালবাসী জনমণ্ডলী কালীশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষাকল্পে "কালীশচন্দ্র আতুরাশ্রম" স্থাপন করিয়াছেন। উক্ত আশ্রমে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে অল্পসংখ্যক রোগীকে আশ্রয় প্রদান করিয়া চিকিৎসা ও সেবা করা হইতেছে।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের এই সেবাসমিতির সংশ্রবে বরিশালবাসী চিকিৎসক মহাশয়দের সহৃদয়তার কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে। ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত, ডাক্তার ক্ষীরোদবিহারী মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার বিহারীলাল বিশ্বাস এবং অপর চিকিৎসকগণ আহূত হইবামাত্র বিনা দর্শনীতে প্রসন্নমনে নিরাশ্রয় রোগীদিগকে চিকিৎসা করিতেন। এক্ষণেও অনেক চিকিৎসক এইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়া সেবক ও রোগীদিগের কৃতজ্ঞতাভাজন হইতেছেন। বরিশালবাসী অসহায় রোগীদের অকৃত্রিম বন্ধু জনপ্রিয় সুচিকিৎসক তারিণী-কুমার গুপ্ত মহাশয় অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর পরে কয়েকমাস মধ্যে পরলোক যাত্রা করেন। দরিদ্রবান্ধবসমিতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। আমার মনে আছে, মুমূর্ষু রোগীর জন্য রাত্রি দ্বিতীয়,তৃতীয় প্রহরেও তাঁহাকে আহ্বান করা হইলে তিনি কিঞ্চিন্মাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন না। বসন্তরোগ ভীষণ সংক্রামক বলিয়া সাধারণতঃ বিদ্যালয়ের যুবকদিগকে এই রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের সেবায় নিযুক্ত করা হয় না। একবার সেবকদলের এক দলপতি দুইটি ছাত্রসহ এক বসন্ত রোগীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে রোগীর ভবনেই তারিণী-কুমারের সহিত তাঁহাদের দেখা হইল, তিনি দলপতিকে সস্নেহে তিরস্কার করিয়া উক্ত রোগীর নিকট হইতে ছাত্রদ্বয়সহ প্রস্থান করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার ত্যাগী পুরুষ, ত্যাগের উচ্চ আদর্শ লইয়া

তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে আত্মশক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। ছাত্রদিগকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার বিদ্যালয়ে যে সকল আয়োজন করিয়াছিলেন সংক্ষেপে আমরা সেই সমস্ত আলোচনা করিয়াছি। অশ্বিনীকুমারের আদর্শে অনুপ্রাণিত বহু সুযোগ্য শিক্ষক ও অধ্যাপক এখনও নিষ্ঠা-সহকারে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সেবা করিতেছেন। যাঁহারা ত্যাগের ও সেবার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ দেখাইয়া ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সেবা করিতে করিতে পরলোক যাত্রা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অক্লান্তকর্ম্মী অক্ষয়কুমার, দরিদ্রবান্ধব কালীশচন্দ্র, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ কালীপ্রসন্ন, শিশু-স্বভাব চিন্তাহরণ, এবং মনস্বী ছাত্রবন্ধু শশিমোহন বসাক মহাশয়দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ব্রজমোহন বিদ্যালয় বিদ্যাবিক্রয়ের সাধারণ পণ্যশালা নহে। অর্থোপার্জ্জনের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য অশ্বিনীকুমার এই বিদ্যালয় স্থাপন করেন নাই। দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় দেশবাসীকে অল্প ব্যয়ে সুশিক্ষা দানের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা লইয়া অশ্বিনীকুমার ব্রজমোহন বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার স্কুলকলেজ হইতে কদাচ এক কপর্দ্দক গ্রহণ করেন নাই। কেবল তাহা নহে, মধ্যবিত্ত ভূম্যধিকারী হইয়াও তিনি এই বিদ্যালয়ের জন্য অকাতর চিত্তে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা দান এবং স্বয়ং প্রায় সতর আঠার বৎসর বিনা বেতনে অধ্যাপকতা করিয়াছিলেন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি, অশ্বিনীকুমার তাঁহার আইন ব্যবসায়ের জমানো পসার অবহেলায় ত্যাগ করিয়া ঘরের খাইয়া বিনা বেতনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন বহু বুদ্ধিমান্ লোক নাসিকা কুঞ্চন করিয়া বলিয়াছিলেন—"লোক্‌টা পাগল"। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, জাতীয় মহাসমিতির মান্দ্রাজ অধিবেশনে সভাপতি পরলোকগত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"অশ্বিনীকুমার ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় করিলে স্বনামধন্য স্যর রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ের সমকক্ষ হইতে পারিতেন।" এত বড় সম্ভাবনা, অর্থোপার্জ্জনের এমন সুবর্ণ সুযোগ যিনি ত্যাগ করেন বুদ্ধিমানেরা তাঁহাকে "পাগল" বলিবেন বই কি ? সব ছাড়িয়া অশ্বিনীকুমার কি হইলেন ? হইলেন কিনা "ইস্কুলের মাষ্টর" ! বস্তুতঃ শিক্ষকতাকে তিনি অতি পবিত্র, অতি উচ্চ কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। ছাত্রগণ কি প্রকারে শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল লাভ করিয়া যথার্থ মানুষ হইতে পারিবে ইহাই তাঁহার ধ্যানজ্ঞান ছিল। ইহারই ফলে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শত শত যুবক যথার্থ সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইতে পারিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারের অনুরাগী শিষ্যদের অনেকেই তাঁহাদের গুরুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া শিক্ষকতাকে জীবনের ব্রত করিয়াছেন। এখনও বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগে নানা স্থলের স্কুল ও কলেজে যাঁহারা চরিত্রবান্ সুশিক্ষক বলিয়া ছাত্রদের শ্রদ্ধাপ্রীতি লাভ করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন

ছাত্রসংখ্যা অল্প নহে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বঙ্গদেশে এমন একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল না যেখানে শিক্ষকদের মধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র দেখা না যাইত। ধর্ম্মপরায়ণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠ আদর্শ শিক্ষক অশ্বিনীকুমারের নিকট যাঁহারা সুশিক্ষা লাভের সুযোগ পাইয়াছিলেন তাঁহাদের চরিত্রের কিছু না কিছু বিশেষত্ব দেখা যাইত। তিনি ইংরাজী সাহিত্য অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহার পাঠনা এমন হৃদয়গ্রাহী হইত, যে ছাত্রেরা নির্ব্বাক্ হইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিত। ইংরাজী সাহিত্যে অশ্বিনীকুমারের গভীর পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার সুমিষ্ট, বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং অধ্যাপনার মনোহর ভঙ্গী ছাত্রদের হৃদয় রঞ্জন করিত। অতি উত্তম অভিনয় দর্শনে যেমন আনন্দ জন্মে সাহিত্যরসিক অশ্বিনীকুমারের নিকট "ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ্" "টেনিসন্" "সেলি" প্রভৃতি কবিগণের কবিতা পাঠ করিয়া সেইরূপ আনন্দ পাওয়া যাইত। অধ্যাপক হিসাবে অশ্বিনীকুমারের স্থান কোথায় হইতে পারে তাহা অসংশয়ে বলিতে পারি না। তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর কীর্ত্তিশালী অধ্যাপক বঙ্গদেশে ছিলেন ও রহিয়াছেন তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার মত শিক্ষানুরাগী, তাঁহার মত ছাত্রদের শুভানুধ্যায়ী আদর্শ শিক্ষক আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। ছাত্রদিগকে সুশিক্ষা দান করিবার জন্য তাঁহার অন্তরে কিরূপ আকাঙ্ক্ষা নিরন্তর প্রজ্বলিত ছিল হরিদ্বার হইতে ১৯১৮ অব্দে লিখিত তাঁহার এক পত্রে উহা ব্যক্ত হইবে। তিনি লিখিয়াছিলেন——

স্নেহাস্পদ বাবাজিগণ—

যে হরিদ্বার হইতে ১৮৮৪ সনের জুন মাসে আমার পরমারাধ্য পিতৃদেব তোমাদিগের বিদ্যালয় স্থাপনার্থ আমার নিকটে বরিশালে আদেশ প্রেরণ করিয়াছিলেন, আজ সেই মাসে সেই হরিদ্বারে এই পুণ্যক্ষেত্রে জগৎকর্ত্তার শ্রীচরণ-তলে বসিয়া আমার পিতৃদেবকে ও তোমাদিগকে মনে হইতেছে। পিতৃদেব যে শুভেচ্ছা লইয়া বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা তোমাদিগের জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করুক। আমিও ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে তোমাদিগের কল্যাণাকাঙ্ক্ষা করিতেছি।

তোমাদিগের চতুস্ত্রিংশৎ বার্ষিক উৎসবের দিনে প্রত্যেক বিদ্যার্থীকে শ্রুতিবাক্যে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি—

অপক্রামন্ পৌরুষেয়াদ্ বৃণানো দৈব্যং বচঃ।
প্রণীতীরভ্যাবর্ত্তস্ব বিশ্বেভিঃ সখিভিঃ সহ ॥

লৌকিক বাক্য (লৌকিক বিষয়াত্মক গ্রন্থাদি) অতিক্রম করিয়া দেবসম্বন্ধীয় বাক্য (তত্ত্বজ্ঞানমূলক গ্রন্থাদি) বরণ করিতে করিতে সকল সতীর্থ বন্ধুগণের সঙ্গে মিলিত হইয়া প্রকৃষ্ট নীতি অবলম্বন কর। অপরা বিদ্যায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া পরাবিদ্যার্জ্জনে যেন তোমাদিগের চেষ্টা হয়। তাহা হইলেই সত্য, প্রেম, পবিত্রতায় মণ্ডিত হইবে ; প্রকৃষ্ট নীতির অধিকারী হইবে।

সত্য

সত্যস্থ হইয়া জ্যোতিষ্মান্ হও। তোমাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ে দিনে দিনে তত্ত্বজ্ঞান প্রতিভাত হউক। অধ্যয়ন

এবং জ্ঞানিসঙ্গদ্বারা সংগৃহীত তত্ত্বগুলি তেজস্বিতার সহিত গ্রহণ কর। সেই তত্ত্বজ্যোতিতে তোমাদিগের জীবন ভাস্বর হইয়া সমস্ত দেশকে উদ্দীপ্ত করুক। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের লীলা দেখিতে দেখিতে সেই বহুরূপী বিরাট্ পুরুষের চিন্তায় অগ্রসর হও এবং কর্ত্তা করুন, এমন দিন যেন তোমাদিগের জীবনে উপস্থিত হয়, যে দিন অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয় কাহাকে বলে তাহা হস্তামলকবৎ ধারণা করিতে পার।

প্রেম

যেমন জ্ঞানে জোতিষ্মান্ হইবে তেমনি প্রেমে মধুময় হইবে। যাঁহার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন "রসো বৈ সঃ", তাঁহার সেই শিবতম রসে রসিক হইয়া অমৃত বিলাইবার অধিকারী হও। স্বকীয় চিত্ত মধুপ্লাবিত করিবার জন্য রসিক-শেখরের শ্রীচরণে অনবরত প্রার্থনা করিবে।

মধুমন্মে নিষ্ক্রমণং মধুমন্মে পরায়ণং।
বাচা বদামি মধুমদ্ ভূয়াসং মধু সংদৃশঃ ॥

আমার নিকট গমন, অর্থাৎ সন্নিহিত বিষয়ে প্রবর্ত্তন যেন মধুময় হয়, আমার দূর গমন, অর্থাৎ দূরস্থ বিষয়ে বিচরণ যেন মধুময় হয়; আমি যে বাক্য উচ্চারণ করি, তাহাও যেন মধুময় হয় এবং যে ব্যক্তি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, তাঁহার নিকটেও আমি যেন মধু (প্রীতিভাজন) হই। এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে মধুময় হইয়া যাইবে। জগন্ময় যাহাতে

মধুবর্ষী হইতে পার তজ্জন্য যখন যে দিকে যাইবে সেই দিকের জীবকুলকে লক্ষ্য করিয়াই পুনঃ পুনঃ বলিতে থাকিবে—

নন্দন্তু সর্ব্বভূতানি স্নিহ্যন্তু বিজনেষ্বপি।
স্বস্ত্যস্তু সর্ব্বভূতেষু নিরাতঙ্কানি সন্তু চ॥
মা ব্যাধিরস্তু ভূতানামাধয়োন ভবন্তুচ।
মৈত্রীমশেষ ভূতানি পুষ্যন্তু সকলে জনে॥
যোমেঽদ্য স্নিহ্যতে তস্য শিবমস্তু সদা ভুবি।
যশ্চমাং দ্বেষ্টি লোকেঽস্মিন্ সোঽপি ভদ্রাণি পশ্যতু॥

সকল ভূত আনন্দ করুক, বিজনেও ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া থাকুক, সকল ভূতের মঙ্গল হউক, সকলেই নিরাতঙ্ক হউক, কোনও জীবের যেন মানসিক ব্যাধি না হয়, অশেষ জীবসকলের প্রতি পরস্পর মৈত্রী পোষণ করুক, যে আমাকে আজ স্নেহ করে, তাহার পৃথিবীতে সর্ব্বদা মঙ্গল হউক, আর যে আমাকে ইহলোকে দ্বেষ করে সেও ভদ্রদর্শন করুক—তাহারও মঙ্গল হউক।

এই বাক্যাবলীর বারংবার উচ্চারণে সর্ব্বভূত-হিতকল্পে প্রাণ উন্মুক্ত হইবে। তোমাদিগের আর্ত্তসেবক-সমিতির জয় জয়কার হইবে; শক্ররও মঙ্গল হউক, কি সুন্দর ভাব! যাঁহার চোখ আছে তিনি দেখিতে পান. শক্রও আমাদিগের কত উপকারী। দ্বেষ, ক্রোধ, অবাধ্যতাদ্বারা সাধারণ লোকের মন বিচলিত করা যায়, কিন্তু যিনি জ্ঞানী ও যাঁহার হৃদয়ে মধু সঞ্চিত হইয়াছে, তিনি তাহাতে বিচলিত হন না; পরন্তু তদ্দারা উপকৃত হন এবং

যাহারা বিরক্তিকর ব্যবহার করে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন।

এক ব্যক্তির একটী নিতান্ত অবাধ্য ভৃত্য ছিল। তিনি যাহা চাহিতেন সে তাহার বিপরীত কার্য্য করিত। তাহার ব্যবহারে গৃহস্থিত সকলেরই ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছিল, কিন্তু প্রভুর প্রসন্ন মুখ কখনও মলিন হইল না। এক দিবস কয়েকটী অতিথি তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তন্মধ্যে একজন প্রভুকে বলিলেন যে, এরূপ ভৃত্যকে বিদায় দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি বলিলেন তাহা হইতে পারে না, এ ব্যক্তি আমার বড়ই উপকারী আমার মনের dumb-bell ; ইহার সংশ্রবে আসিয়া আমার মনের বলবিধান হইতেছে,—ধৈর্য্য, তিতিক্ষা শিক্ষা হইতেছে। যাহা কিছু উদ্বেগজনক, কষ্টজনক, যিনি তাহার দিকে এই ভাবে দৃষ্টি করিতে পারেন, তিনিই জ্ঞান ও প্রেমে ভূষিত হন।

পবিত্রতা

যেমন জ্ঞান ও প্রেমে সমৃদ্ধ হইবে, তেমনি পবিত্রতামণ্ডিত হইয়া স্বকীয় ও পরকীয় কল্যাণ সাধনে তৎপর হইবে। শরীর ও মন সুস্থ না হইলে পবিত্র হওয়া যায় না। সিদ্ধকাঠী গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ সেন কবিরত্ন মহাশয়ের রচিত শ্লোকে বড়ই সুন্দর ভাবে এই তথ্যটি প্রকাশিত হইয়াছে—

রোগাভিভূতে শরীরে বিপন্নে ক্রোধাদি দুষ্টে মনসি বিষণ্নে।
ন নির্ম্মলং ভাতি তদন্তরাত্মা মেঘাবৃতে ব্যোম্নি যথা শশাঙ্কঃ॥

রোগাভিভূত বিপন্ন শরীর হইলে ও ক্রোধাদিদুষ্ট বিষণ্ন মন

হইলে, যেমন মেঘাবৃত আকাশে শশাঙ্ক পরিষ্কাররূপে প্রতিভাত হন না, তেমনি অন্তরাত্মা পরিষ্কাররূপে হৃদয়ে প্রকাশ পান না। ইন্দ্রিয় বিক্ষেপ, আধি ও ব্যাধি—উভয়ই অনিষ্টোৎপাদক। সুতরাং শরীর পবিত্র রাখিবার জন্য ভোগলালসা দূর করিয়া স্বাস্থ্যকর ক্রীড়া ও ব্যায়ামের সময়ে ও অন্য সময়ে এই মন্ত্র জপ করিবে,

শং মে পরস্মৈ গাত্রায় শমস্ত্ববরায় মে।
শং মে চতুর্ভ্যো অঙ্গেভ্যঃ শমস্তু তন্বেমম॥

আমার ঊর্দ্ধস্থ গাত্রের মঙ্গল হউক ; আমার অধঃস্থ গাত্রের মঙ্গল হউক ; আমার দুই হস্ত ও দুই পদ এই চারি অঙ্গের মঙ্গল হউক। আমার সমস্ত শরীরের মঙ্গল হউক, অর্থাৎ আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় কল্যাণকর হউক। এই আকঙ্ক্ষার প্রার্থনা হইবে—

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম দেবা ভদ্রং পশ্যেমাক্ষিভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈস্তুষ্টুবাংসস্তনূভির্ব্যাশেম দেবহিতং যদায়ুঃ॥

হে দেবগণ, কর্ণে যেন ভদ্র শব্দই শ্রবণ করি ও নয়নে যেন ভদ্র বস্তুই দর্শন করি। অভদ্র সংশ্রব না থাকিলে অঙ্গ স্থির হইবে, শরীর, ইন্দ্রিয় বিক্ষেপশূন্য হইবে, তদ্দ্বারা তোমাদিগের স্তব করিতে করিতে দেবভোগ্য আয়ু প্রাপ্ত হইব।

এইরূপ চিন্তনে আপনার শরীর শুদ্ধ রাখিলে মনেও প্রভূত বল সঞ্চিত হইবে। শুদ্ধ মন ও শুদ্ধ শরীরদ্বারা অধুনা আপনার ভাই, ভগিনী, সহপাঠিগণ ও অন্যান্য বালক ও যুবকদিগের এবং

যখন যোগ্য হইবে তখন প্রতিবেশী, সমগ্র সমাজের ও দেশের মলিনতা দূর করিয়া পবিত্রতা সাধনে যত্নবান্ হইবে। এরূপ কার্য্য করিতে যে বিঘ্ন উপস্থিত হয় তাহা দূর করিবার ক্ষমতা কর্ত্তা দেন। শুভ কার্য্যে জানিও, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড সহায়। এই বিশ্বাসে প্রাণ বোঝাই করিয়া চলিবে।

অভয়ং নঃ করোত্যন্তরীক্ষমভয়ং দ্যাবা পৃথিবী উভে ইমে।
অভয়ং পশ্চাদভয়ং পুরস্তাদুত্তরাদধরাদভয়ং নো অস্তু ॥

অন্তরীক্ষ আমাদিগকে অভয়দান করুন, এই দ্যুলোক ও ভূলোক উভয়ই অভয় দান করুন, পশ্চিম, পূর্ব্ব, উত্তর, দক্ষিণ সকল দিকেই আমাদিগের অভয় হউক। বাস্তবিকই সকল দিক্ হইতে অভয় পাইবে এবং ভয়শূন্য হইয়া অবিরত চেষ্টা করিতে থাকিবে। তাহার ফল অবশ্যম্ভাবী, আজ না হউক, কাল, তুমি জীবিত থাকিতে না হউক, চেষ্টা একদিন ফলবতী হইবেই। ইহা ধ্রুবসত্য—ইহা ধ্রুব।

আজ সত্য, প্রেম, পবিত্রতার কথা কহিতে কহিতে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কোন কোন ভাগ্যধর ভূতপূর্ব্ব ছাত্রের মুখমণ্ডল মনে পড়ায় আমার আনন্দ হইতেছে। তাহাদিগের মধুস্মৃতিসহ এই উৎসব উপলক্ষে তোমাদিগকে যে অনুরোধ করিলাম, তাহা পালন করিয়া তোমরা শ্বেতসরোজের ন্যায় সুষমাসম্পন্ন ও লোকানন্দকর হও, তেমনি শুভ্রদীপ্তিশালী, তেমনি সুরভিময়, তেমনি মকরন্দপূর্ণ হও। তোমাদিগের প্রত্যেক বিদ্যার্থীর উদ্দেশে বলিতেছি—

শিবে তেন্তাম ছাবা পৃথিবী অসন্তাপে অভিশ্রিয়ৌ।

দ্যুলোক ও ভূলোক সন্তাপহীন ও শ্রীযুক্ত হইয়া তোমার কল্যাণপ্রদ হউক।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত

অশ্বিনীকুমারের অন্যতম প্রিয় শিষ্য কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল বাবু গুণদাচরণ সেন মহাশয় কলিকাতার ‘রামমোহন লাইব্রেরীতে’ এক স্মৃতিসভায় বলিয়াছিলেন—“ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে তখন যে দুইটি টিনের ঘর ছিল তাহার একটি ঘরের নির্জ্জনকক্ষে অশ্বিনীকুমারের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হইল। সেই অবধি প্রত্যেক দিন স্কুল কলেজের ছুটির পর বাড়ী আসিয়া খাইয়াই মোহাবিষ্টের মত তাঁহার গৃহে সেই তক্তপোষখানার উপর তাঁহার পিঠের কাছে গিয়া বসিতাম। তিনি হয়ত কিছু পড়িতেন, না হয় কোন সৎপ্রসঙ্গ করিতেন, আর আমরা ছেলের দল অভিভূত হইয়া শুনিতাম। তিনি কখন কখন আমাদিগকে লইয়া পায়ে হাঁটিয়া বা নৌকায় সহরের বাহিরে বেড়াইতে যাইতেন। নূন, লঙ্কার সহিত চাল্‌তা মাখিয়া খাওয়া তাঁহার তখনকার সখ ছিল। মুড়ি প্রায়ই সঙ্গে থাকিত বা সংগ্রহ করিয়া লইতাম। সেই বনজঙ্গলে আমাদের মত তিনিও ছুটাছুটি করিতেন। রাত্রিতে কোন কোন দিন তাঁহার কাছেই থাকিতাম।

“শিশু ভাবিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছি, তিনি

ভালবাসিয়া প্রাণের কথা আদায় করিয়া লইতেন, অথচ কোন অসঙ্গত কাজ করিলে তাঁহার ভয়ে অন্তরাত্মা কাঁপিত। যখন যে অপরাধ করিয়াছি চোখের জলে ধুইয়া মুছিয়া আবার কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। এমন কোনও দুষ্কার্য্য কেহ কখনও করিতে পারে নাই যাহা দ্বারা তাঁহার ভালবাসা হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও বঞ্চিত হইতে হইয়াছে। প্রেমে তিনি সিদ্ধ ছিলেন। বয়স, জাতি, পদ, সাধু, পাপী নির্ব্বিশেষে তিনি সকলকে এই প্রেমমধু বর্ষণ করিয়াছেন। বাল্যের প্রিয়তম বন্ধু প্রিয়নাথ, ভুবনেশ্বর ও ত্রিগুণাচরণ সম্বন্ধে কথা কহিতে কহিতে বৃদ্ধ বয়সেও তাঁহার কণ্ঠ আড়ষ্ট হইয়া আসিত। পঁচিশ বৎসর বয়সে যখন তিনি বরিশালে ওকালতি করিতে আসিলেন তখন ওলাউঠা ও বসন্ত রোগীর শুশ্রূষায়, আর তারপর ওকালতি ছাড়িয়া বরিশালের যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধনে তিনি অপরিমেয় প্রেমের লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা প্রত্যেকেই ভাবিতাম, তিনি আমাকে বেশী ভালবাসেন, অপরকে আদর করিতে দেখিলে আমার মনে তো অনেক সময় হিংসা হইত।

"ছেলেদের দমিতে দেখিলে বলিতেন, তোরা যে সিংহ-শাবক, শেয়াল কুকুরের বাচ্চার মত কেউ মেউ করিস্ কেন? তেজের বিকাশ দেখিলে প্রফুল্ল হইতেন, বলিতেন—গর্হিত কিছু করিলেও ভীরুর মত করিও না। বীরের মত নির্ভীক ভাবে কর। যাই কর পুরুষ হও।"

অশ্বিনীকুমারের অন্যতম প্রিয় ছাত্র ধর্ম্মপ্রাণ দেশসেবক শ্রীযুত ললিতমোহন দাস মহাশয় লিখিয়াছেন—"গ্রামে যখন মাইনর স্কুলে পড়িতাম তখনই অশ্বিনীকুমারের সুনাম শুনিতে পাই। অল্পবয়স্ক যুবা, চশ্‌মা চক্ষে, খুব বিদ্বান্, এম, এ পাশ। তৎকালে বরিশাল জিলায় এম, এ পাশ লোক বড় ছিল না। শুনিয়াছিলাম, তাঁহার স্বভাব খুব মিষ্ট, তিনি চরিত্রবান্, ধার্ম্মিক ও দেশহিতৈষী। ১৮৮৪ অব্দে যখন মাইনর পাশ করিয়া বরিশালে পড়িতে আসিলাম তখন অশ্বিনীকুমার উকিল। মধ্যে মধ্যে দেখিতাম। দূর হইতে লোকে দেখাইয়া দিত, ঐ অশ্বিনী বাবু। ঐ বৎসর ২৭এ জুন ব্রজমোহন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। আমি সেই দিনই গভর্ণমেণ্ট স্কুল ত্যাগ করিয়া ঐ স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। শিক্ষকগণ খুব আদরযত্ন করিতে লাগিলেন। আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রগণ শিক্ষকদের ও অশ্বিনী বাবুর বিশেষ প্রিয় ছিল। তাঁহাদের প্রভাবে আমাদের জীবনের আদর্শ উন্নত হইতে লাগিল। এই বৎসরই আসামের কুলীরমণী সুকুরমণি ও ওয়েব্ সাহেবের মামলা লইয়া দেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হয়। বরিশালে অশ্বিনীকুমার, কালীমোহন, মনোরঞ্জন প্রভৃতি স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। আমরা সেই সকল বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিতাম। তখন হইতেই দেশকে স্বাধীন করিবার ইচ্ছা, জাতীয় জীবনগঠনের আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রাণে জাগরিত হইয়াছিল। তখনও অশ্বিনীবাবুর সঙ্গে

আমার পরিচয় ছিল না। আমার সমপাঠী অনেকে তাঁহার প্রিয় পাত্র ছিল। আমার ইচ্ছা করিয়া আলাপ করিবার প্রবৃত্তি ছিল না। তাঁহার স্কুলে উৎকৃষ্ট ছাত্র হইলে তিনি নিজেই আদর করিবেন। ক্রমে তাঁহার সাথে আলাপ হইল। তিনি আদর করিতে লাগিলেন। আমিও তাঁহার চরণতলে বসিয়া সকল বিষয় শিক্ষালাভ করিতে লাগিলাম। তিনি তখনও ওকালতি করিতেন। এই সময়ে তিনি জাতীয় সঙ্গীত রচনা করিতেন, আমরা সে সকল মুখস্থ করিতাম। ক্রমে তাঁহার বাসায় যাওয়া আরম্ভ করিলাম। তিনি আদর করিতেন, তাঁহার এই আদরের প্রণালী ছিল স্বতন্ত্র রকমের। কিল, চড়, লাথি মারিয়া তিনি আদর দেখাইতেন, ইহা আমাদের খুব ভাল লাগিত। তিনি তখন ব্রাহ্মসমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সেখানে বক্তৃতা করিতেন, নিয়মিত মত উপাসনাতে যাইতেন। আমি ব্রাহ্মসমাজে যাইতাম না। আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন পূজার পরে বরিশালে আসিয়া দেখি বাসাতে রান্নার বন্দোবস্ত নাই। অশ্বিনীবাবুর বাসায় আশ্রয় পাইলাম। তখন তিনি প্রত্যেক রবিবার প্রাতঃকালে ছাত্রসমাজে বক্তৃতা করিতেন। 'জলের মধ্যে আগুন,' 'সরকারে খাব' এইরূপ সব অদ্ভুত বিষয়ে বক্তৃতা হইত। বক্তৃতা শুনিবার জন্য অত্যন্ত ইচ্ছা হইত, গোপনে যাইতাম, কারণ বাবা কিংবা অন্য কোন অভিভাবক জানিতে পারিলে রাগ করিবেন। একদিন যাইয়া দেখি, বক্তৃতা আরম্ভ

হইয়াছে। মন্দির লোকে পূর্ণ; আমি কোন রকমে পশ্চাতের বেঞ্চে স্থান করিয়া লইলাম। অশ্বিনীবাবু এক একটি কথা কহিতেছেন, আর থামিতেছেন, হঠাৎ তিনি পড়িয়া গেলেন। আর "কবে সহজে মা বলে জুড়াব প্রাণ" এই গান আরম্ভ হইল। বক্তৃতা আর হইল না। দশটা পর্য্যন্ত গান চলিল। কি উদ্দীপনা, কি বিভোর ভাব! অশ্বিনীবাবু সংকীর্ত্তনে মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন, মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইতেন। সেই দিন প্রথম হইতেই ঐভাব হইয়াছিল। আমার দুঃখ হইল, আগে কেন আসিলাম না, তদবধি সকালে উপাসনার পূর্ব্বে মন্দিরে যাইতাম। সে সময়ে বরিশালে যেন নূতন ভাবের নবদ্বীপের আবির্ভাব হইল। জমিদার স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায়ের বাড়ীতে প্রত্যহ কীর্ত্তন হইত। অশ্বিনীকুমার, কালীমোহন, মনোরঞ্জন, মনোমোহন, গোরাচাঁদ, গোবিন্দচন্দ্র, দ্বারকানাথ, মথুরানাথ প্রভৃতি বহুলোক সমবেত হইয়া গভীর রজনী পর্য্যন্ত কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিতেন।

এদিকে অশ্বিনীকুমার কংগ্রেসের কার্য্যেও উৎসাহী ছিলেন। ছাত্রগণের মধ্যে নীতি, ধর্ম্ম ও স্বদেশপ্রীতির ভাব জাগরিত করিবার জন্য তিনি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেন। এই সময়ে বরিশালে ফ্লোটিলা কোম্পানী ও কারঠাকুর কোম্পানীর ষ্টীমারের প্রতিযোগিতা চলিতেছিল। লোকে যাহাতে ঠাকুর কোম্পানীর ষ্টীমারে খুল্না যায় আমরা সেই চেষ্টা করিতাম। 'স্বদেশী' নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইল। আমরা ঘুরিয়া

ঘুরিয়া ঐ কাগজ বিক্রয় করিতাম। আমাদের স্কুলের ছাত্রগণ যাহাতে নীতিপরায়ণ, স্বদেশভক্ত ও ধর্ম্মশীল হয় তজ্জন্য অশ্বিনীবাবু ও শিক্ষকগণের বিশেষ যত্ন ছিল। তখন ব্রজমোহন স্কুলের সুনাম পড়িয়া গিয়াছিল। ১৮৮৮ অব্দে আমরা এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেই। সেইবারে বৃত্তিতে গভর্ণমেণ্ট স্কুলকে হারাইয়া আমরা গৌরব অনুভব করিয়াছিলাম। অশ্বিনীবাবু, বরদাপ্রসন্ন রায় প্রমুখ ব্যক্তিগণ রোগীর সেবা, দুঃখীর দুঃখ দূরীকরণ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। নিরাশ্রয় রোগীর খবর পাইলেই ইহাঁরা সেবা করিতে যাইতেন। আমরাও পালাক্রমে সেবা করিতে যাইতাম। বরিশাল সহর যেন আমাদের হইয়া গেল। আমরা জল-পানির খরচ কমাইয়া ঐ টাকা গরীব দুঃখীকে দান করিতাম।”

অশ্বিনীকুমারের পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র স্বনামখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম, এ, মহাশয় তাঁহার ‘গুরুদেব’ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন——

তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম আমার শৈশবে, তখন আমি মাদারীপুর স্কুলে পড়ি। ছুটির পর মাদারীপুরে ফিরিতেছিলাম, শ্রোলক হইতে মাদারীপুর ফিরিয়া যাইবার পথে গৌরনদী হইয়া যাইতে হয়। গৌরনদীতে তখন District Board কি Local Board এর election হইতেছিল। বহু লোকের সমাগম, তিনি সবেমাত্র আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। তিনি নৌকা হইতে তীরে উঠিতেছিলেন, দূর হইতে কে দেখাইয়া দিল, “ঐ অশ্বিনীবাবু।”

দেখিলাম এক মহাপুরুষ ধপ্‌ধপে থান ধুতি পরা, গায়ে তাঁর সেই দেশ-বিশ্রুত জ্যাকেট্ আস্তিনের পিরাণ, তার উপরে ঢাকাই উড়ানি যেমন করিয়া (শীতকালের মত সর্ব্বাঙ্গে জড়াইয়া) তিনি পরিতেন তেমনি, চোখে সোণার চশ্‌মা, মাথায় কালো কোঁকড়ান চুল, প্রতিভামণ্ডিত বিস্তৃত ললাট,সর্ব্বাঙ্গ দিয়া যেন একটা জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে, মুখশ্রীতে মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের অপূর্ব্ব সমাবেশ ; দেখিলে মুনির মন হরণ করে।

তারপর দেখিয়াছিলাম যখন Entrance পরীক্ষা দিতে মাদারীপুর হইতে বরিশাল আসিয়াছিলাম। তখন পরীক্ষান্তে সমস্ত পরীক্ষার্থীদিগকে অভিনন্দন দেওয়া হইত। তাহাতে আবৃত্তি, ক্ষুদ্র অভিনয় এবং নানাপ্রকার নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদের বন্দোবস্ত থাকিত। অশ্বিনীকুমার সেই ছাত্রসম্মিলনী অনুষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁর কলেজের প্রতিদ্বন্দ্বী নিন্দকগণ বলিত, "ইহা অশ্বিনী দত্তের ছেলে ভাগাইবার কল!" অর্থাৎ এ সভায় তাঁহার বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে যাহারা কলেজে পড়িবে তাহারা তাঁহারি কলেজে আসিয়া ভর্ত্তি হইবে, এই মত্‌লবে অশ্বিনী দত্ত এই সকল ফিকির করিতেন। কথাটা আদবে মিথ্যা হইলেও, অনেকের সম্বন্ধে,অন্ততঃ আমার সম্বন্ধে, সত্য হইয়াছিল। গুরুদেব সেই সভায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন। Entrance পাশ করিয়া, বরিশালে দুইটি কলেজ এবং অন্য নানাবিধ সুবিধা থাকিলেও, মফঃস্বলের ছোট্ট সহরে, পচা কলেজে পড়িব না, রাজধানীর নামজাদা কোনও

কলেজে পড়িব, স্থির করিয়াছিলাম। সকল উল্‌টিয়া গেল। পিতাঠাকুর তখন জীবিত ছিলেন, আসিয়া তাঁহাকে জানাইলাম বরিশালেই পড়িব। তাঁহার অনেক অনুরোধ ও যুক্তি যাহা পারিয়াছিল না, হঠাৎ কোন্ যাদুবলে তাহা ঘটিল, তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না, যদিও তাঁহার অনেক জেরাতেও আমি তাহা পরিষ্কার করিয়া বলিলাম না।

First Arts পাশ করিয়া Medical Collegeএ যাইব স্থির ছিল। যে রাত্রি প্রভাতে কলিকাতা রওয়ানা হইব তাহার সন্ধ্যায় তাঁহার সহিত দেখা করিয়া বিদায় লইতে গেলাম। Medical Collegeএ পড়িব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "আমি ত ভাবিয়াছিলাম, আশা করিয়াছিলাম, তুমি general lineএ থাকিবে, B. A. M. A. পাশ করিয়া শিক্ষক হইবে, দেশের কাজ করিবে।" বাড়ী আসিয়া আমার অভিভাবক জ্যেষ্ঠ ভাইকে বলিলাম (পিতৃদেব তখন পরলোকগত হইয়াছেন), "আমি Medical Collegeএ পড়িব না—Arts পড়িব।" ইহা অন্ধ গুরুভক্তি কিনা বলিতে পারি না। তবে ইহা আমাদিগের মধ্যে বিরল ছিল না।

আর একটী দিনের কথা মনে হইতেছে, তাঁহার সহিত নৌকাযোগে বরিশালের নদী ও খালসমূহে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। কলেজের সেই Excursion নহে, তিনি নিজে মাঝে মাঝে এরূপ নৌভ্রমণে বাহির হইতেন। সেদিন নৌকা-বিহারে সেবার সঙ্গী আমিই মাত্র ছিলাম। গ্রীষ্মকাল, কালবৈশাখীর ভীষণ

ঝড়জল হইয়া গিয়াছে, আমরা প্রকাণ্ড নদীর ধারে এক ক্ষুদ্র খালের মুখে আশ্রয় লইয়াছি, সম্মুখে বিস্তৃত নদীবক্ষ, ঝড়ের পর স্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে সন্ধ্যার অপেক্ষা করিতেছে। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে হঠাৎ কালবৈশাখীর নিবিড় কালো মেঘের আড়াল হইতে পশ্চিমাকাশে অস্তগামী সূর্য্য চক্ষু ঝলসিয়া ফুটিয়া উঠিল। আমরা বোটের ছাদে বসিয়াছিলাম। গুরুদেব পশ্চিমদিকে চাহিয়াছিলেন ; আবেগপূর্ণকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে স্থর করিয়া মুণ্ডকোপনিষৎ হইতে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসাসর্ব্বমিদং বিভাতি।"

সে দৃশ্য আজও আমার চিত্তে অঙ্কিত রহিয়াছে, তাঁহার বিহ্বল ভাব, তাঁহার চক্ষের দৃষ্টিহীন চাহনি স্মরণ করিয়া আজও আমার দেহ রোমাঞ্চিত হয়। এই-ই ছিল তাঁহার বিশেষত্ব।

শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন, ললিতমোহন দাস ও নরেন্দ্রনাথ-চক্রবর্ত্তী মহাশয়গণের সাক্ষ্য হইতে আমরা ইহা অসংশয়ে বুঝিতে পারি যে, বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয় এবং তাঁহার বিদ্যালয়ের স্থযোগ্য শিক্ষকগণ ছাত্রদের চরিত্রগঠনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এমন এক সময় ছিল যখন বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই সরকারী ও বেসরকারী উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ এক বাক্যে ইহা স্বীকার করিতেন যে, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ যেমন কর্ত্তব্যপরায়ণ, যেমন কর্ম্মকুশল, অপর সকল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ

সাধারণতঃ তেমন নহে। অনেক রাজকর্ম্মচারী তখন আগ্রহে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের তদানীন্তন ছাত্রদের নীতিপরায়ণতার একটি বিশেষ প্রমাণ এই যে, তখন বাৎসরিক কিংবা বাছনি পরীক্ষার সময় পরীক্ষাগৃহে পাহারার দরকার হইত না। শিক্ষকগণ ছাত্রদিগকে বিশ্বাস করিতেন, ছাত্রগণও সেই বিশ্বস্ততা রক্ষা করিত। একে অন্যের কাগজ দেখিয়া কিছু লিখিয়াছে এমন অভিযোগ তখন শুনা যাইত না। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব রেজিষ্ট্রার স্বর্গীয় রেভারেণ্ড্ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার পরিদর্শনে যাইয়া দেখিয়াছিলেন যে, এক প্রশস্ত হলে শত শত ছাত্র পরীক্ষার উত্তর লিখিতেছে, কোন অধ্যাপক সেখানে নাই, কিন্তু একজনও অপরের লিখিত উত্তর দেখিতেছে না। ইহাতে তিনি বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিয়া বিদ্যালয়ের অত্যুচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে পরলোকগত এক যুবকের বুদ্ধিমত্তা ও সরলতার কথা মনে পড়িতেছে। ছাত্রটির নাম শিশির, তাঁহার পিতা স্বর্গীয় হরকান্ত সেন মহাশয় বরিশালে স্বনামপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। এই ছাত্রটি যখন কোন বার্ষিক কিংবা বাছনি পরীক্ষা দিতেছিলেন তখন একদিন সকাল বেলায় তাঁহার হাতে বিকাল বেলাকার একখানি প্রশ্নপত্র পড়িল। তিনি ঐ প্রশ্নপত্র লইয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বিনীকুমারের কাছে উপস্থিত হইয়া বিষয়টি জানাইলেন। অশ্বিনীকুমার বালকটির সুবিবেচনায় এবং সততায় সন্তুষ্ট হইয়া

তৎক্ষণাৎ পরীক্ষা হলে গমন করিয়া তদন্ত করিয়া জানিলেন যে, অপর সকল ছাত্রই ঠিক প্রশ্নপত্র পাইয়াছে। তখন বিকাল বেলায় ঐ বালকটিকে নূতন এক প্রশ্নপত্র দেওয়া হইল। বালকটির সততায় পরীক্ষায় কোন প্রকার বিভ্রাট ঘটিতে পারে নাই। এই ঘটনাটি ক্ষুদ্র কিন্তু এইরূপ সততা দুর্ল্লভ কিনা পাঠকগণ তাহা ভাবিয়া দেখিবেন। অশ্বিনীকুমার তাহার ছাত্রদের মনে এইরূপ নীতিজ্ঞানের সঞ্চার করিয়া দিতে পারিতেন বলিয়াই তাঁহার নেতৃত্বাধীনে ব্রজমোহন বিদ্যালয় সমগ্র দেশবাসীর শ্রদ্ধাস্থল হইতে পারিয়াছিল।

ছাত্রদের প্রতি অশ্বিনীকুমারের প্রভাব

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অশ্বিনীকুমার একাধারে ছাত্রদের সুহৃদ্ ও শিক্ষক ছিলেন। তাঁহার এমন অনেক অনুরাগী শিষ্য ছিলেন যাহারা তাঁহার আদেশে অসাধ্যসাধন করিতে পারিতেন। অনেক ছাত্র ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেকটি কার্য্য করিবার সময়ে তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেন। এইরূপ এক ছাত্র একদিন সন্ধ্যাবেলা সকলে চলিয়া যাইবার পর অশ্বিনাকুমারকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্যর,এখন আমি কি করিব ?" অশ্বিনীকুমার ঈষৎ বিরক্তিসহকারে বলিলেন—"কেন, আমার আদেশ নিয়ে কি তোকে সব কাজ করতে হবে ?"

ছাত্রটি বলিলেন,—"হাঁ।"

অশ্বিনীকুমার বলিলেন,—"তবে যা, ঐ গাছে ওঠ্ গে।"

ছাত্রটি তাহাই করিল।

অশ্বিনীকুমার রাত্রিকালে আহারান্তে বিশ্রাম করিতে গিয়াছিলেন। রাত্রি প্রায় দুই ঘটিকার সময়ে জলপাত্র হস্তে তিনি বাহির হইয়াছেন, তখন জ্যোৎস্নালোকে দেখিলেন, নিকটবর্ত্তী গাছের উপর কে একজন বসিয়া রহিয়াছে। "কে ওখানে, কে ওখানে" বলিয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন সেই ছাত্রটি তখন বলিলেন, "স্যর, আমি।"

প্রশ্ন করিলেন—"তুই এখানে এমনভাবে এ সময়ে কেন আছিস্।"

উত্তর হইল—"আপনি যে আমায় গাছে উঠ্‌তে বলেছিলেন।"

তিনি ছাত্রটিকে সস্নেহ তিরস্কারে তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝাইয়া দিলেন। এই ছাত্রটি এখন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল।

ব্রজমোহন কলেজের এক মেধাবী ছাত্র একদিন গোপনে অশ্বিনীকুমারের নিকট আসিয়া জানাইলেন,—"স্যর, আমি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, পরীক্ষা দিলে হয়তো পাশও হইব, কিন্তু আমার এখন পর্য্যন্ত কোন বিষয়েই 'ব্যুৎপত্তি' হয় নাই। আপনি যদি অনুমতি করেন ত আমি আগামী বৎসরে উত্তমরূপে প্রস্তুত হইয়া পরীক্ষা দিই।"

অশ্বিনীকুমার তাঁহার এই মেধাবী ছাত্রের যোগ্যতা উত্তমরূপে জানিতেন, তিনি তাহাকে ধমক্ দিয়া বলিলেন—"যা, তোর

ব্যুৎপত্তির দরকার হইবে না। এই বছরই তোকে পরীক্ষা দিতে হইবে।”

ছাত্রটি আই, এ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এখন ইনি কোন এক কলেজে দক্ষতার সহিত ভাইস্-প্রিন্সিপালের কার্য্য করিতেছেন।

রাজকর্ম্মচারীদের রোষ

প্রায় বিশ বৎসর কাল ব্রজমোহন স্কুল ও কলেজের কার্য্য এমন সুচারুরূপে চলিয়াছিল যে বিদ্যালয়ের সুনাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। এই বঙ্গ-বিখ্যাত বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ সত্যবাদী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও ধর্ম্মভীরু হইত ইহা প্রায় সকলেই স্বীকার করিতেন। বেল্ সাহেব যখন সেটেল্‌মেণ্ট্ বিভাগের উচ্চকর্ম্মচারী ছিলেন তখন তিনি ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বহু ছাত্রকে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া বারংবার পত্রে অশ্বিনীকুমারের নিকট ঐ সকল কর্ম্মকচারীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কর্ম্মকুশলতার প্রশংসা করিয়াছিলেন।

বঙ্গবিভাগের পরে অকস্মাৎ পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষের মতি পরিবর্ত্তিত হইল। এতদিন তাহাদের চক্ষে যে বিদ্যালয়ের কার্য্যপ্রণালী, শিক্ষা ও শিষ্টতা অতীব প্রশংসনীয় ছিল, এক্ষণে উহার সমস্তই বিরূপ হইয়া গেল। লাট্ ফুলার সাহেবের অধীন সরকারী কর্ম্মচারীরা এই সময়ে মনে করিতেন, ব্রজমোহন বিদ্যালয় রাজনীতি আন্দোলনের এক দুর্ভেদ্য দুর্গ।

সুতরাং তাহাদের পক্ষ হইতে তখন এই বিদ্যালয়টিকে নির্য্যাতিত করিবার কোন চেষ্টারই ত্রুটী হইল না।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, গভর্ণমেণ্ট সহসা ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের উপর ক্ষেপিয়া উঠিলেন কেন? ইহার কারণ এই যে, এই সময়ে অশ্বিনীকুমার কেবল বরিশাল সহরের ছাত্রদলের হৃদয়ের উপর রাজত্ব করিতেন তাহা নহে, তিনি সমগ্র বরিশাল জিলাবাসী শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনমণ্ডলীর হৃদয়সিংহাসনের রাজা ছিলেন। তাঁহার আদেশে সমস্ত জিলার লোক উঠিত বসিত। অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুত ভবরঞ্জন মজুমদার, শ্রীযুত শরৎকুমার রায়, শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র দাস প্রভৃতি শিক্ষকগণ দেশসেবায় অশ্বিনীকুমারের প্রধান সহায় ছিলেন।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের পরে রিজ্‌লী সাহেব এই সার্কুলার প্রচার করেন—"ছাত্রেরা রাজনৈতিক কার্য্যে যোগ দান করিতে, বক্তৃতা করিতে, রাজনৈতিক সভায় যোগ দিতে পারিবে না।" ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ সর্ব্বতোভাবে উক্ত আদেশ মানিত না। বি, এ পরীক্ষা প্রদানের পরে ব্রজমোহন কলেজের অন্যতম ছাত্র শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বসু একটি বক্তৃতায় রাজনৈতিক বিষয় আলোচনা করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট তখন কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়কে এক পত্রে জানাইলেন—"ব্রজমোহন কলেজের ছাত্রগণ রিজ্‌লী সার্কুলারের সকল সর্ত্ত মানিয়া চলিবে, আমরা আপনাদের নিকট এই

প্রতিশ্রুতি পাইতে চাহি, যদি উক্ত সার্কুলারের কোন সর্ত্ত লঙ্ঘিত হয় তাহা হইলে, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বৃত্তি পাইবার উপযোগী ছাত্রগণকে বৃত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে।”

কলেজের পক্ষ হইতে অধ্যক্ষ মহাশয় উক্তরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন না। ১৯০৭ অব্দে ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষায় একটি ছাত্র বৃত্তি পাইবার যোগ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু যথাকালে তাহার নাম বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের তালিকায় দেখা গেল না। অধ্যক্ষ মহাশয় শিক্ষাবিভাগের ডাইরেক্টর মহাশয়কে পত্র লিখিয়া এই উত্তর প্রাপ্ত হইলেন যে, এক বৎসর পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্ট জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, রিজ্‌লী সার্কুলার না মানিলে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বৃত্তি পাইবার অধিকারী হইলেও উহা পাইবে না।

পর বৎসর ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীযুত দেবপ্রসাদ ঘোষ প্রবেশিকা পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াও বৃত্তি হইতে বঞ্চিত হন। ইহার পর ইনি ব্রজমোহন বিদ্যালয় হইতে ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষায়ও সর্ব্বপ্রথম হইয়া বৃত্তিপ্রাপ্তির অধিকারে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ১৯১১ অব্দ পর্য্যন্ত প্রত্যেক বৎসরেই ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের কোন-না-কোন ছাত্র বৃত্তি পাইবার যোগ্য হইত কিন্তু বৃত্তি পাইত না। কেবল ইহা নহে, তখন এইরূপ এক গোপনীয় সরকারী আদেশও ছিল যে, যাহারা ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবে, তাহাদিগকে সরকারী কোন চাকুরী দেওয়া হইবে

না। কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয়ের সহিত ঐ সময়ে ঢাকায় এক রাজকর্ম্মচারীর সাক্ষাৎমতে এই বিষয়ের আলোচনাও হইয়াছিল। উক্ত কর্ম্মচারী অধ্যক্ষ মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন—এমন কোন কোন কলেজ আছে যেখান হইতে ছাত্রগণ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলে তাহাদিগকে সরকারী চাকুরী লাভের বিশেষ যোগ্য বলিয়া মনে করা হয়, কিন্তু আপনার কলেজ হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছাত্রদের রাজকার্য্যপ্রাপ্তির পক্ষে অযোগ্যতা। যাহা হউক, ১৯১১ অব্দে সরকারী সাহায্য গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যখন ব্রজমোহন কলেজের নবপর্য্যায়ের সূত্রপাত হয় তখন হইতে উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বৃত্তি ও রাজকার্য্য লাভের পক্ষে আর কোন বাধা রহিল না।

কিন্তু ইতোমধ্যে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের উপর দিয়া যে প্রতিকূল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়াছিল উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এ স্থলে প্রদত্ত হইল। ১৯০৬ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন বিধি প্রবর্ত্তিত হয়, তদনুসারে বঙ্গের স্কুল ও কলেজগুলির পরিদর্শন আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ জেমস্ সাহেব ও সিটিকলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র মহাশয়দ্বয় ব্রজমোহন বিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের সুখ্যাতি করিয়া রিপোর্ট্ প্রদান করেন। উক্ত রিপোর্টে পরিদর্শকদ্বয় বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতাগুলির বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ হইতে ঢাকা

বিভাগের স্কুলসমূহের সহকারী ইন্‌স্পেক্টর ডাক্তার পি, চাটার্জ্জি (পূর্ণানন্দ চট্টোপাধ্যায়) ব্রজমোহন স্কুল পরিদর্শন করিয়া বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ উপস্থাপন করেন। বিশ্ব-বিদ্যালয় স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ সমীপে অভিযোগগুলির কৈফিয়ত চাহিলেন। স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ দৃঢ়তার সহিত জানাইলেন যে, আরোপিত অভিযোগগুলির অধিকাংশই মিথ্যা। তখন বিশ্ব-বিদ্যালয় এক সমস্যায় পতিত হইয়া একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। পরলোকগত মাননীয় বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত তদন্ত কমিটির সভাপতি নিযুক্ত হইলেন।

এই তদন্ত কমিটির কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ১৯০৮ অব্দে ডাক্তার পি, কে, রায় কলেজ পরিদর্শন করিতে গমন করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাঁহার হস্তে তদন্তের জন্য সরকারী গোয়েন্দাবিভাগের প্রদত্ত এক প্রকাণ্ড রিপোর্ট্ প্রদান করিয়াছিলেন। ডাক্তার রায় মহাশয় উক্ত রিপোর্ট্ গোপনে অশ্বিনী-কুমারকে দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তখন অশ্বিনী-কুমারের নিকট কোন অভিযোগের কৈফিয়ত চাহেন নাই। ইহার কয়েকমাস পরে এই সম্পর্কে জেমস্ সাহেব ও অধ্যাপক কানিংহাম্ সাহেব কলেজপরিদর্শন করিতে গমন করেন। তাঁহারা বিদ্যালয়ের নিন্দা করা দূরে থাকুক, বিস্তর সুখ্যাতি করিয়া রিপোর্ট্ প্রদান করেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে

অভিযোগের কারণ কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উক্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ রিজ্‌লী সার্কুলার ভঙ্গ করিয়া রাজনৈতিক সভায় যোগদান করিত, আবশ্যক মতে স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিত, বিলাতী দ্রব্য বিক্রয়ে বাধা প্রদান করিয়া স্বদেশজাত দ্রব্যপ্রচলনে সহায়তা করিত। তাহাদের এই সকল কার্য্য রিজ্‌লী সাহেবের সার্কুলারের বিরোধী হইলেও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও মনুষ্যোচিত ছিল। সরকারী গোয়েন্দা বিভাগের কর্ম্মচারীরা ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ও কতিপয় শিক্ষকের স্বদেশ-সেবামূলক এই সকল কার্য্য অবৈধ বলিয়া মনে করিত। সমগ্র বরিশাল জিলায় স্বদেশী আন্দোলন যে অসামান্য সাফল্যলাভ করিয়াছিল ধর্ম্মপ্রাণ অশ্বিনীকুমারের একনিষ্ঠ স্বদেশসেবাই উহার মূলীভূত কারণ। তারপর ইহাও সত্য যে, এই মঙ্গলানুষ্ঠানে শ্রীযুত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রজনীকান্ত গুহ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (প্রজ্ঞানানন্দ), ভবরঞ্জন মজুমদার, শ্রীশচন্দ্র দাস, শরৎকুমার রায়, রামচন্দ্র দাশ গুপ্ত প্রভৃতি শিক্ষকগণ তাঁহার সহায় ছিলেন। এই সকল শিক্ষক ও ছাত্রকর্ম্মীদের আজ্ঞানুবর্ত্তিতা, কর্ম্মকুশলতা ও স্বদেশ-প্রীতিই আন্দোলনকে বলিষ্ঠ ও সফল করিয়া তুলিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট ছাত্রদের বৃত্তি ও সরকারী চাকুরী প্রাপ্তি বন্ধ করিয়া দিয়াও উক্ত বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। এই প্রতিকূলতার প্রবল ঝটিকার মধ্যেও অশ্বিনীকুমার শৈলশিখরের মত অটল রহিলেন। তখন

এই বিত্থালয়ের মঞ্জুরী (Affiliation) কাড়িয়া লইবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট উক্ত উদ্দেশ্যে বিশ্ববিত্থালয় এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাসচিবসমীপে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উপস্থাপন করিলেন। শুনা যায়, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের প্রস্তাব বড়লাট্ লর্ড মিণ্টো অনুমোদন করিতে পারেন নাই। এদিকে তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার ছিলেন মহাতেজস্বী পুরুষসিংহ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। তিনি অশ্বিনীকুমারকে সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করিতেন। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতা সম্বন্ধেও তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। এইজন্যই তিনি মাননীয় বিচারপতি স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নেতৃত্বাধীনে এক তদন্ত কমিটি গঠন করিয়া স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ (লর্ড্ সিংহ) প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগকে উহার সভ্য নিযুক্ত করিলেন। স্যর আশুতোষ বিনা বিচারে কিরূপে এক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিদ্যালয়কে দণ্ডিত করিবেন?

ব্রজমোহন বিদ্যালয় যখন এইরূপ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিপতিত তখন ১৯০৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসে এই বিদ্যালয়ের প্রাণতুল্য প্রতিষ্ঠাতা অশ্বিনীকুমার এবং তাঁহার পরম প্রিয় সহকর্ম্মী অধ্যাপক সতীশচন্দ্র নির্ব্বাসিত হইলেন। এই সময়ে এই সুবিখ্যাত বিদ্যালয়টি যেন কাণ্ডারীবিহীন তরণীর ন্যায় তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে আন্দোলিত হইতেছিল। যিনি হিমগিরির

মত অটলভাবে দাঁড়াইয়া প্রতিকূল ঝটিকার প্রচণ্ডতার প্রতিরোধ করিতেন সেই পুরুষসিংহ অশ্বিনীকুমার যখন কারারুদ্ধ হইলেন তখনই প্রকৃতপক্ষে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের দুর্দ্দিন আরম্ভ হইল। কলেজ টিকিবে কিনা ছাত্র ও অধ্যাপকদের মনে এই দুর্ভাবনার উদয় হইল। ছাত্রদের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল, তাহারা কেহ কেহ বলিতে লাগিল, কলেজ উঠিয়া যাইবে, এখন আমাদের অন্য কলেজে যাইয়া ভর্ত্তি হওয়া আবশ্যক।

এই সময় ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন নির্ভীক জ্ঞানবীর শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয়। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ছাত্রদিগকে জানাইয়া দিলেন—"তোমরা চঞ্চল হইও না, স্থিরচিত্তে পড়াশুনা কর, ব্রজমোহন বিদ্যালয়কে কিছুতেই উঠিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। বাঁকিপুরে রামমোহন সেমিনারি স্থাপন করিয়া আমি প্রথম যৌবনে মাসিক দশ টাকা বেতনে শিক্ষকতা করিতাম, দরকার হইলে এই ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে আবার দশ টাকা বেতনে কার্য্য করিব।" তেজস্বী অধ্যক্ষ মহাশয়ের মুখে এই আশ্বাসবাণী শুনিয়া ছাত্রদের চিত্ত চাঞ্চল্য তিরোহিত হইল। তাঁহার তেজস্বিতায় সেই দুর্দ্দিনে ব্রজমোহন বিদ্যালয় রক্ষা পাইল।

অতঃপর ১৯০৯ অব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী কলেজের অধ্যক্ষ মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদের নিকট হইতে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ ছিল সেই সমস্ত, গোয়েন্দাদের রিপোর্টের নকল এবং অপর সর্ব্বপ্রকার

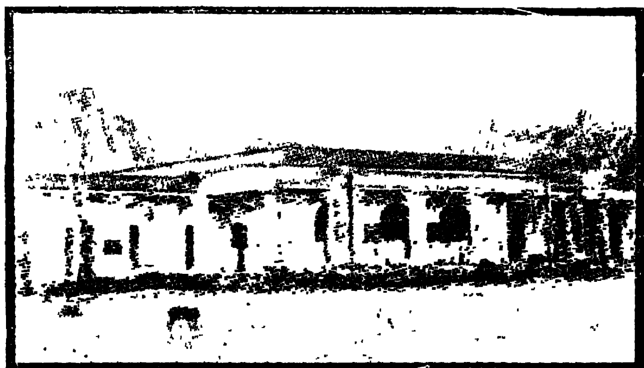
অভিযোগ প্রাপ্ত হইলেন। বিশ্ববিদ্যালয় উক্ত সমস্ত অভিযোগের কৈফিয়ৎ চাহিলেন। কিন্তু অভিযোগগুলির কৈফিয়ৎ প্রদান করা অসম্ভব বিবেচিত হইল, কেননা উপস্থাপিত অভিযোগগুলির অধিকাংশ নির্ব্বাসিত অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র এবং কারারুদ্ধ ভবরঞ্জন মজুমদার এই তিনজনের বিরুদ্ধে। বিশ্ববিদ্যালয় যদি এইরূপ আদেশ করেন যে, উক্ত তিনজনের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ বাদ দিয়া অবশিষ্ট অভিযোগগুলির কৈফিয়ৎ দেওয়া হউক, তাহা হইলে তিনি সেইরূপ কৈফিয়ৎ পাঠাইতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ অগত্যা উহাতেই সম্মত হইলেন। অধ্যক্ষ মহাশয় যথাকালে রিপোর্ট পাঠাইলেন, তৎসঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও ছিল যে, ছাত্রদিগকে রাজনীতি আলোচনা হইতে তিনি যথাসম্ভব দূরে রাখিতে চেষ্টা করিবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্ব-বঙ্গ গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগগুলি সপ্রমাণিত করিবার জন্য উক্ত গবর্ণমেণ্টকে তদন্ত কমিটির সম্মুখে প্রতিনিধি পাঠাইতে হইবে এবং নির্ব্বাসিত ও কারারুদ্ধ অশ্বিনীকুমার, সতীশচন্দ্র ও ভবরঞ্জন যাহাতে যথারীতি আত্মপক্ষ সমর্থনে সুযোগ প্রাপ্ত হ'ন সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট উক্ত দুইয়ের কোন প্রস্তাবেই সম্মত হন নাই বলিয়া তদন্ত কমিটির কোন অধিবেশনই হইতে পারে নাই।

সুদীর্ঘ চৌদ্দমাসকাল নির্ব্বাসনে থাকিয়া অশ্বিনীকুমার যখন

বরিশালে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার বড় সাধের বিদ্যালয়টির জীবন-মরণ সংগ্রাম চলিতেছিল। ব্রজমোহন বিদ্যালয় হইতে বি, এ পাশ করিলে সরকারী চাকুরী পাইবার সম্ভাবনা নাই, বৃত্তি পাইবার যোগ্য হইলেও বৃত্তি পাওয়া যাইবে না ইত্যাদি কারণে ছাত্রসংখ্যা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে তিন চারিটীর বেশী ছাত্র হইত না। প্রথম ও দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ছাত্রের অভাব ছিল না। কিন্তু দরিদ্রতাহেতু বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন দাবী পূরণে অসমর্থ হইয়া ইণ্টারমিডিয়েট্ ক্লাসে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনা তুলিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন দাবী অনুসারে কলেজ চালাইতে হইলে বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। এই সময়ে কলেজ তুলিয়া দেওয়া, বি, এ ক্লাস তুলিয়া দিয়া কলেজটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কলেজে পরিণত করা ইত্যাদি নানা-প্রকার প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছিল।

১৯১০ অব্দের শেষ ভাগে এবং ১৯১১ অব্দের প্রারম্ভে পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্ট বরিশাল অক্সফোর্ড্ মিশনের ফাদার ষ্ট্রং সাহেবের মধ্যবর্ত্তিতায় অশ্বিনীকুমারের সহিত কলেজে সরকারী সাহায্য প্রদানের কথা চালাইতেছিলেন। অতঃপর পূর্ব্ববঙ্গ গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন চিফ্ সেক্রেটারী মিঃ এইচ্. লিমেসুরিয়ার্ অশ্বিনীকুমারের সহিত এই প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য বরিশালে আগমন করেন। গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এইরূপ প্রস্তাব করা হইল,ব্রজমোহন কলেজে মাসিক এক হাজার টাকা



ব্রজমোহন স্কুল



ব্রজমোহন কলেজ

১৩০ পৃঃ

বৃত্তি দেওয়া হইবে,কলেজের গৃহনির্ম্মাণের ব্যয় গবর্ণমেণ্ট দিবেন কিন্তু কলেজের অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং স্কুলের শিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীশচন্দ্র দাস এবং রামচন্দ্র দাশগুপ্ত এই পাঁচজনকে কর্ম্মচ্যুত করিতে হইবে।

এইরূপ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া অশ্বিনীকুমারের পক্ষে কতদূর ক্লেশকর তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি ইহার বিরুদ্ধে বহু সংগ্রাম করিলেন। অবশেষে তিনি গবর্ণমেণ্টকে এই সর্ত্তে সম্মত করাইলেন যে, বান্ধবসমিতি,দরিদ্রবান্ধবসমিতি প্রভৃতি বিদ্যালয়ের বিশিষ্টতা রক্ষা করা হইবে ; রিজ্‌লী সার্কুলার মানিয়া চলিলে অধ্যক্ষ রজনী বাবু ও অধ্যাপক সতীশ বাবু অন্যত্র কার্য্য করিতে পারিবেন, গবর্ণমেণ্ট উহাতে বাধা দিবেন না, এবং ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কলেজ কমিটির সভ্য হইতে পারিবেন না। এই সকল কথাবার্ত্তা স্থির হইবার পরে ১৯১১ অব্দের জুন মাস হইতে ব্রজমোহন কলেজ সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে পরিণত হইয়াছে। স্কুল পূর্ব্ববৎ স্বত্বাধিকারীদিগের সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে।

বর্ত্তমানে কাশীপুর রোডের পার্শ্বে কলেজের নূতন বাটী নির্ম্মিত হইয়াছে। ব্রজমোহন কলেজ এখন বঙ্গের অন্যতম বৃহৎ কলেজে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এই কলেজ যিনি স্থাপন করিয়াছিলেন, মানুষ গড়িয়া তোলাই ছিল তাঁহার অন্তরের আকাঙ্ক্ষা। মনে হয়, বর্ত্তমান কলেজদ্বারা প্রতিষ্ঠাতার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতেছে না।

স্বাধীনতার যেরূপ পরিবেষ্টনের মধ্যে তিনি দেশের যুবক-দিগকে সুশিক্ষা প্রদান করিতে চাহিতেন, সরকারী সাহায্য-প্রাপ্ত কলেজে সেই উদ্দেশ্য সম্যক্ সংসিদ্ধ হইতে পারে ইহা তিনি মনে করিতে পারিতেন না। দারিদ্র্যের পীড়নে, ত্যাগশীল কর্ম্মীর অভাবে এবং হয়তো লোকমতের তাড়নায় কলেজ বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে।

অশ্বিনীকুমারের জীবদ্দশায় ব্রজমোহন স্কুল জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। যখন তিনি ভগ্নদেহ, একরূপ বলিতে গেলে জীবনমৃত্যুর সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান, সেই সময়ে তাঁহার বিত্থালয়টিকে জাতীয় বিদ্যালয় করিবার পক্ষে মত দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বরিশালবাসী জন-সাধারণের অভিপ্রায়ে স্বত্বাধিকারিগণ ও পূজনীয় জগদীশবাবু ঐ বিদ্যালয়টিকে আবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়াধীন করিয়াছেন।

বরিশালের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল রায় নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত বাহাদুর একবার দেওঘরে রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি অশ্বিনীকুমারের কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বলিয়াছিলেন—"কেমন হে, অশ্বিনী বরিশালের ছাত্রমহলে কি আগুন জ্বালায় নাই? সে যে একটা আগুনের হল্‌কা।" শিক্ষক অশ্বিনীকুমার যে এক সময়ে বরিশালে শত শত বালক ও যুবকের হৃদয়ে "সত্য, প্রেম ও পবিত্রতার" আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন সে বিষয়ে কাহারও মনে সন্দেহ নাই। ভক্ত কেশবের মত

অশ্বিনীকুমার অগ্নিমন্ত্রের উপাসক ছিলেন। এই ঋত্বিক্ বরিশালে যে হোমাগ্নি জ্বালিয়াছিলেন তাহা কি একেবারে নিবিয়া যাইতে পারে ?

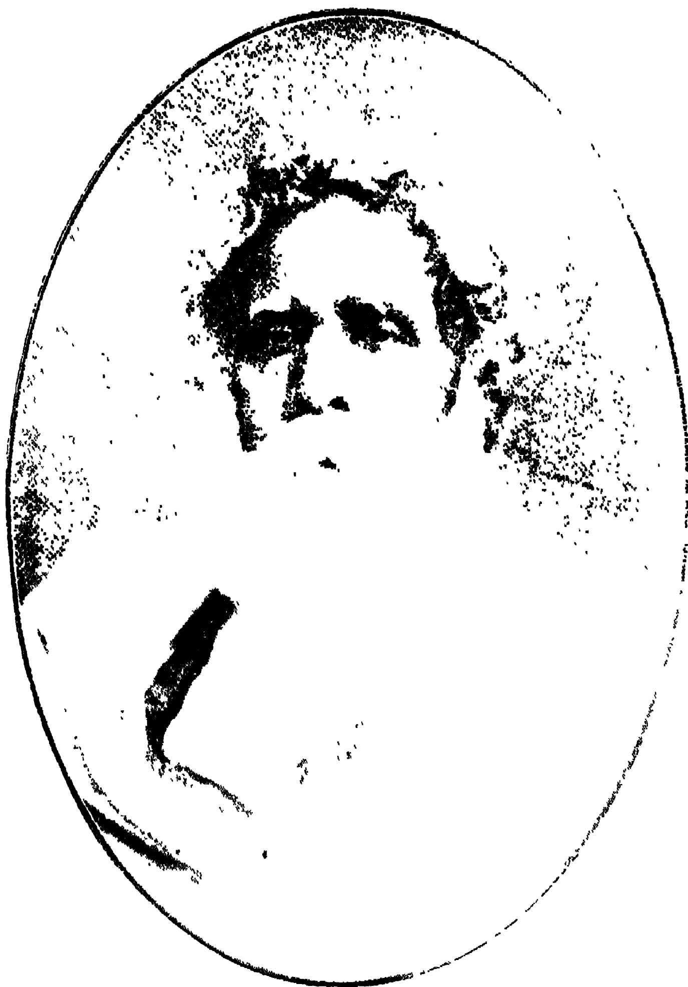
চতুর্থ অধ্যায়

দেশ-সেবক অশ্বিনীকুমার

বরিশাল—কর্ম্মক্ষেত্র

যে সকল দেশ-হিতৈষী মনস্বী ব্যক্তি রাজনীতিক্ষেত্রে কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদের অনেকের সহিত অশ্বিনীকুমারের দেশ-সেবার এই একটি বিশিষ্ট প্রভেদ ছিল যে, প্রেমিক ও ধর্ম্মনিষ্ঠ অশ্বিনীকুমার যাহাদের নিকট দেশের কথা বলিতেন তাহাদের সহিত তাঁহার হৃদয়গত একটা যোগ ছিল। তিনি জনসাধারণের সহিত চিন্তায়, ভাবে এবং কার্য্যে এক হইয়া যাইতে পারিতেন। লোকে অশ্বিনীকুমারকে 'আপন জন' বলিয়া জানিত। ধনী ও দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ, ব্রাহ্মণ ও নমঃশূদ্র, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই অবাধে তাঁহার কাছে আসিয়া সকল প্রার্থনা জানাইত। তিনি সকলের সকল প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারিতেন, এমন সাধ্য তাঁহার ছিল না, থাকাও অসম্ভব। যাহা পারিতেন তাহা করিতেন। কিন্তু তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ মিষ্ট বাক্য, সহানুভূতি ও মধুর ব্যবহারে সকলেই প্রীত হইত।

অশ্বিনীকুমার বরিশালকে ভালবাসিতেন। তিনি তাঁহার সমস্ত শক্তি দিয়া বরিশালের সেবা করিয়া বরিশালকে নিজের



মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু

১৩৪ পৃঃ

মনের মতন করিয়া গড়িবার এমন চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়াই বরিশালবাসী তাঁহার প্রেমে বাঁধা পড়িয়াছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের শুভাকাঙ্ক্ষা লইয়া অশ্বিনীকুমার বরিশাল সহরে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে রোগশয্যায় একদিন বলিয়াছিলেন—"আমার এই দেহ আর উঠিবে না, বাঁচিলেও এই জীর্ণদেহ দ্বারা কোন কাজ হইবে না। তাই ঠাকুরকে বলি, এটাকে শীগ্‌গির লইয়া গিয়া একটা নূতন দেহ দাও। আবার নূতন শক্তি, নূতন তেজ লইয়া কাজে লাগি। বরিশালেই আবার আসিব।" এমনই প্রেম ছিল তাঁহার স্বদেশের ও বরিশালের উপর।

মৃত্যুর প্রায় দেড় বৎসর পূর্ব্বে বরিশালের সরকারী উকিল মহাশয়ের নিকট তিনি তাঁহার বরিশালপ্রীতি নিম্নলিখিত-রূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"নির্ব্বাণ চাই না, মোক্ষ কামনা করি না, আবার এই পৃথিবীতে আসিতে চাই, আবার খাটিতে চাই।" "কোন্ দেশে ?" "এই ভারতবর্ষে।" কোন্ প্রদেশে ?" "সোণার বাংলায়।" "কোন্ জিলায় ?" "তাও কি বলিতে হইবে ? বরিশালে।" "কিন্তু একটা কথা বলিতে পারিতেছি না, কাহার ঘরে জন্মিব। বাপ হইবার উপযুক্ত লোক ত আর দেখিতে পাইতেছি না। একজন ছিল আপনি তাহাকে ফাঁসি দিয়াছেন।" "কে সে ?" "আব্‌দুল।"

আব্‌দুল ভীষণ দস্যু, নির্ম্মম নরহন্তা কিন্তু চিত্ত তার এমন ভয়শূন্য ছিল যে, সে ফাঁসির আগের দিনও নিরুদ্বেগে ঘুমাইয়াছিল। ফাঁসির পূর্ব্বদিন অশ্বিনীকুমার কারাগারে আব্‌দুলকে দেখিতে গিয়াছিলেন। তিনি যখন আব্‌দুলের কুঠরীর সম্মুখে গিয়াছিলেন, তখন আব্‌দুল নিদ্রিত ছিল। তিনি তাহাকে ডাকিয়া জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কিহে আব্‌দুল, তুমি ঘুমোচ্ছ।" আব্‌দুল উত্তর করিল—"হাঁ, বাবু, হয়েছি একদিন, মরব একদিন, তা' নিয়ে ভেবে কি হবে?" অশ্বিনী-কুমার এমন এক তেজস্বী নির্ভীক পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া আবার তাঁহার নূতন জন্মের নবশক্তি দ্বারা বরিশালের সেবা করিতে চাহিয়াছিলেন। বরিশালের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ছিল এমনই গভীর, এমনই আন্তরিক।

যে প্রীতিদ্বারা অশ্বিনীকুমার বরিশাল জিলার সেবা করিয়াছিলেন এবং জন্মজন্মান্তরেও বরিশালের সেবা করিবার আন্তরিক কামনা জানাইয়া গিয়াছেন তাঁহার সেই প্রীতি বরিশাল জিলাবাসী আপামর সাধারণ ব্যক্তিও প্রাপ্ত হইত। বরিশালের প্রসিদ্ধ উকিল রায় নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত বাহাদুর লিখিয়াছেন—আমার সাক্ষাতে একদিন নমঃশূদ্রজাতীয় কোন ব্যক্তি কয়েকজন ভদ্রলোককে বলিয়াছিল—"বরিশালটা আমার বেশ লাগে, বিশেষতঃ ঐ নদীর পাড়টা আর বাবুকে।" একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—'বাবু কে?' সে বলিল, "বাবু আর কে, অশ্বিনীবাবু"। প্রশ্নকর্ত্তা বলিয়া

উঠিলেন—"কেন রে, অশ্বিনীবাবু ছাড়া কি বরিশালে আর লোক নাই ?" সেই লোকটি বলিল—"আছেত কিন্তু—" সে আর তাহার বাক্য শেষ করিল না। এই নমঃশূদ্র সাধারণ লোকটিও যে অশ্বিনীকুমারের উদার হৃদয়ের পবিত্র প্রীতির অমোঘ পরিচয় পাইয়াছিল তাহার উক্তি হইতে উহা বেশ বুঝা যাইতে পারে।

সমগ্র বরিশাল জিলার সহিত অশ্বিনীকুমারের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল। তিনি অশিক্ষিত নমঃশূদ্রদের অঞ্চলে গমন করিয়া তাহাদের মধ্যে তাহাদের বোধগম্য ভাষায় বক্তৃতা করিতেন। নমঃশূদ্রেরা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া নামগান করিত, তিনি তাহাদের সহিত নাচিতেন, গাহিতেন। তাঁহার অমায়িকতাপূর্ণ ব্যবহারে সকলেই তাঁহার 'আপন জন' হইত। অশ্বিনীকুমার জিলায় সকলেরই পরিচিত। তাঁহাকে চিনেনা এ কথা বলিতে পল্লীবাসী সাধারণ কৃষকও লজ্জা বোধ করিত। সোহাগদল গ্রামে একবার একটি কৌতুককর ঘটনা ঘটিয়াছিল। সেখানে একজন শতবর্ষাধিক বৃদ্ধ আছেন শুনিয়া অশ্বিনীকুমার তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। খালের ধারে নৌকা রাখিয়া অশ্বিনীকুমার তীরে নামিয়া সেই বৃদ্ধের বাড়ীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। নিকটবর্ত্তী এক মুসলমান কৃষককে সে বৃদ্ধের বাড়ী কতদূর জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃষক উহার উত্তর করিয়া কি প্রয়োজনে সেখানে যাইবেন তাহা জানিতে চাহিল। অশ্বিনীকুমার বলিলেন—"তার বয়স একশতের অধিক, এমন বৃদ্ধ সাধারণতঃ দেখা যায় না, এইজন্য তাকে

দেখ্‌তে আমি বরিশাল থেকে এসেছি।" কৃষক ইহাতে বিস্মিত হইয়া তাহার নিজভাষায় বলিল—"বাবু আপনি তো মানুষগা বড় হাউস-নাগি।" অশ্বিনীকুমার বলিলেন—"হয় মিঞা, আমি মানুষগা একটু হাউস-নাগি, আচ্ছা, তুমি বরিশালের কাকে চেন ?" সে, অনেক ব্যক্তির নাম করিয়া বলিল, আমি অমুক অমুককে, অশ্বিনী বাবুকে চিনি। অশ্বিনীকুমার প্রশ্ন করিলেন— "হাঁ, তুমি অশ্বিনী বাবুকে চেন ?" লোকটি একটু উষ্মা প্রকাশ করিয়া নিজের ভাষায় বলিল,—"চিনিনা, আপনে বুঝি বলেন, আপনেই সিনি (তিনি)।" তারপরে অশ্বিনীকুমার গ্রামে প্রবেশ করিলেন, অত্যল্পকাল মধ্যে তাঁহার আগমন বার্ত্তা চারিদিকে প্রকাশিত হইল, তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভিড় হইল, সেই মুসলমান কৃষক তখন দেখিল যাহার সহিত সে অশ্বিনীকুমারকে চিনে কিনা লইয়া তর্ক করিয়াছিল তিনিই অশ্বিনীকুমার। সে তখন মিনতি করিয়া ক্ষমা চাহিল। অশ্বিনীকুমার সস্নেহে পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

অশ্বিনীকুমার তাঁহার উদারতা ও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার দ্বারা কি প্রকারে বরিশাল জিলার ছোট বড় সকলের মনের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন মনস্বী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় নিম্ন দৃষ্টান্তের দ্বারা উহা ব্যক্ত করিয়াছেন—

স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী কোন ব্যক্তি নমঃশূদ্রদিগকে ইহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য একজন নিষ্ঠাবান্ স্বদেশ-

সেবক নমঃশূদ্রকে বলিয়াছিলেন—"বাবুরা ত বন্দেমাতরং বলিয়া ভাই ভাই একঠাঁই করিয়াছেন, কিন্তু তোমাদিগকে নমঃশূদ্র বলিয়া ঘৃণা করেন কেন? ভদ্রসমাজে তোমাদের জল চলে না, হুকা চলে না, তবু তোমরা তাদের ভাই, কথাটীত মন্দ নয়!" এই কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তির মনে একটা খট্‌কা বাধিয়া যায়। সেই সময়ে অশ্বিনীবাবু ঐ অঞ্চলে উপস্থিত ছিলেন। আপনার সন্দেহ মিটাইবার জন্য ঐ নমঃশূদ্র অশ্বিনীকুমারের নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমারের সহিত তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। অশ্বিনীকুমার আপনার নৌকায় নিজের শয্যার উপরে বসিয়াছিলেন। শয্যার নিকটেই এক ফরাশ পাতা ছিল। নমঃশূদ্রটী অশ্বিনীকুমারের প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে যাইয়া তাঁহাকে নমস্কার করিলেন, অশ্বিনীকুমারও অমনি দাঁড়াইয়া অভ্যাগতকে প্রতি নমস্কার করিলেন এবং সেই প্রকোষ্ঠের ভিতরে তাহাকে ডাকিয়া পরিচয় লইয়া তাহার সঙ্গে যাইয়া সেই ফরাশে বসিলেন। তারপর অশ্বিনীকুমার তাহার প্রয়োজন জানিতে চাহিলে নমঃশূদ্রটী বলিলেন —'বাবু, আমি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা জিজ্ঞাসা করা এখন অনাবশ্যক, আমার প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছি। আপনি যখন আমাকে লইয়া এক বিছানায় বসিয়া কথা বলিতেছেন তখনই বুঝিয়াছি 'বন্দেমাতরং' সত্য এবং আমরা আপনাদের ভাই।"

অশ্বিনীকুমার এমনই সহজ অন্তরঙ্গতার সহিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মেলামেশা করিতে পারিতেন। মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত অপর কোন জননায়ক, ভদ্রইতর নির্ব্বিশেষে এই প্রকার সকলের সহিত মেলামেশা করিতে পারিয়াছেন এমন কথা শুনা যায় না। এই অনন্যসুলভ লোক-প্রীতি, অসামান্য সত্যানুরাগ এবং চরিত্রবলই অশ্বিনীকুমারকে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র করিয়াছিল। তাঁহার প্রিয়শিষ্য উকিল শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন মহাশয় এক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন—১৮৮০ অব্দ হইতে ১৯১০ অব্দ পর্য্যন্ত ত্রিশ বছরের বরিশালের ইতিহাস যদি কোন চিন্তাশীল লেখক ভাল করিয়া লিখিতে পারেন তাহা হইলে দেখিব যে, অশ্বিনী-কুমারের প্রেম ও আনন্দ, সংযম ও তিতিক্ষা, আশা ও উদ্যম ন্যূনাধিক পরিমাণে বাকরগঞ্জের সকল গৃহেই প্রবেশ করিয়াছিল। বাগ্মিতায় তিনি সিদ্ধ ছিলেন, চিত্তরঞ্জিনী শক্তি তাঁহার অদ্ভুত ছিল, তথাপি অতি ক্ষুদ্র বরিশাল সহরটি ছাড়িয়া কলিকাতার টাউন হলে কিংবা অপর কোন প্রকাশ্য স্থানে একটিও বক্তৃতা করিতে আমরা জীবনব্যাপী চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে রাজি করিতে পারি নাই। এখানে আসিয়া যশের দোকান খুলিলে দু'পয়সা রোজগার হইত, তাহাও করিলেন না। কৃপণের ন্যায় তাঁহার সমস্ত পুঁজিপাটা তিনি বরিশালের মাটিতেই পুঁতিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় "চরিত

কথায়” লিখিয়াছেন—“অশ্বিনীকুমার কখনও সাধারণ ইংরাজীনবিশদিগের মত জীবন কাটান নাই। তিনি লেখাপড়া শিখিয়া কর্ম্মের খাতিরে, যশের লোভে বা সখের দায়ে আপনার দেশ ছাড়িয়া আসেন নাই। বরিশালেই তিনি তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র রচনা করিতে আরম্ভ করেন। আমাদের দশ জনের মতন তিনি যদি কলিকাতায় আসিয়া বাস করিতেন, তাহা হইলে বাঙ্গলার আধুনিক কর্ম্মজীবনের ইতিহাসে তিনি আজ যে স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছেন সে স্থান কিছুতেই পাইতেন না, ইহা স্থির নিশ্চয়।”

কর্ম্মক্ষেত্রের অবস্থা

অশ্বিনীকুমার যখন তাঁহার বুকভরা আশা ও আকাঙ্ক্ষা লইয়া বরিশালবাসীর সেবা করিবার জন্য বরিশাল সহরে উপস্থিত হইলেন তখন বরিশালের কি অবস্থা ছিল? ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় তৎপ্রণীত পুস্তিকায় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—“সেখানে ধনের স্থান ছিল বিদ্যার উপরে, ধন ব্যয়িত হইত ধান্যেশ্বরীর সেবায়, বিদ্বানেরা মাথা বিকাইতেন বিদ্যাধরীদের চরণতলে।” তখন ভদ্রইতর কেহই মদ্যপান করিয়া পতিতানারীগৃহে নিশাযাপন দূষণীয় মনে করিতেন না। বরিশালের রাজপথ দিয়া অসঙ্কোচে পতিতা নারীরা দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিত। সমগ্র সহরে আগন্তুক ভদ্রলোকদের থাকিবার মত একটি হোটেল পর্য্যন্ত ছিল না। যাহারা কার্য্যোপলক্ষে

বরিশালে আসিতেন, তাহারা বেশ্যালয়ে ঘর ভাড়া নিয়া থাকিতেন; ইহার ফলে অনেক সচ্চরিত্র ব্যক্তি প্রলুব্ধ হইয়া চরিত্রহীন হইত।

বরিশালের এই শোচনীয় নৈতিক দুর্গতিদর্শনে অশ্বিনীকুমার ব্যথিত হইলেন। তিনি তাঁহার দেশবাসীদিগকে এই দুর্নীতির পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিবার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করিতে লাগিলেন, তাঁহার চেষ্টায় অল্পদিন মধ্যেই বরিশালের নৈতিক আব্‌হাওয়া পরিবর্ত্তিত হইল! পতিতা নারীদের দলবদ্ধ অবাধ ভ্রমণ বন্ধ হইল। তাহারা অশ্বিনীকুমারকে দূরে লক্ষ্য করিবামাত্র কুলবধূদের মত ঘোম্‌টা টানিয়া দূরে চলিয়া যাইত। অশ্বিনীকুমার রঙ্গ করিয়া বলিতেন—"আমি এদের ভাসুর ঠাকুর।" নগরে মদ্যপানের প্রচলন হ্রাস হইল। অশ্বিনীকুমারের আন্দোলন আরম্ভের পরে যুবাবৃদ্ধ কেহই প্রকাশ্যে মাত্‌লামী করিয়া বাহাদুরী বোধ করিত না। মদ্যপান যে নিন্দনীয় এই বোধ ভদ্রইতর সকলেরই বুদ্ধিগম্য হইল।

বরিশালে সর্ব্বজনশ্রদ্ধেয় কোন কোন ব্যক্তি অশ্বিনীকুমারের পুণ্যস্পর্শে আসিয়া মদ্যপানের অভ্যাস ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এমন একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি অশ্বিনীকুমারের কীর্ত্তন ও শাস্ত্রপাঠ সভায় কীর্ত্তনের আনন্দে মাতিয়া বলিয়াছিলেন—"অশ্বিনীরে, তুই আমায় এ কি কর্‌লি, বোতলের পর বোতল মদ কোন দিন আমায় টলাতে পারেনি, আর তোর কথা আজ আমায়

এমনভাবে মাতাইতেছে ?" অশ্বিনীকুমারের প্রচেষ্টায় শত শত ব্যক্তি মদ্যপানের কুঅভ্যাস ত্যাগ করিয়াছিল।

১৮৯৩ অব্দে এংগ্লোইণ্ডিয়ান মাদকতানিবারণী সমিতির মুখপত্র 'আবকারী' কাগজে পরলোকগত কেইন্ সাহেব (Mr. W. S. Caine) অশ্বিনীকুমারের ছবি মুদ্রিত করিয়া লিখিয়াছিলেন—"এই যে ভারতীয় ভদ্রলোকের চিত্র এখানে মুদ্রিত হইয়াছে, ইনি আমাদের মদ্যপাননিবারণ আন্দোলনে প্রথম হইতেই যোগদান করিয়াছেন এবং এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সকল সংখ্যায় ইহাঁর প্রেরিত তথ্যপূর্ণ সংবাদ ও পত্রাদি মুদ্রিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় বরিশাল সহরে আইনের ব্যবসায় করেন এবং বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র জনসাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র।" অশ্বিনীকুমারই বরিশাল জিলায় মদ্যপান নিবারণের আন্দোলন করিয়াছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অশ্বিনীকুমারের প্রচেষ্টায় বরিশাল জিলার ৫২টা বিলাতী মদের দোকানের ৫০টাই উঠিয়া গিয়াছিল।

অশ্বিনীকুমার যখন বরিশালে আসিয়া আইনের ব্যবসায় আরম্ভ করেন তখন বরিশালের উকিলদের মধ্যে এই একটি কুপ্রথা ছিল যে, উকিলেরা যখন কাছারীতে আসিতেন তখন ভৃত্যেরা তাহাদের মাথায় ছত্র ধারণ করিত। এই অনাবশ্যক নবাবীয়ানা অশ্বিনীকুমারের চক্ষে একান্ত অশোভন মনে হইত। তিনি বাক্যতঃ ইহার প্রতিবাদ করেন নাই, কিন্তু কার্য্যতঃ স্বয়ং

নিজের ছাতা নিজে বহন করিয়া কাছারীতে আসিতেন। প্রবীণেরা বলাবলি করিতেন—"এ বালক করে কি ?"

বরিশালের উকিলেরা তখনকার লাইব্রেরীতে পরস্পরের সহিত আলাপের সময়ে যথেচ্ছ অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করিতেন। একদিন এক প্রবীণ উকিল ঐরূপ আলোচনা কালে এক অশ্লীল শব্দ উচ্চারণ করিবার উপক্রম করিয়া থামিয়া গেলেন। বলিয়া উঠিলেন, "ঐ যে বাবাজী (অশ্বিনীকুমার) আসছেন, এখন আর যা' তা' বলা চলবে না।" অশ্বিনীকুমারের চরিত্রপ্রভাবে অল্পদিনমধ্যে উকিলদের অশ্লীল আলোচনা একরূপ বন্ধ হইয়াছিল।

অশ্বিনীকুমার যখন বরিশালে গমন করেন তখন বরিশালে রাজনীতির কোন আলোচনা ছিল না। তখনকার উকিল সমাজমধ্যে স্বর্গীয় প্যারিলাল রায় মহাশয়ই সর্ব্বাপেক্ষা তেজস্বী ও তীক্ষ্ণধী ছিলেন। বরিশালে তিনিই সর্ব্বপ্রথম বি, এল উপাধিধারী উকিল। তখনকার উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের চিত্তে যেমন স্বাধীনতাসম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা ছিল ইহাঁর মনেও তাহা প্রচুর পরিমাণে ছিল। অশ্বিনীকুমারের বরিশাল সহরে গমনের পূর্ব্বে লোকসাধারণের পক্ষ হইতে ইনিই কখন কখন সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন। কিন্তু দেশের কথা ভাবিবার, দেশের কাজ করিবার জন্য কোন প্রকার প্রতিষ্ঠান তখন ছিল না।



বরিশাল জনসাধারণসভা

স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিতেন, 'অশ্বিনীকুমার একটা আগুনের হল্‌কা।' বস্তুতঃ অশ্বিনীকুমারের চরিত্রে আগুনের মাত্রা প্রচুর পরিমাণে ছিল। তিনি যে স্থানে থাকিতেন, সে স্থান তাঁহার নিজের তেজে গরম করিয়া তুলিতে পারিতেন। "যেখানে থাক্‌বি সেখান গরম করে তুল্‌বি" তিনি তাঁহার পিতার এই উপদেশটি শত শত যুবককে বলিতেন, তাঁহার শিষ্যেরা ঐ উপদেশ কে কতদূর পালন করিতে পারিয়াছেন তাহা জানিনা। কিন্তু উপদেষ্টা যে স্বয়ং বরিশাল সহর গরম করিয়া তুলিয়াছিলেন ইহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

অশ্বিনীকুমারের শক্তির পরিচয় পাইতে প্যারিলাল রায় মহাশয়ের অনেক দিন লাগিল না। অশ্বিনীকুমারকে পাইয়া তাঁহার দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। এই সময়ে তিনি বাবু রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী, হরনাথ ঘোষ, মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, উগ্রকণ্ঠ রায়, মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, অভয়ানন্দ দাস, ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত, হরকান্ত সেন, বিহারীলাল রায় প্রভৃতি স্বাধীন-প্রকৃতি উৎসাহী যুবকদিগকে লইয়া "বরিশাল জনসাধারণ সভা" স্থাপন করেন। এই সভাই বরিশালের সর্ব্বপ্রথম দেশহিতকর প্রতিষ্ঠান। এই সভাদ্বারাই সেই যুগে স্বাধীনতার হাওয়া মৃদুভাবে প্রবাহিত হইতেছিল। স্বর্গীয় প্যারিলাল রায় মহাশয় ইহার সভাপতি এবং স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায় মহাশয় ইহার

সম্পাদক বৃত হন। রাখাল বাবুর পরে অশ্বিনীকুমার এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের পদ লাভ করেন। এই সভার প্রচেষ্টায়ই বরিশাল সহরে জনমতের সৃষ্টি হয়। গভর্ণমেণ্টও এই রাষ্ট্রনৈতিক সভাটিকে মানিতেন। সেকালে বঙ্গের ছোটলাট্‌গণ পরিদর্শন-সময়ে এই সভার অভিনন্দন পত্র প্রাপ্ত হইতেন। অশ্বিনীকুমার এই রাষ্ট্রীয় সভার পক্ষ হইতে দেশের বাণী প্রচারের জন্য সমগ্র জিলার গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার প্রচেষ্টায় স্থানে স্থানে শাখাসমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল সমিতি কিঞ্চিৎ চাঁদা এবং সমিতির কার্য্যবিবরণী বরিশাল জনসাধারণ সভায় পাঠাইতেন। এই শাখাসমিতিগুলিদ্বারা এক সময়ে গ্রামের (১) জনসংখ্যা (২) পাঠশালা (৩) ছাত্রসংখ্যা (৪) জলাশয়ের অবস্থা (৫) রাস্তাঘাটের অবস্থা (৬) স্বাস্থ্য প্রভৃতি নানাবিষয়ক তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা হইত।

১৮৮৬ অব্দ হইতে "বরিশাল জনসাধারণ সভা" জাতীয় মহাসমিতির প্রদর্শিত পথে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করে। বরিশাল হইতে প্রত্যেক বৎসর জাতীয় মহাসভায় একজন প্রতিনিধি প্রেরিত হইতেন। এক বিরাট্ জনসভায় এই প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতেন। এই প্রতিনিধির পাথেয় নগর-বাসীদের নিকট হইতে এক এক টাকা চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করা হইত। এই সুযোগে লোকসাধারণকে জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দেওয়া হইত। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে যোগদান করিয়া প্রতিনিধি যখন ফিরিয়া আসিতেন তখন

ষ্টীমারঘাটে তাঁহাকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিয়া অভিনন্দিত করা হইত। অতঃপর এক জনসভায় প্রত্যাগত প্রতিনিধি জনমণ্ডলীকে জাতীয় মহাসমিতির কার্য্যবিবরণী শুনাইতেন। অশ্বিনীকুমার বহুবার বরিশালবাসী জনমণ্ডলীর প্রতিনিধি হইয়া জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন।

স্বর্গীয় প্যারিলাল রায় মহাশয় মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত (১৯০৫ অব্দ) এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। প্যারিলালের ধী-শক্তির প্রতি অশ্বিনীকুমারের এমন শ্রদ্ধা ছিল যে, তাঁহার অভিমত না লইয়া তিনি কদাচ কোন দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। যাঁহারা শ্রদ্ধাভাজন, অশ্বিনীকুমার সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে প্রচুর শ্রদ্ধা অর্পণ করিতে পারিতেন বলিয়াই তিনি যাঁহাদের শ্রদ্ধার পাত্র, তাহারা তাঁহাকে নরদেবতাজ্ঞানে ভক্তিঅর্ঘ্য প্রদান করিত।

ভারতগীতি

অশ্বিনীকুমার যখন বরিশাল সহরে কিংবা মফঃস্বলে গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা করিতেন, তখন বক্তৃতার পূর্ব্বে একটি জাতীয় সঙ্গীত গান করা হইত। কিন্তু তখন বঙ্গদেশে জাতীয় সঙ্গীতের একান্ত অভাব ছিল। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কর্ত্তৃক সঙ্কলিত একখানি মাত্র পুস্তিকায় অল্প কয়েকটি জাতীয় সঙ্গীত ছিল। এই অভাব দূর করিবার জন্য অশ্বিনীকুমার সময়োপযোগী কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়া ‘ভারতগীতি’ নামক একখানি পুস্তিকা প্রকাশিত

করেন। বরিশালের 'সত্যপ্রকাশ' যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া পুস্তিকাখানি স্বর্গীয় কালীমোহন চক্রবর্ত্তি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকের উপরে অশ্বিনীকুমারের নাম ছিল না। লিখিত ছিল, "ভারতভৃত্যকর্ত্তৃক" রচিত।

অশ্বিনীকুমার সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন না, এইজন্য তাঁহার রচিত গানগুলিতে সুর দিয়া দিতেন ভাতশালা গ্রামবাসী সুগায়ক নন্দকুমার ঘোষ ও মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়দ্বয়। সভাস্থলে ঐ গানগুলি সুযোগ ও সুবিধামতে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী ৺শশধর চক্রবর্ত্তী এবং ৺কালীমোহন চক্রবর্ত্তী গাহিতেন।

"ভারতগীতি" পুস্তিকার প্রারম্ভ সঙ্গীতটি এই——

জয় জয় আর্য্যমাতা জয় ভারত-জননী।
জয় জগতবন্দিনী মা জয় ভুবনমোহিনী॥
শুন গো মা দেশে দেশে,
তব গুণ সবে ঘোষে,
প্রণমি চরণে মাগো তুমি শ্রীবিদ্যারূপিণী।
আজি জর্ম্মণি বিলাতে,
ফরাসী আমেরিকাতে,
কত লোকে গায় মাগো তব গুণকাহিনী।
আর্য্য বীর্য্য কার্য্য যত,
দেখি সবে চমকিত,
সমস্বরে বলে তুমি রত্নপ্রসবিণী।

"ভারতগীতি" পুস্তিকাখানি ৪৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। এই

পুস্তিকার প্রথমাংশে ৩৮টি জাতীয় সঙ্গীত এবং দ্বিতীয় ভাগে ১৯টি ধর্ম্মসঙ্গীত আছে।

সংবাদপত্র

প্রায় যাট বৎসর পূর্ব্বে বরিশাল জিলায় সর্ব্বপ্রথমে এই গ্রন্থকারের জনক পরলোকগত পণ্ডিত হরকুমার রায় মহাশয় "পরিমলবাহিনী"নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে গ্রামে বাস করিয়াও পিতৃদেবের মনে লোকশিক্ষার জন্য সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তার বোধ জাগিয়া উঠিয়াছিল। বাসণ্ডা গ্রামের "পূর্ণচন্দ্রোদয়" নামক এক প্রেসে সেই সংবাদপত্রখানি মুদ্রিত হইত। সেই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন বা নীলামী ইস্তাহার ছাপা হইত না। সংবাদ ও নীতিমূলক প্রবন্ধ দ্বারাই পত্রিকা পূর্ণ হইত। পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি, এই পত্রিকা প্রচার করিয়া তিনি ঋণজালে জড়িত হইয়াছিলেন এবং অর্থাভাবে এই পত্রিকার সত্তা দীর্ঘকাল রক্ষা করিতে পারেন নাই।

অতঃপর বরিশাল সহর হইতে নানা সময়ে 'হিতসাধিনী', 'বালরঞ্জিনী', 'সত্যপ্রকাশ', 'বঙ্গদর্পণ', 'সহযোগী', 'স্বদেশী' প্রভৃতি পত্রিকা প্রচারিত হইয়া অল্পদিন মধ্যেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। "সহযোগীর" সম্পাদক পরলোকগত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের সুলিখিত পত্রিকাখানি এক সময়ে বরিশালবাসী জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিল। বাঙ্গলা ১২৮০ সালে মাগুরা গ্রামবাসী বাবু ঈশ্বরচন্দ্র

কর মহাশয় "বরিশাল বার্ত্তাবহ" নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া কিছুদিন চালাইয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারের বরিশাল আগমনের পরে বাঙ্গলা ১২৮৮ সালে "কাশীপুরনিবাসী" পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া অদ্যাবধি চলিতেছে। যে সময়ের কথা আলোচিত হইতেছে তখন দেশের লোক সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিত না। কেবল অল্পসংখ্যক দেশহিতৈষী যুবক হয়ত সময়ে সময়ে ইহার কিঞ্চিৎ অভাব বোধ করিতেন। 'কাশীপুরনিবাসী' পত্রিকা রায় সাহেব প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদিত। এই কাগজ জনমত প্রকাশের উপযোগী বলিয়া বিবেচিত হইত না। অতঃপর ১৮৯৫ অব্দে বরিশাল বঙ্গবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব হেড্‌পণ্ডিত রাজমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় "বরিশাল-হিতৈষী" পত্রিকা প্রচার করেন। এই কাগজখানিও সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্যাবলীর যথোচিত সমালোচনা করিতে পারিত না। এক সময়ে অশ্বিনীকুমার এই সংবাদ পত্রখানি স্বীয় অভিপ্রায় অনুসারে পরিচালনার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই চেষ্টা নানা কারণে সফল হয় নাই।

ইহার পরে অশ্বিনীকুমার স্বর্গীয় প্যারিলাল রায়, শ্রীযুক্ত হরনাথ ঘোষ, বারিষ্টার নলিনীভূষণ গুপ্ত, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত (রায় বাহাদুর) প্রভৃতি বন্ধুগণের সহিত পরামর্শক্রমে 'বিকাশ' নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পত্রিকা কিছুকাল অন্যের ছাপাখানায়

মুদ্রিত হইত বলিয়া যথাসময়ে প্রকাশিত হইত না। এই অভাব দূর করিবার জন্য অশ্বিনীকুমার, জমিদার কালীপ্রসন্ন গুহ ও জমিদার উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়দ্বয়ের সাহায্যে এবং স্বয়ং বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটি বৃহৎ ডবল ডিমাই যন্ত্র ও ছাপার সমস্ত সাজ সরঞ্জাম খরিদ করিয়াছিলেন। এই National Machine Press হইতে তিন বৎসর কাল "বিকাশ" শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ গুহ মহাশয়ের সম্পাদকতায় নিয়মিত বাহির হইত। তখন মফঃস্বলে কোথাও এমন সুপরিচালিত সুবৃহৎ সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র ছিল না। দুঃখের বিষয় নানা কারণে এই পত্রিকার প্রচার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। উক্ত মুদ্রাযন্ত্রে তারপর 'বরিশাল হিতৈষী'পত্রিকা মুদ্রিত হইতেছে। অশ্বিনীকুমার ও তাঁহার বন্ধুগণ বিনামূল্যেই উক্ত মুদ্রাযন্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, "বরিশালহিতৈষী" তখন কিছুকাল অশ্বিনীকুমারের মতানুবর্ত্তন করিয়া চলিত। বরিশালহিতৈষীর বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন সেন বি,এ,মহাশয় বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এই সংবাদ পত্রখানি সম্পাদন করিতেছেন। বরিশালহিতৈষীর সম্পাদক মহাশয় কিছু কালের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া ছিলেন। তাঁহার কারাবাসকালে শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন মজুমদার ও উকিল শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত পত্রিকা পরিচালনা করিতেন। অশ্বিনীকুমারের অন্তিম জীবনে তাঁহার আশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়া "বরিশাল" 'নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইয়া দক্ষতাসহকারে পরিচালিত হইতেছে। শ্রীযুত

বিজয়ভূষণ দাশ গুপ্ত এম, এ মহাশয় উক্ত পত্রিকার বর্ত্তমান সম্পাদক।

বরিশালে স্বায়ত্তশাসন

যে সময়ে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের অল্পসংখ্যক দেশহিত কামী ব্যক্তি লাট্ রিপন্-প্রবর্ত্তিত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনদ্বারা স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন সেই সময়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালে আসিয়া আপনাকে দেশসেবায় উৎসর্গ করেন। অশ্বিনীকুমার তখন নবীন যুবক; উৎসাহ, উদ্যম, আশা ও কর্ম্মানুরাগে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ ছিল। তিনি তখন সর্ব্বান্তঃ-করণে বিশ্বাস করিতেন যে, বৈধ রাজনৈতিক আন্দোলনদ্বারা ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিতে পারিবে। ১৯১৩ অব্দেও বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির অভিভাষণে তিনি বলিয়াছিলেন—"আমরা পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়াছি যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যমধ্যে ঔপনি-বেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভই আমাদের লক্ষ্য। কোন শক্তি আমাদিগকে এই লক্ষ্য লাভের পথে বাধা দিতে পারিবে না। আমাদের উচ্চাভিলাষ ব্রিটিশ-ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘোষণাপত্ররূপ সুদৃঢ় শৈলের উপরে অধিষ্ঠিত। প্রজানুরাগী সম্রাটেরা উক্ত ঘোষণাপত্রের যথার্থ্য সুদৃঢ় কণ্ঠে বারংবার ব্যক্ত করিয়াছেন।"

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের পন্থা ধরিয়াই যুবক অশ্বিনীকুমার তাঁহার জন্মভূমি বরিশাল জিলার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। স্বনামপ্রসিদ্ধ স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় যখন বরিশালে



ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত

১৫৩ পৃঃ

ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য করিতেন তখন ১৮৮৫ অব্দে বরিশাল মিউনিসিপ্যাল্ বোর্ডে স্বায়ত্তশাসন প্রবর্ত্তিত হয়। অশ্বিনী-কুমারের শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্ ও বরিশালবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু স্বর্গীয় প্যারিলাল রায় মহাশয় চেয়ারম্যান এবং প্রসিদ্ধ উকিল দীনবন্ধু সেন মহাশয় ভাইস্ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে বাটাজোড়ের রায় দ্বারকানাথ দত্ত বাহাদুর চেয়ারম্যান এবং অশ্বিনীকুমার ভাইস্ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। ইহার পর পুনর্ব্বার রায় দ্বারকানাথ দত্ত বাহাদুর চেয়ারম্যান এবং স্বনামখ্যাত ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত মহাশয় ভাইস্ চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। পরবর্ত্তী নির্ব্বাচনে অশ্বিনীকুমার চেয়ারম্যান এবং তারিণীকুমার গুপ্ত মহাশয় ভাইস্ চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। এইরূপে অশ্বিনীকুমার বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির সভ্য, ভাইস্ চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যানরূপে বহু বৎসর পর্য্যন্ত ইহার সেবা করিয়া বরিশাল নগরের প্রভূত হিতসাধন করিয়াছেন।

সমগ্র বরিশাল জিলায় স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন অধিকার প্রদানের বিপক্ষে ম্যাজিষ্ট্রেট্ রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় গভর্ণমেণ্টের সমীপে এক সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেটের উক্ত মন্তব্যের প্রতিবাদ করিবার জন্য বরিশাল জিলাবাসীদের পক্ষ হইতে অশ্বিনীকুমার, উকিল মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ, লাখুটিয়ার জমিদার বাবু বিহারীলাল্ রায় এবং বারিষ্টার মিঃ প্যারিলাল রায় মহাশয় ছোট লাট্ বাহাদুরের নিকট প্রতিনিধি প্রেরিত হইয়াছিলেন। গভর্ণমেণ্টের অনুমতি অনুসারে ১৮৮৭

অব্দে বরিশাল সদর এবং পিরোজপুর মহকুমায় স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। তখন ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ডে জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটেরাই চেয়ারম্যান হইতেন। বরিশাল জিলাবোর্ডে স্বর্গীয় উকিল রজনীকান্ত দাস মহাশয় সর্ব্বপ্রথমে ভাইস্ চেয়ারম্যান নির্ব্বাচিত হন। সদর লোকাল বোর্ডে অশ্বিনীকুমারই প্রথমবারে চেয়ার-ম্যান বৃত হইয়াছিলেন। এই স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত যুক্ত হইয়া অশ্বিনীকুমার যাঁহাদের সহিত কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ উকিল প্যারিলাল রায়, দীনবন্ধু সেন, হরনাথ ঘোষ, রজনীকান্ত দাস, ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত, রায় দ্বারকানাথ দত্ত বাহাদুর, মৌলবী মহম্মদ ওয়াজেদ প্রভৃতির নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে বরিশাল জিলার পথকর বৃদ্ধির আন্দোলন উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৭৫ অব্দে মিঃ বার্টান্ যখন বরিশালে ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন তখন রাজস্বের প্রতি টাকায় দুই পয়সা হারে পথকর আদায় করা হইবে, ইহা নির্দ্ধারিত হয়। ১৮৭৬ অব্দে বরিশাল জিলায় ভীষণ প্লাবনে প্রায় তিন লক্ষ লোক ও অসংখ্য গবাদি গৃহপালিত পশুর জীবন নাশ হয়। ঐ প্লাবনে লোকের প্রায় চৌদ্দ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হয়। প্রজামণ্ডলীর ক্লেশ কিয়ৎপরিমাণে লাঘব করিবার জন্য তখন পথকরের হার অর্দ্ধেক করা হয়। ১৮৯২ অব্দে গভর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় মতে স্থানীয় বোর্ডের অধিকাংশ সভ্য পুনর্ব্বার পথকর বৃদ্ধির পক্ষপাতী হইলেন। বলা বাহুল্য দরিদ্র জনমণ্ডলী

এই বৃদ্ধির বিরোধী ছিল। জনসাধারণের পক্ষ হইয়া অশ্বিনীকুমার, প্যারিলাল রায়, দীনবন্ধু সেন, হরনাথ ঘোষ, উগ্রকণ্ঠ রায়, ব্রাউন সাহেব ও ডিসিলবা সাহেব পথকর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল সহৃদয় দেশ-হিতৈষী ব্যক্তির প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইল! ১৮৯২ অব্দে পথকর দেড়গুণ এবং ১৮৯৭ অব্দে দ্বিগুণ করা হইল।

কংগ্রেস ও অশ্বিনীকুমার

অশ্বিনীকুমার যে দিন তাঁহার পরমপ্রিয় জন্মভূমি বরিশালে আসিয়া দেশমাতৃকার পূজার ভার গ্রহণ করিলেন সেই দিন হইতেই তিনি ভক্ত পূজারীর মত প্রত্যহ শ্রদ্ধাভক্তির পবিত্র পুষ্পে জননীর পূজা করিয়াছেন। স্বদেশের হিতসাধন ছিল তাঁহার লক্ষ্য, এই জন্য দেশের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলকর অনুষ্ঠানের সহিত তাঁহার যোগ ছিল। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও শিক্ষা সকল দিক্ দিয়া যাহাতে বরিশাল উন্নত হয় উহার জন্য তিনি সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন। রায় নিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত বাহাদুর এক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, “রাষ্ট্রনায়কেরা অনেকেই বঙ্গের পল্লীগুলির কথা না ভাবিয়া একেবারে সমগ্র ভারতের কথা ভাবিয়া থাকেন, কিন্তু অশ্বিনীকুমার কখনও বরিশালকে উপেক্ষা করিয়া ভারত-সেবক নামে পরিচিত হইবার বাসনা বা চেষ্টা করিতেন না। কোন অনুষ্ঠানেই যে বরিশাল অন্য জিলার

পশ্চাতে থাকে তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিকট কোন পল্লী বাটাজোড়ের ন্যায় প্রিয় ছিলনা, কোন জিলা বরিশাল অপেক্ষা প্রিয়তর ছিল না, সুতরাং তিনি বরিশালের এবং বরিশালও তাঁহার ছিল। বরিশালের বাহিরে অন্যত্র নাম জাহির করিবার জন্য কোন ব্যগ্রতা তাঁহার ছিল না। যদিও তিনি আজীবন একজন কংগ্রেসওয়ালা ছিলেন, কিন্তু বরিশালের উন্নতিই তাঁহার 'মন্তব্য, স্মর্ত্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য' ছিল। এইখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য।"

জাতীয় মহাসমিতির নেতৃবর্গ বর্ত্তমানে পল্লী সংগঠনের অভিলাষী হইয়াছেন। এইজন্য স্থানে স্থানে চেষ্টাও চলিতেছে। অশ্বিনীকুমার বহুপূর্ব্বে জাতীয় মহাসমিতির এক অধিবেশনে দৃঢ়কণ্ঠে এই কথা বলিয়াছিলেন—"বছরে তিন দিন কংগ্রেস করিয়া বা সেই উপলক্ষে কয়েক দিন স্থানে স্থানে সভা করিয়া দেশের যথার্থ উন্নতি হইবে না। ইহা তামাসা মাত্র। বছর ভরিয়া প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্ত্তে সমগ্র ভারত-সমাজের স্তরে স্তরে তিল তিল করিয়া এই কাজটী করিতে হইবে। এই জন্য একটি সঙ্ঘ গঠন নিতান্ত আবশ্যক।"

কংগ্রেসসিংহ স্যর ফেরোজ্ সাহ্ মেটা অশ্বিনীকুমারের ঐ উক্তিতে উষ্মা প্রকাশ করিয়া "বাবু বসো, বাবু বসো" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহার উক্তিতে কর্ণপাত না করিয়া স্বীয় বক্তব্য বলিতেছিলেন। তখন মেটা

মহাশয় তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। যাহা হউক, অশ্বিনীকুমারের ঐ বক্তৃতায় কোন ফল হইল না। কংগ্রেসের প্রবীণ ব্যক্তিগণ এই যুবক বক্তার বাক্য প্রণিধানযোগ্য বলিয়াই মনে করিলেন না।

অশ্বিনীকুমার বলিতেন, কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্সে অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোক যে সকল প্রস্তাব আলোচনা করেন, গ্রামে গ্রামে সেই সমস্তের আলোচনা না হইলে জনমতের সৃষ্টি হইতে পারে না। এই জন্য কংগ্রেসে যে প্রস্তাব আলোচিত হইয়া গৃহীত হয় উহাকে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দাবী বলা যায়, কিন্তু ভারতীয় জনমণ্ডলীর দাবী বলা যাইতে পারে না। এই উদ্দেশ্যে লোকশিক্ষার জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে গ্রামে গ্রামে উপযুক্ত লোক প্রেরণ করা আবশ্যক।

অশ্বিনীকুমার মহাসমিতির সভ্যদিগকে তাঁহার বাক্যানুযায়ী কোন কার্য্য করাইতে পারিলেন না। অগত্যা তিনি আপনার কর্ম্মক্ষেত্র বরিশাল জিলায় স্বয়ং এইভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া নিরক্ষর কৃষকদের দুয়ারে দুয়ারে কংগ্রেসের বার্ত্তা প্রচার করিতেন। রায় নিবারণচন্দ্র দাশ গুপ্ত বাহাদুর এইরূপ এক সভার বর্ণনায় লিখিয়াছেন—"আমি যখন স্কুল ছাড়িয়া কলেজে প্রবেশ করিয়াছি তখন অশ্বিনীবাবু রাজনীতির আসরে নামিয়াছেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সভাসমিতি করিতেছিলেন। একবার পূজার ছুটীর সময়ে তিনি মাহিলাড়া ও বাটাজোড়ের মধ্যবর্ত্তী একস্থানে খোলা মাঠের মধ্যে এক জন-

সভা করিয়াছিলেন। সেই সভায়ই আমি তাঁহার প্রথম দর্শন লাভ ও বক্তৃতা শ্রবণ করি। ঢাকঢোল বাজাইয়া যেমন মেলা বসানো হয়,—সেই প্রণালীতেই তিনি সভায় লোক সমবেত করিতেন। প্রথমে তাঁহারই রচিত "ভারতগীতি" হইতে স্বদেশহিতৈষণা-উদ্দীপক একটি গান হইত, তৎপরে তিনি বক্তৃতা করিতেন।"

আমাদের দেশের রাষ্ট্রনায়ক এবং শিক্ষিত সমাজের অনেকের মনে এইরূপ ধারণা আছে যে, আমাদের দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ দেশের কথা বুঝিতে পারিবে না। অশ্বিনী-কুমার এই ধারণার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, "বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলনে আমাদের দেশের জনসাধারণ যেমন ভাবে সাড়া দিয়াছিল তাহা হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইতে পারে যে, কেহ কেহ দেশের আলোচনা সম্বন্ধে তাহাদিগকে যেমন উদাসীন ও অজ্ঞ মনে করেন, বস্তুতঃ তাহারা তেমন নহে। তাহাদের মনে কৌতূহল উৎপাদন করিতে পারিলে আমাদের দেশের অশিক্ষিত জনমণ্ডলী রাজনীতিবিষয়ক আলোচনা যেরূপ ভাবে বুঝিতে পারে, অন্য দেশের সাধারণ লোকের বুঝিবার শক্তি তদপেক্ষা অধিক আমি তাহা মনে করি না। অনেকেই ইহা জানেন যে, বরিশাল ও ময়মনসিংহের রায়তেরা এমন সুবুদ্ধি যে, অতি জটিল মামলাও তাহারা দক্ষতার সহিত চালাইয়া থাকে। এইরূপ বুদ্ধিমান্ জনমণ্ডলীর নিকট রাজনৈতিক আন্দোলনের তথ্য জ্ঞাপন করিয়া তাহাদের মনে উৎসাহের সঞ্চার করিতে পারিলেই

যথেষ্ট হইবে। এইরূপ অশিক্ষিত জনমণ্ডলীর মধ্যে আমি বহুবার বক্তৃতা করিয়া দেখিয়াছি যে, তাহারা আমার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে বেশ ধারণা করিতে পারিয়াছে। ১৮৮৫ অব্দের শেষভাগে অথবা ১৮৮৬ অব্দের আরম্ভে আমি প্রজাসাধারণের দ্বারা ব্যবস্থাপক সভাগঠনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কতকগুলি সভায় জনসাধারণের নিকট বক্তৃতা করিয়াছিলাম। তখন বরিশাল জিলা হইতে যাহারা লিখিতে পারে এমন চল্লিশ হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত এক আবেদন ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট সভায় প্রেরিত হইয়াছিল। ১৮৮৭ অব্দে মান্দ্রাজে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে ঐ আবেদন প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ আন্দোলনের সময়ে একদিন কয়েকটি কৃষক আসিয়া ঐ বিষয়টা কি তাহা আমার নিকট জানিতে চাহে। আমি যখন ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইব এমন সময়ে এক নিরক্ষর ব্যক্তি হঠাৎ বলিয়া উঠিল—"ওহে, ব্যাপারটা কি আমি বুঝাইয়া দিতেছি। বিবাদ মিটাইবার জন্য আমরা যেমন নিজের মনের মত লোককে শালিস নিযুক্ত করি, এই বিষয়টিও ঠিক সেইরূপ। বাবু বলেন, আমরা সরকারের নিকট এই প্রার্থনা করিব যে, আমাদিগকে যে সকল আইন মানিতে হয় সেই সকল আইন আমাদের নির্ব্বাচিত ব্যবস্থাপকগণ প্রণয়ন করিবেন। তাঁহারা যদি আমাদের দ্বারা নির্ব্বাচিত হন তাহা হইলেই আমাদের পরামর্শ শুনিবেন এবং আমাদের স্বার্থের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।" এই অক্ষরপরিচয়শূন্য লোকটি যেমনভাবে তাহার সঙ্গীদিগের নিকট সোজাভাবে

আমার বক্তব্য জানাইল আমি তাহা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম।”

আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৮০ অব্দে অশ্বিনীকুমার যখন বরিশালে আসিয়া ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন তখন হইতেই দেশহিতকর তাবৎ আন্দোলনের সাহত তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি এবং সংশ্রব ছিল। যুবক অশ্বিনীকুমার যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতেন তখনই বঙ্গের রাজনৈতিক গুরু দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ, নিখিল ভারতের সৌভাগ্যবশতঃ সিবিল্ সার্বিস্ হইতে বরখাস্ত হইয়া, আপনাকে দেশসেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দেশবাসীর আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং রাজনৈতিক দাবী আলোচনার জন্য তেজস্বী সুরেন্দ্রনাথ, পরলোকগত আনন্দমোহন বসু, মনোমোহন ঘোষ, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী, শ্যামাচরণ সরকার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দেশহিতৈষী মহানুভব ব্যক্তিগণ ভারতসভা (Indian Association) স্থাপন করেন। শ্যামাচরণ সরকার মহাশয় ভারতসভার প্রথম সভাপতি এবং মহাত্মা আনন্দমোহন বসু প্রথম সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে তখন নবজাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল। দেশহিতৈষী সুরেন্দ্রনাথের বাগ্মিতা তখন যুবকদের হৃদয়ে আশা ও আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়া দিত। এই পরিবেষ্টনের মধ্যে অশ্বিনীকুমার শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যিনি ভারতের প্রায় সমস্ত প্রবীণ দেশ-সেবকগণের গুরু সেই সুরেন্দ্রনাথই অশ্বিনীকুমারের হৃদয়ে স্বদেশসেবার পবিত্র বহ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন।

১৮৮৫ অব্দে বোম্বাই নগরে ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু হিউম্ সাহেবের উৎসাহে বোম্বাইর সুপ্রসিদ্ধ জননায়ক কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলঙ্গ্ ও দিনসা ওয়াচার উদ্যোগে জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠা হয়। এই সভায় পরলোকগত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। এই মহাসমিতির উদ্দেশ্য হইল—(১) ভারতবর্ষের নানাজাতিকে এক মহাজাতিতে পরিণত করা (২) নিখিল ভারতের নৈতিক, মানসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতি বিধান করা (৩)ভারতের উন্নতির পথে যত প্রকার বাধা আছে বৈধ আন্দোলন দ্বারা সেইগুলিকে দূর করিয়া ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড এই দুই রাজ্যের মধ্যে সখ্য স্থাপন করা।

জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বেই বঙ্গের মনীষিগণের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছিল যে, নিখিল ভারত একই উদ্দেশ্যে একযোগে চেষ্টা না করিলে এই দেশের অভ্যুত্থানের আশা নাই। নিখিল ভারতবাসীকে এই ঐক্যমন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়া দেশসেবায় সর্ব্ব প্রথমে আহ্বান করিয়াছিলেন স্বনামধন্য আনন্দমোহন ও তেজস্বী সুরেন্দ্রনাথ। ১৮৮৩ অব্দে ইহাঁরা কলিকাতায় ভারতসভার পক্ষ হইতে একজাতীয় মহাসভা (National Conference) আহ্বান করেন। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজের সম্মুখস্থ এলবার্ট হলে ২৮এ, ২৯এ, এবং ৩০এ ডিসেম্বর এই তিন দিন

সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ভারতবর্ষের বৃহৎ বৃহৎ নগর হইতে প্রায় একশত প্রতিনিধি এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। বসু মহাশয় এই সভার প্রারম্ভ-বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"অদ্য এইখানে ভারতের জাতীয় পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠার সূচনা করা হইল।" ১৮৮৫ অব্দে বোম্বাই নগরে যখন জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইতেছিল ঠিক ঐ সময়ে কলিকাতা নগরে ন্যাশন্যাল্ কন্‌ফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হইতেছিল। এইজন্য সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন প্রভৃতি বঙ্গের উৎসাহী দেশ-সেবকগণ জাতীয় মহাসমিতির সর্ব্বপ্রথম অধিবেশনে যোগদান করিতে পারেন নাই। ন্যাসন্যাল্ কনফারেন্স্ এবং ন্যাসন্যাল্ কংগ্রেস্ এই উভয় সভারই উদ্দেশ্য অভিন্ন ছিল বলিয়া উভয় সভার সভ্যগণ সাগ্রহে জাতীয় মহাসমিতির সেবক হইলেন। অশ্বিনীকুমার জাতীয় মহাসমিতির প্রতিষ্ঠার পূর্ব্ব হইতেই দেশহিতকর সর্ব্বপ্রকার আন্দোলনের সহিত যুক্ত ছিলেন। এই মহাসমিতি প্রতিষ্ঠার পর হইতে তিনি বঙ্গীয় রাষ্ট্রনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পতাকাতলে দেশসেবকদলভুক্ত হইয়া নীরবে দেশমাতার সেবা করিতেছিলেন।

১৮৮৬ অব্দে কলিকাতা নগরে জাতীয় মহাসমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে বঙ্গের শিক্ষিত সমাজে মহাউৎসাহের সঞ্চার হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় জমিদার-বর্গের শিরোমণি বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে

দাদাভাই নৌরজী মহাশয় এই মহাসমিতির সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই মহাসভায় বঙ্গীয় যুবকদের সহিত শিক্ষিত প্রবীণগণও সাগ্রহে যোগদান করিয়া দেশের কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। যুবক অশ্বিনীকুমার এই সময়ে উৎসাহী দেশ-সেবক বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছিলেন। ইহার পরবৎসর মান্দ্রাজে জাতীয় মহাসমিতির তৃতীয়বার্ষিক অধিবেশন হয়। অশ্বিনাকুমার এই অধিবেশনে যোগদান করিয়াছিলেন। এই বৎসর বঙ্গীয় প্রতিনিধিগণ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া ষ্টীম্ নেভিগেসন্ কোম্পানীর এক জাহাজে মহানন্দে কলিকাতা হইতে সমুদ্রপথে মান্দ্রাজ গমন করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ স্যর রাসবিহারী ঘোষ, কিশোরীলাল গোস্বামী সেই বৎসর প্রতিনিধিদলভুক্ত ছিলেন। জাহাজে প্রতিনিধিগণ মহোৎসাহে নবজাত জাতীয় মহাসমিতির এবং জননী ভারতভূমির মহাভবিষ্যৎ আলোচনা করিয়া সময় যাপন করিতেন। এই প্রসঙ্গ ব্যতীত কাহারও মুখে অন্য কোন কথা বড় শুনা যাইত না।

১৮৮৬ হইতে ১৯০৫ অব্দ পর্য্যন্ত জাতীয় মহাসমিতির আন্দোলন প্রায় একই ভাবে চলিয়াছিল। ১৮৯৭ অব্দে বেরারের রাজধানী অমরাবতীতে (স্যর) শঙ্কর নেয়ারের সভাপতিত্বে মহাসমিতির যে অধিবেশন হয় সেই সভায় অশ্বিনীকুমার কংগ্রেসকে "তিন দিনের তামাসা" বলিয়া ফেরোজ্ সাহ্ মেটার নিকট যে দুর্ব্ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ পূর্ব্বেই করা হইয়াছে। অশ্বিনীকুমার বলিলেন

—"বৎসরব্যাপী আন্দোলনের দ্বারা মহাসমিতির বাণী পল্লীবাসী জনমণ্ডলীর মনে মুদ্রিত করিতে না পারিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে না।" অশ্বিনীকুমার মুখে যাহা বলিতেন কাজে তাহা না করিয়া ছাড়িতেন না। তিনি তাঁহার কর্ম্মভূমি বরিশাল জিলার অধিবাসীদের মনে দেশাত্মবুদ্ধি জাগাইবার জন্য স্বীয় শক্তি ও অবসর মত চেষ্টা করিতে কখনও ত্রুটী করেন নাই।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ

১৯০৫ অব্দ বঙ্গের ইতিহাসে অন্যতম স্মরণীয় বৎসর বলিয়া উক্ত হইতে পারে। ঐ অব্দের ১৬ই অক্টোবর, বাঙ্গলা ৩০এ আশ্বিন ভারত গবর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন—"ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী বিভাগ আসামের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম নামে এক প্রদেশ হইল—ঢাকা হইল ইহার রাজধানী। প্রেসিডেন্সি ও বর্দ্ধমান বিভাগ পূর্ব্ববৎ বিহার ও উড়িষ্যার সহিত মিলিত থাকিয়া 'বঙ্গদেশ' নামে উক্ত হইল।" বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর লইয়া তখন যে সুবৃহৎ বঙ্গদেশ ছিল, ভারতের জবরদস্ত বড়লাট্ লর্ড্ কার্জ্জন্ শাসনের সুবিধার দোহাই দিয়া জনমতের বিরুদ্ধে উহাকে স্বেচ্ছামত দুইভাগে বিভক্ত করিলেন। তখনকার বঙ্গদেশ যে বৃহৎ ছিল এবং উহার শাসনসংক্রান্ত কাজ যে একজন ছোট লাটের পক্ষে অধিক ছিল, ইহা কেহ কেহ স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বড় লাট্ লর্ড্ কার্জ্জন্,

বঙ্গভাষাভাষী উন্নতিশীল একটি জাতিকে আপনার যেমন অভিরুচি তেমন দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সমগ্র বাঙ্গালীর মনে এমন বেদনা দিয়াছিলেন যে, সেই বেদনায় ছোট বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলে সমবেতভাবে আৰ্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছিল। ১৯০৩ অব্দের ৩রা ডিসেম্বর ভারত গভর্ণমেণ্ট যখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন তখন হইতেই বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র উহার প্রতিবাদ হইতেছিল। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে সত্তর সহস্র স্বাক্ষরসম্বলিত এক প্রতিবাদপত্র ভারতসচিব মহোদয়সমীপে প্রেরিত হইয়াছিল। ১৯০৫ অব্দের ১৬ই অক্টোবরের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে ছোটবড় দুই সহস্র সভায় ব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করা হইয়াছিল। কিন্তু দাম্ভিক লর্ড্ কার্জ্জন্ জনমণ্ডলীর কাতরতাপূর্ণ প্রতিবাদে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে স্বীয় মতে আনিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইঙ্গিতে পূর্ব্ববঙ্গ জমিদারসভার আহ্বানে পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান প্রধান ব্যক্তি কলিকাতার লাট্-সদন 'বেল্‌ভেডিয়ারে' আহূত হইলেন। স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজারের সভাপতিত্বে কয়েকটি পরামর্শ সভা হইল। কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। তখন লর্ড্ কার্জ্জন্ স্বীয় ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করিবার অভিপ্রায়ে ঢাকা ও ময়মনসিংহে গমন করেন। ময়মনসিংহে তিনি মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি রাজপ্রতিনিধিকে রাজোচিত সংবর্দ্ধনা

করিয়া ধীরভাবে দৃঢ়কণ্ঠে জানাইয়া দিয়াছিলেন—"বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ করা হইলে উহাকে আমি অতি ভীষণ বিপদ্ বলিয়া মনে করিব।" বাঙ্গালী বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ চায় না, ইহা জানিতে পারিয়াও নাছোড়-বন্দ লর্ড্ কার্জ্জন্ বাঙ্গলা ভাগ করিবেন স্থির করিলেন। পার্লামেণ্টে বঙ্গব্যবচ্ছেদের যে প্রস্তাবনা তিনি দাখিল করিয়াছিলেন সেই প্রস্তাবনা বঙ্গদেশবাসী এক ব্যক্তিও জানিতেন না। উহা গোপনে স্থিরীকৃত ও আলোচিত হইয়াছিল। ১৯০৫ অব্দে ২০এ জুলাই যখন অকস্মাৎ বঙ্গব্যবচ্ছেদের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হয় তখন সকলে স্তম্ভিত ও মর্ম্মাহত হইল। নিখিল বঙ্গের দুইবৎসর-ব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ, আবেদন, নিবেদন সমস্ত দম্ভভরে পদদলিত করিয়া লর্ড্ কার্জ্জন্ আপনার খেয়ালকেই জয়যুক্ত করিলেন। বাঙ্গালী এই অপমানে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল। শান্ত ও নিরীহ বাঙ্গালীর মনে তখন এই সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিল যে, যেমন করিয়া হউক গভর্ণমেণ্ট যাহাতে বঙ্গব্যবচ্ছেদ আজ্ঞা বাধ্য হইয়া রহিত করেন, সেইরূপ কিছু করিতেই হইবে। এই শুভ সঙ্কল্প হইতেই স্বদেশী আন্দোলনের উদ্ভব হয়।

পাবনা সহরে এক প্রতিবাদ সভায় সর্ব্বপ্রথম বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জনের কথা উঠে, মফঃস্বলে আরও কয়েকটি সহরে ঐরূপ প্রসঙ্গ উত্থিত হয়। এই সময়েই শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রস্তাব করিলেন,—'যতদিন বঙ্গব্যবচ্ছেদ

রহিত করা না হয় ততদিন বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করা হউক।' ৭ই আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলের বিরাট্ সভায় "ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রিকার সম্পাদক পরলোকগত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছিলেন—"যেহেতু ব্রিটিশ জনসাধারণ ভারতীয় প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং বর্ত্তমান ভারত গভর্ণমেণ্ট ভারতীয় জনমতের প্রতি সর্ব্বথা অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন সেই হেতু উহার প্রতিবাদার্থ এই সভা মফঃস্বলের সভাসমূহে প্রস্তাবিত ব্রিটনজাত দ্রব্যসমূহবর্জ্জনের অস্থায়ী বিধি সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করিতেছেন।"

এই বিলাতী দ্রব্যবর্জ্জনের আন্দোলনই ক্রমে স্বদেশী আন্দোলনে পরিণত হয়। এই সময়ে বাঙ্গালীর ঐক্যকে চিরন্তন করিবার জন্য কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাবে বঙ্গ-বিভাগের দিন ৩০এ আশ্বিনকে 'রাখী বন্ধনের' দিন করা হয়। এই উপলক্ষে কবিবর তাঁহার 'বাংলার মাটী, বাংলার জল' এই অমর সঙ্গীতটি বঙ্গদেশবাসীকে উপহার প্রদান করেন।

বঙ্গব্যবচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলন

বঙ্গব্যবচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অশ্বিনীকুমার স্বীয় অনন্যসুলভ কর্ম্মশক্তি ও মণ্ডলীগঠনের আশ্চর্য্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়া সকলকে বিস্মিত করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের এককোণে বরিশাল জিলায় তিনি আন্দোলনের যে বহ্নি জ্বালাইয়াছিলেন উহার তীব্র দীপ্তি ভারতের তদানীন্তন রাজ-

প্রতিনিধি লর্ড্ মিণ্টোর চক্ষু ঝলসিয়া দিয়াছিল। তিনি লর্ড্ মর্লীকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—"সীমান্ত সৈন্যবিভাগ এবং বরিশাল-সমস্যা আমাকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।" ইহার কারণ কি? কারণ এই যে, যিনি এতদিন কর্ত্তব্যপরায়ণ, ধর্ম্মভীরু আদর্শ শিক্ষক বলিয়া পূজিত হইতেন সেই অশ্বিনীকুমার এই সময়ে সমগ্র বরিশাল জিলার শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনমণ্ডলীর মুকুটহীন রাজার পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সাধারণ দোকানদারও জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট্কে এই কথা জানাইতে ভীত হইত না যে, "আপনার আদেশে বিলাতী কাপড় এক টুক্‌রাও বিক্রয় করিতে পারি না, আর যদি অশ্বিনী বাবু আদেশ করেন ত বিক্রয় করিতে পারি!"

বঙ্গব্যবচ্ছেদের সময়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালে আন্দোলনের যে আগুন জ্বালাইয়াছিলেন উহার উল্লেখ করিয়া তাঁহার মৃত্যুর পরে ১৯২৩, ২৭এ নভেম্বর লণ্ডনের টাইমস্ পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন—

"Nowhere in the new provincial area did the flames of anger rose higher than at Barisal under his leadership. Lord Morley then at the India Office found it most distasteful to sanction in December 1908, the application to this scholarly man and eight other Bengal leaders of the Regulation of 1818, authorising deportation without trial, for reasons of State."

অর্থাৎ অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বাধীনে নূতন প্রদেশের বরিশাল জিলায় বঙ্গব্যবচ্ছেদের জন্য ক্রোধাগ্নি যেরূপ ভীষণভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, আর কোন জিলায় তেমন হয় নাই। তখন ১৯০৮ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত-সচিব লর্ড্ মর্লী একান্ত অনিচ্ছায় ১৮১৮ অব্দের আইন মতে এই সুপণ্ডিত ব্যক্তির ও অপর আট জন বঙ্গীয় নেতার বিনা বিচারে নির্ব্বাসন অনুমোদন করিয়াছিলেন।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-বার্ত্তা প্রচারিত হইবার পরে উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার জন্য বরিশাল সহরে প্রবীণদের দলটি নেতৃসঙ্ঘ এবং যুবকদের দলটি কর্ম্মিসঙ্ঘ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অতি সরল ভাষায় লোকসাধারণকে বঙ্গ-বিভাগের অপকারিতা বুঝাইয়া দিবার জন্য অশ্বিনীকুমার তাঁহার অনুরাগী কতিপয় যুবককে আদেশ করিয়াছিলেন। এই দলে শিক্ষক ও উকীলে আঠারটি যুবক ছিলেন। ইহাঁরা বরিশালের রাজপথে বক্তৃতা করিতেন। নিজেদের কাজের সুবিধার জন্য এই যুবকগণ সঙ্ঘ-বদ্ধ হন। এই দলটির নাম হইল কর্ম্মিসঙ্ঘ। ডাক্তার নিশিকান্ত বসু এই সঙ্ঘের প্রথম সম্পাদক। অশ্বিনীকুমারের অভিপ্রায়ে এই দলটির উদ্ভব হইলেও প্রথমে কিছু কাল তিনি এই দলের সহিত কার্য্যতঃ যোগদান করিতে পারিতেন না। তখন তিনি ছিলেন ইহাদের পরামর্শ-দাতা। অশ্বিনীকুমারকে তখন বরিশালের প্রবীণদের সহিত মিলিয়া কার্য্য করিতে হইত। ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত, উকিল হরনাথ ঘোষ, জমিদার

উপেন্দ্রনাথ সেন, উকিল দীনবন্ধু সেন, উকিল রজনীকান্ত দাস, জমিদার কালীপ্রসন্ন গুহ চৌধুরী ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি বরিশালের অল্প-সংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি নেতৃসঙ্ঘের সভ্য ছিলেন। ইহাদের পাঁচ নেতার স্বাক্ষরিত একখানি পুস্তিকা বরিশাল জিলার গ্রামে গ্রামে প্রচারিত হইয়াছিল। উক্ত পুস্তিকায় নেতৃগণ দেশবাসী জনমণ্ডলীকে সর্ব্বপ্রকার বিরোধ মীমাংসার জন্য সালিসী-সভা স্থাপন এবং বিলাতী দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া স্বদেশ-জাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন। যাহাতে হাটে বাজারে বিলাতী লবণ, বিলাতী কাপড়, চিনি, মনোহারী দ্রব্য এবং মদ্য বিক্রয় না হয় তজ্জন্য সর্ব্বপ্রকার বৈধ চেষ্টা চলিতে লাগিল। এই প্রচেষ্টার সফলতা যত অধিক হইতেছিল রাজকর্ম্মচারীদের রোষ ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। লাট্ ফুলারের ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি বরিশালবাসীকে ভয় দেখাইবার জন্য "রোটাস্" জাহাজে বরিশাল সহরে উপস্থিত হইলেন। তিনি পাঁচ জন নেতাকে তাঁহার জাহাজে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাদের প্রচারিত পুস্তিকার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া ধমক্ দিয়া বলিলেন—'You are playing with fire!' 'সাবধান হইবেন, আপনারা আগুন লইয়া খেলিতেছেন!' এই সময়ে বরিশাল জিলার বহুগ্রামে সালিসী সভা স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ সভায় গ্রামের মাম্‌লা মীমাংসিত হইত বলিয়া আদালতের আয় হ্রাস হইতেছিল। ঐ সালিসী সভার উল্লেখ করিয়া রোষ-দীপ্ত লাট্ সাহেব বলিলেন—"What you call

Arbitration Committee, I call Committee of Public Safety." ফরাসী বিপ্লব ও আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রামকালে উক্ত দুইরাজ্যে "Committee of Public Safety" নামক বিপ্লববাদীদের যে প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছিল, লাট্ সাহেব উহারই উল্লেখ করিয়াছিলেন। তখন তিনি নেতাদিগকে একে একে উক্ত পুস্তিকা প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। একজন বলিলেন—'আমাদিগকে ভাবিবার জন্য একটু সময় দিন।' উহাতে লাট্ ফুলার অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। তিনি বলিলেন, "আমি কোন কথা শুনিব না, বলুন প্রত্যাহার করিবেন কি না? বলুন, 'হাঁ, বা 'না'।" ছোট লাট্ বাহাদুরের ভাবগতিক দেখিয়া তাঁহারা একে একে সম্মতি দিলেন। সর্ব্বশেষে অশ্বিনীকুমারকেও অনিচ্ছায় সহকর্ম্মীদের মতে মত দিতে হইল।

এই পুস্তিকা প্রত্যাহারের সম্মতি প্রদান করায় অনেকে অশ্বিনীকুমারের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা দূরদর্শী ও যথার্থ রাজনীতিজ্ঞ তাঁহারা অশ্বিনীকুমারের কার্য্য সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—"অশ্বিনীকুমার পুস্তিকা প্রত্যাহার করিয়া স্বীয় রাজনৈতিক মনস্বিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।" মনস্বী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলিয়াছেন—"এই ঘটনায় অশ্বিনী-কুমার লোকনিন্দার ভয় অগ্রাহ্য করিয়া যে সংযম, যে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা না করিলে বরিশালে সে দিন রক্তের নদী প্রবাহিত হইত। অশ্বিনীকুমার যে কেবল দেশ-

হিতৈষী ব্যক্তি ছিলেন তাহা নহে, তিনি যথার্থ রাষ্ট্রনীতিবেত্তা বিচক্ষণ ব্যক্তি।”

কিছুদিন পরে ম্যাজিষ্ট্রেট্ জ্যাক্ সাহেব এইরূপ এক ইস্তাহার প্রচার করেন যে, অশ্বিনীকুমার-প্রমুখ নেতৃগণ স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারমূলক যে ইস্তাহার জারি করিয়াছিলেন রাজদ্রোহসূচক বলিয়া তাঁহারা উহা প্রত্যাহার করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমার ইহার প্রতিবাদ করিয়া জানাইলেন যে, ইস্তাহার রাজদ্রোহসূচক বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন নাই, কেবল লাট্ সাহেবের অনুরোধে উহা প্রত্যাহার করা হইয়াছে। এই জন্য ম্যাজিষ্ট্রেট্ জ্যাক্ সাহেব অভিযুক্ত হন। বিচারে তাঁহাকে ১০১৲ টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হইয়াছিল।

এই ব্যাপারটি তখন বরিশালবাসী জনসাধারণের তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়াছিল। বলা বাহুল্য নেতৃবৃন্দের এই আচরণে জনসাধারণ বিশেষ দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। অতঃপর নেতৃসঙ্ঘের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইল। অশ্বিনীকুমার কর্ম্মিদলের যুবকদের সহিত মিলিত হইয়া আন্দোলন চালাইতে লাগিলেন। কর্ম্মিদল তখন ‘স্বদেশ-বান্ধব-সমিতি’ আখ্যা প্রাপ্ত হইল এবং অশ্বিনীকুমার হইলেন উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি।

এই সময়ে নিশিবাবু স্বেচ্ছায় স্বদেশ-বান্ধব-সমিতির প্রচারক পদ গ্রহণ করেন। ইহার পরে দুইজন মুসলমান এবং আর একজন হিন্দু প্রচারক নিযুক্ত হন। প্রচারকগণ

মহোল্লাসে গ্রামে গ্রামে সভা করিয়া জনসাধারণকে স্বদেশীর নূতন বাণী শুনাইতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র আশা, আনন্দ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হইতে লাগিল। ১৯০৫ ও ১৯০৬ অব্দে অশ্বিনীকুমার স্বদেশ-বান্ধব-সমিতির সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। হাটে বাজারে যাহাতে বিলাতী জিনিষের ক্রয় বিক্রয় না হয় তজ্জন্য তিনি হাটের মালিক জমিদারদিগকে পত্র লিখিলেন। এই সময়ে বরিশাল সহরে সর্ব্বপ্রথম জিলা কন্‌ফারেন্স হয়। কন্‌ফারেন্সের কার্য্যে যাহারা যোগদান করিয়াছিলেন তাহাদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া আশীটি গ্রামের প্রতিনিধির নাম পাওয়া গিয়াছিল। ইহাদের দ্বারাই অশ্বিনীকুমার গ্রামে গ্রামে স্বদেশ-বান্ধব-সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। প্রচারকগণও মফঃস্বলে গমন করিয়া শাখাসমিতি স্থাপন করিয়া সর্ব্বত্র আন্দোলন প্রসারিত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে সমগ্র জিলায় দেড়শতের অধিক শাখা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইল। এতন্মধ্যে প্রায় একশত শাখায় নিয়মিতভাবে সংবৎসরব্যাপী কার্য্য হইত। অপরগুলি প্রয়োজন মতে কার্য্য করিত। পল্লীর এই সমিতিগুলিতে আবশ্যক মতে কার্য্য করিবার জন্য ৫০ জন করিয়া স্বেচ্ছাসেবক থাকিত। সুতরাং দরকার হইলেই দুই একদিন মধ্যে অশ্বিনীকুমার প্রায় পাঁচ-সহস্র স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিতে পারিতেন।

এই প্রসঙ্গে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছেন—"তখন সমগ্র বরিশাল এক নেতার অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত

হইত। একটী কল টিপিয়া দিলে যেমন হাজার হাজার বিজলি বাতি জ্বলিয়া উঠে, তেমন বরিশালের লক্ষ লক্ষ লোকের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হইত অশ্বিনীকুমারের ইচ্ছাদ্বারা।” এই যে সমগ্র জিলাব্যাপী এক বিরাট্ মণ্ডলী গঠিত হইয়াছিল ইহার মূলে ছিল (১) অশ্বিনীকুমারের আসামান্য চরিত্রের প্রভাব। সমগ্র জিলার লোক অশ্বিনীকুমারের কথা একবাক্যে মানিত। এমন ভাবে বঙ্গদেশে অপর কোন নেতা লোকসাধারণের শ্রদ্ধা পাইয়াছেন বলিয়া আমরা জ্ঞাত নহি। (২) স্বদেশ-বান্ধব সমিতির সভ্যদের মধ্যে একপ্রাণতা। তাঁহারা স্ব-স্ব প্রধান না হইয়া সকলেই অশ্বিনীকুমারের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া চলিতেন। তাঁহাদের সকলেরই মন ছিল কাজের দিকে, নাম জাহির করিবার স্পৃহা কাহারও ছিল না। এই সময়ে বরিশালে স্বদেশী প্রচার ও বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদ করিবার জন্য বেতনগ্রাহী চারিজন এবং অবৈতনিক পঁচিশ জন প্রচারক কার্য্য করিতেন।

স্বদেশী আন্দোলন দ্বারা দেশের অশিক্ষিত লোক-সাধারণের চিত্ত জয় করিতে হইলে কেবল বক্তৃতার দ্বারা সুফল পাওয়া যাইবে না অশ্বিনীকুমার তাহা বিলক্ষণ জানিতেন। দেশবাসীর চিত্ত জয় করিতে হইলে সরল সঙ্গীত, জারী, যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগকে দেশের কথা শুনাইতে হইবে প্রথম যৌবনেই অশ্বিনীকুমার তাহা বিলক্ষণরূপে বুঝিতেন। তিনি তাঁহার “ভারতগীতি”তে দেশবাসীকে বলিয়াছিলেন—

ওরে দিনান্তরে দেশের দশা
একবারও ভাই না ভাবিলে।
দেশী তাঁতী কর্ম্মকারে, অনাহারে ভাতে মরে,
(তুমি) বিলাতী বিলাসের খোঁজে, কাল কাটালে।

বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে অশ্বিনীকুমার রাজনীতিকে ধর্ম্মনীতির উচ্চগ্রামে উন্নীত করিয়া সকলকে ধর্ম্মবোধে দেশমাতৃকার সেবা করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত—"অগ্নিময়ী মাগো আজি ডাকি সকলে মা," "একি এ বঙ্গে নব তরঙ্গে জীবন-স্রোত বহিছে আজ," "দুর্গতি নাশিনী জয়তি শ্রীদুর্গে" প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি লোকের মনে যুগপৎ ধর্ম্ম ও দেশাত্মবোধ জাগরিত করিয়া দেয়। আমরা জানি, অশ্বিনীকুমারের সকল কার্য্যের মূল-প্রস্রবণ ছিল ভগবদ্ভক্তি। তাঁহার অনুগামী যে-সকল ব্যক্তির যে-কোন দিকে শক্তি ছিল তিনি তাহা পুণ্যকর্ম্মে লাগাইবার জন্য সতত প্রচেষ্ট ছিলেন। এইজন্য তিনি গ্রামের লোকের সরল ভাষায় জারিওয়ালা মুসলমান দ্বারা স্বদেশী গান লিখাইলেন। ইহাদের গান শুনিয়া পল্লীর নিরক্ষর লোকগণ পরাধীনতার লাঞ্ছনা, উপাধির অসারতা বুঝিয়াছিল। বড় বড় ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞদের স্তোকবাক্য লোকসাধারণের মনে কি ভাবের উদ্রেক করে উহা জানাইবার জন্য জারিওয়ালা মফিজদ্দিন বয়াতি গাহিয়াছিলেন—

"এ দেবো, ও দেবো ব'লে
অবশেষে ভুজঙ্গিনীর পা দেখায়।"

লোক সাধারণের মনে স্বদেশীর ভাব মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য অশ্বিনীকুমার এই সময়ে শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস দ্বারা স্বদেশী যাত্রা রচনা করাইলেন। এই যাত্রা কেবল বরিশালবাসীর নহে, সমগ্র বঙ্গদেশবাসীর চিত্ত মাতাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামে এই সময়ে স্যর ব্যাম্‌ফাইল্ড্‌ ফুলার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে স্বদেশীদলনের জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিতেছিলেন। লাট্‌ ফুলার বরিশালবাসীকে ভীত করিবার জন্য সহরে গুর্খাসৈন্যের আমদানী করিয়াছিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, বরিশালবাসী গুর্খার দ্বারা নিরপরাধে পথে ঘাটে লাঞ্ছিত হইয়াও ভীত হইল না। স্বদেশী যাত্রায় অশ্বিনীকুমারের শিষ্য মুকুন্দ দাস বিদেশীকে শুনাইয়া দিলেন—

(বিদেশী) আর কি দেখাও ভয় ?
দেহ তোমার অধীন বটে, মন ত স্বাধীন রয় !
হাত বাঁধ্‌বে পা বাঁধ্‌বে ধরে না হয় জেলে দেবে,
মন কি ফিরাতে পারবে, এমন শক্তিময় ?

অশ্বিনীকুমারের ভাবরাজি তাঁহার শিষ্যরচিত সরল সঙ্গীতে অভিব্যক্ত হইয়া সমগ্র বরিশালবাসীকে অভয়, আশ্বাস ও আনন্দ দান করিতেছিল।

"কথকতা" লোকশিক্ষার একটি বিশিষ্ট উপায়। অশ্বিনী কুমারের অভিপ্রায়ে সুকবি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র কবিরত্ন কাব্য-বিশারদ বরিশালে নূতনভাবের "কথকতা" আরম্ভ করিয়া দেশ-কল্যাণ সাধন করেন।

সেই স্বদেশীর যুগেই অশ্বিনীকুমারের মতি ধ্বংসনীতি অপেক্ষা গঠননীতির দিকে বেশী ছিল। স্বাধীনতার পথে দ্রুতগতি অগ্রসর করিবার জন্য তিনি স্বদেশবাসীকে (১) স্বাস্থ্য (২) শিক্ষা (৩) স্বদেশী ও (৪) সালিশী এই চারিটি বিষয়ে স্বাবলম্বননীতি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেন। রাজনীতিক্ষেত্রে সম্ভবতঃ তিনিই স্বাবলম্বনমন্ত্রের প্রথম উপদেষ্টা। বরিশাল জিলায় অশ্বিনীকুমার 'স্বদেশবান্ধব-সমিতি' প্রতিষ্ঠা করিয়া যে তীব্র আন্দোলন চালাইয়াছিলেন তাহার ফলে ঐ জিলায় তিন কোটী টাকার বিলাতী বস্ত্রের বিক্রয় কমিয়া গিয়াছিল এবং বিলাতী মদের বায়ান্নটি দোকানের দুইটির মাত্র অস্তিত্ব ছিল।

বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন যে সাফল্য লাভ করিয়াছিল উহার বিশিষ্ট প্রমাণ এই যে, স্বদেশীর যুগে নিখিল বঙ্গের কেবল মাত্র বরিশাল জিলায় "কণ্ঠরোধের আইন" জারি করিয়া গভর্ণমেণ্ট এই জিলাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন।

যে কর্ম্মিদলের দ্বারা অশ্বিনীকুমার এতখানি সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন তাহাদের অসাধারণ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কর্ম্মকুশলতার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। স্বেচ্ছা-সেবকগণ হাটে বাজারে লোকের হাতে পায়ে ধরিয়া অনুনয় বিনয় করিয়াই বিলাতী দ্রব্যবর্জ্জনে তাহাদিগকে সম্মত করিতেন, কদাচ কাহারও উপর জুলুম করিতেন না। কেবল বিলাতী লবণ সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ইহারা

অসহিষ্ণুতা দেখাইয়াছেন বলিয়া মনে পড়ে। এই জন্য কয়েকটি কর্ম্মী অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডপ্রাপ্তও হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, সেই মহা উত্তেজনার দিনে ইহারা কর্ম্মক্ষেত্রে যে সংযম ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতেন তাহা স্মরণ করিয়া এখনও গর্ব্বে বুক ভরিয়া উঠে। কৃষ্ণকাঠি নামক এক গ্রামে স্বেচ্ছাসেবকদের প্রচেষ্টায় একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে সেখানে আসিবার পথ ছিল না, তখন স্বেচ্ছাসেবকেরা ও জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ নিজেদের হাতে মাটি কাটিয়া দুই হাত চওড়া, সাত মাইল লম্বা রাস্তা বাঁধিয়াছিলেন। স্বদেশীর যুগে স্বরূপকাঠী ও আমড়াজুড়ী অঞ্চলে বহুস্থলে স্বেচ্ছাসেবকগণ রাত্রিকালে আপনাদের গ্রামে পাহারা দিতেন। স্বেচ্ছাসেবকগণের প্রচেষ্টায় বহু গ্রামে সালিশী সভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

এই স্থলে একটি কথা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করা দরকার—অশ্বিনীকুমারের রাজনৈতিক আন্দোলন কদাচ আইনের সীমা লঙ্ঘন করিত না। গুপ্ত হত্যাদ্বারা আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া স্বাধীনতা লাভ করা যায় একথা তিনি কখনও মনে স্থান দিতেন না। তিনি ধার্ম্মিক, ধর্ম্মের পথ হইতে তিনি রেখামাত্র বিচ্যুত হইতেন না। তিনি ও তাঁহার শিষ্যগণ ভ্রমক্রমেও কোন দিন রাজদ্রোহ বা জাতিবিদ্বেষ প্রচার করেন নাই। বক্তারা বঙ্গবিভাগের ইতিহাস বিবৃত করিয়া লোক-

সাধারণকে বিলাতী কাপড়, বিলাতী লবণ, বিলাতী বিলাস-সামগ্রী বর্জ্জন করিয়া ভারত-জাত দ্রব্য ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেন। ইহার মধ্যে কোথায়ও বে-আইনী কিছু ছিল না। অনেক লোক বিলাতী দ্রব্যের ব্যবহার একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। একস্থলে পল্লীবাসী এক স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তি জনৈক বক্তাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"বাবু, আমার বাড়ীতে একটা বিলাতী আমড়ার গাছ আছে, সেটাকে কাটিয়া ফেলিব কি?" বক্তা বলিলেন, "না, উহা কাটিতে হইবে না, উহার নাম বিলাতী আমড়া হইলেও, গাছটা আমাদের এই দেশের মাটিতে জন্মিয়াছে—ওটা দেশী।"

বাকরগঞ্জ জিলায় বিলাতী মদ্য, কাপড় ও লবণের কাটতি কমিয়া যাওয়ায় রাজকর্ম্মচারীদের অবর্ণনীয় রোষ জন্মিয়াছিল। অথচ যিনি শিষ্যদল লইয়া এই কাণ্ড ঘটাইতেছেন তাঁহাকে বা তাঁহার শিষ্যদিগকে দণ্ড দিবার মত কোন অছিলা বা অজুহাত পাওয়া যাইতেছিল না। অবশেষে ম্যাজিষ্ট্রেট্ জ্যাক্ সাহেব একদিন অশ্বিনীকুমারের সহযোগী অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ, শিক্ষক শরৎকুমার রায়, ডাক্তার নিশিকান্ত বসু, উকীল শ্রীচরণ সেন ও উকীল পূর্ণচন্দ্র দে, পণ্ডিত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী প্রভৃতিকে স্বগৃহে ডাকিয়া ধমক্ দিয়া বলিলেন—"আপনাদের উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতায় লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, তাহাদিগকে আর কিছুতেই থামান' যাইতেছে না, আপনারা কিছু দিনের জন্য বক্তৃতা বন্ধ রাখুন।" অশ্বিনীকুমারের

সহযোগীরা জানাইলেন—"আমরা কদাচ উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করি না, লোককে বঙ্গবিভাগের কথা বুঝাইয়া দিয়া ভারতজাত বস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে বলি। আমরা যাহা বলি তাহা অবৈধ বা বে-আইনী নহে। আমরা অশ্বিনী বাবুর নির্দেশ অনুসারে বক্তৃতা করি, তিনি যদি বক্তৃতা করিতে নিষেধ করেন তাহা হইলে বক্তৃতা বন্ধ করিব, অন্যথা নহে।" ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইহাদের মধ্যে কোন কোন কর্ম্মীকে এমন কথাও বলিয়াছিলেন, "এখানে শান্তিরক্ষার জন্য গুর্খাসৈন্য আনয়ন করা হইয়াছে, তাহারা যদি আপনাদের উপর অত্যাচার করে ত আমি দায়ী হইতে পারিব না।" এই কথার উত্তরে ডাক্তার নিশিকান্ত বসু বলিয়াছিলেন, "আপনি যদি আমাদিগকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হন তবে আমাদিগকেই আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে।" দুর্ভাগ্যক্রমে এই ঘটনার পরদিনই উকীল শ্যামাচরণ দত্ত এবং ডাক্তার নিশিকান্ত বসু গুর্খাসৈন্যকর্ত্তৃক নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত ছয় জন ব্যতীত বরিশালবাসী আরও ষোল ব্যক্তি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট হইতে এই মর্ম্মে পরওয়ানা পাইয়াছিলেন যে, তাঁহারা কিছুকালের জন্য কোন সভায় বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। সেই যুগে নূতন বঙ্গে এমনই সব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিত। নিরক্ষর, নির্ম্মম, নির্ভীক গুর্খাসৈন্যগণ বরিশাল সহরে অতি নৃশংস ও বীভৎস অত্যাচার করিয়াছিল, তথাপি বরিশালের বাজারে বিলাতী কাপড় ও বিলাতী লবণের ক্রেতা ও বিক্রেতা পাওয়া যায় নাই। বরিশালবাসী লাঞ্ছিত

হইয়াও স্বদেশীর পুণ্যসাধনা হইতে রেখামাত্র ভ্রষ্ট হইল না।

অনন্যোপায় হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ বুলার সাহেব নূতন বাজার বসাইলেন। বিলাতী পণ্য বিক্রয়ের এই বাজার প্রতিষ্ঠার প্রসঙ্গে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছেন—"সরকারের মর্জ্জি হইলে স্থানেরও অভাব হয়না, টাকারও অকুলান হয় না। স্থান পাওয়া গেল, সারি সারি দোকান ঘর নির্ম্মিত হইল, এমন কি নহবতখানাও প্রস্তুত হইল। বুলার সাহেবের বাজারে কিছুরই অভাব ছিল না। অভাব ছিল কেবল ক্রেতা, বিক্রেতা ও পণ্যের। তামাসা দেখিতেও বরিশালের বালখিল্যেরা বুলারের বাজারে যায় নাই। সরকারের শক্তি অশ্বিনীকুমারের শক্তিদ্বারা এমনই প্রতিহত হইয়াছিল।" বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব অশ্বিনীকুমারের আদেশ ব্যতীত মায়ার সাহেবের জন্য এক গজ বিলাতী কাপড় ক্রয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন।

লাট্ ফুলার এক বক্তৃতায় মুসলমানদিগকে তাঁহার "সুয়োরাণী" অর্থাৎ 'আদরের ঘরণী' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্য এই যে, তাঁহার শাসনকালে ময়মনসিংহ জিলার জামালপুরে এবং কুমিল্লায় হিন্দুমুসলমানে যেরূপ ভীষণ দাঙ্গা হইয়াছিল ঐরূপ দাঙ্গা ঐ সকল অঞ্চলে পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। তখন এক দল লোক হিন্দুমুসলমানে বিরোধ বাধাইয়া স্বদেশী আন্দোলনটিকে ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করিত।

বরিশাল জিলায় এইরূপ বিরোধ ঘটাইবার চেষ্টা ঝালকাটী-বন্দরে ও ফুলঝুড়ীতে হইয়াছিল। ঢাকা হইতে একদল মৌলবী বরিশালে আসিয়াছিল। ঝালকাটীতে তাহারা মুসলমানদিগকে যাহা বলিয়াছিল উহার মর্ম্ম এই—"হিন্দুরা সকল কার্য্যে তোমাদিগকে ঘৃণা করে, তাহাদের সকল কাজই বিপরীত, তোমরা পশ্চিম মুখ হইয়া নামাজ কর,তাহারা পূর্ব্বমুখ হইয়া সন্ধ্যাপূজা করে। তোমরা কলাপাতায় যে পিঠে খাও, তাহারা তার বিপরীত পিঠে খায়। উহাদের সঙ্গে তোমরা কেন মিলেমিশে থাক ?" ইহার উত্তরে এক প্রবীণ মুসলমান বলিলেন—"দেখুন, হিন্দুরা আমাদের প্রতিবেশী, তাদের সঙ্গে বার মাস থাকি, বিপদে আপদে হিন্দুরা আমাদের পাশে দাঁড়ায়। দেখুন, আমার ক্ষেতে যে ধান হয় তাহা বেচি হিন্দুর কাছে, আমার ভাইর গরু কয়টার যে দুধ হয় তাহাও হিন্দুরাই কিনে, এই হিন্দুদের সঙ্গে বিবাদ করিলে আমরা বাঁচিব কি প্রকারে ?"

ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"ঢাকার নবাব বাহাদুর হুকুম দিলেন, তাহার একটা হাটে (বরিশাল জিলার) বিলাতী লবণ ও বিলাতী কাপড়ের দোকান বসিবে। কাহারও নিষেধ তিনি মানিবেন না। অশ্বিনীবাবুর হুকুমে অগত্যা নদীর অপর পারে, নূতন হাট বসিল। তখন বিলাতী সংস্পর্শ-দুষ্ট পুরাতন হাট নবাবের হুকুম বজায় রাখিতে গিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইল। সে অঞ্চলের অধিবাসীরা প্রায়

সকলেই মুসলমান। নবাবের কর্ম্মচারীরা প্রভুর হুকুম জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিল ; "কি আশ্চর্য্য তোমরা মুসলমান, তোমরা একটা হিন্দুর হুকুমে নবাবের হুকুম অমান্য কর ?" সরল কৃষকেরা হিন্দুমুসলমানের স্বার্থসংঘাতের খবর রাখে না। তাহারা সাম্প্রদায়িক ভেদবিরোধের ধার ধারে না। তাহারা জানে—অশ্বিনীবাবুই তাহাদের একমাত্র বন্ধু, তাহারা নির্ভয়ে জবাব দিল—"আপদে বিপদে রক্ষা করেন 'বাবু', আকালের (দুর্ভিক্ষের) সময়ে অন্ন পাঠাইয়া দেন তিনি। গ্রামে ওলাউঠা লাগিলে ঔষধ ও চিকিৎসক পাঠাইয়া দেন তিনি ; এত কাল ত কই, নবাব আমাদের কোন খোঁজ রাখেন নাই ; আজ তাঁহার হুকুমে 'বাবুর' মনে ব্যথা দিলে খোদা নারাজ হইবেন।" অশ্বিনীকুমার বাকরগঞ্জ জিলার হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের তুল্য-প্রিয় ছিলেন।

স্বদেশীর যুগে একসময়ে বরিশালবাসী জনমণ্ডলী মুসলমান আক্রমণের কাল্পনিক আতঙ্কে যেরূপ একপ্রাণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল উহাও অশ্বিনীকুমারের মণ্ডলীগঠনের সাফল্যের অমোঘ পরিচয় প্রদান করে। একদিন সন্ধ্যার পরে হঠাৎ বরিশালবাসী জনমণ্ডলী নগরের পশ্চিম পার্শ্বস্থ কাশীপুরের দিক্ হইতে একটা অস্বাভাবিক কোলাহল শুনিতে পাইল। জামালপুর ও কুমিল্লার মুসলমান গুণ্ডাদের বীভৎস অত্যাচার-কাহিনী স্মরণ করিয়া নগরবাসী আতঙ্কিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজেদের ধনপ্রাণ ও নারীদের সম্মান রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর

হইল। অত্যল্প কাল মধ্যে দুই সহস্র স্বেচ্ছাসেবক লাঠি, রামদাও প্রভৃতি হস্তে লইয়া গুণ্ডাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য কাশীপুরের অভিমুখে অগ্রসর হইল। একজন অশ্বপৃষ্ঠে তথ্যনির্ণয়ের জন্য ছুটিয়া গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ বুলার সাহেব নগরবাসীদের এই তুমুল চাঞ্চল্যের সংবাদ পাইয়া তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য কাশীপুরের পথে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি হঠাৎ স্বেচ্ছাসেবকদিগকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা দল বাঁধিয়া এই বেশে এসময়ে কোথায় যাইতেছ?" উত্তর হইল, "আত্মরক্ষা করিতে।" সাহেব বলিলেন—"আরে, তোমাদের ভয় কি, আমি আছি, আমিই তোমাদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত রহিলাম।" তাঁহারা বলিলেন—"সাহেব, আজ তোমার কথা শুনিব না, তোমার ইচ্ছা হয় ত কাল দণ্ড দিও, আজ আমাদের ইজ্জৎ রক্ষা করিতেই হইবে।"

ইহাদিগকে থামাইতে না পারিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বরিশালের আসল কর্ত্তা অশ্বিনীকুমারের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি আসিয়া গাড়ীর ছাদে দাঁড়াইয়া স্বেচ্ছাসেবকদিগকে নির্ভয়ে গৃহে ফিরিতে আদেশ করিবামাত্র তাঁহারা নীরবে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। দেড় ঘণ্টার মধ্যে সংবাদ আসিয়াছিল, মুসলমান গুণ্ডার আক্রমণভীতি সম্পূর্ণ অলীক।

বাঙ্গলা ভাষায় জনসাধারণের পাঠোপযোগী রাজনৈতিক সাহিত্য নাই। এই অভাব দূর করিবার জন্য অশ্বিনীকুমার

স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহার অনেক শিষ্যকে ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস, ইটালীর স্বাধীনতার ইতিহাস, আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাস, হাঙ্গেরীর ইতিহাস, আধুনিক জাপানের ইতিহাস, ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রের ইতিহাস, মারাঠা জাতির ইতিহাস, শিখজাতির ইতিহাস, রাজপুতদিগের ইতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

সমগ্র জিলায় এই স্বদেশী আন্দোলন পরিচালনার জন্য বিস্তর অর্থের প্রয়োজন হইত। আমরা জানি এই জন্য অশ্বিনীকুমার কখনও অর্থাভাব অনুভব করেন নাই। তখন জনসাধারণ স্বেচ্ছায় সাগ্রহে যে চাঁদা দিত উহাতেই এই আন্দোলনের ব্যয় চলিয়া যাইত। ঝালকাঠী বন্দরের ব্যবসায়ীরা তখন টাকা প্রতি অর্দ্ধপয়সা "বন্দেমাতরং বৃত্তি" তুলিয়া সেই অর্থ কয়েক বৎসর প্রদান করিয়াছিলেন। স্বদেশীযুগে বরিশাল সহরে দুইবার জিলা কন্‌ফারেন্সের অধিবেশন হইয়াছিল। প্রথমবারের সভায় বরিশালবাসীর আহ্বানে স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত কৃষ্ণকুমার মিত্র, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, ডাক্তার গফুর প্রভৃতি দেশনায়কগণ উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার গফুর স্বদেশ-বান্ধব-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের সহিত বরিশাল জিলার কয়েকটি গ্রামে গমন করিয়া স্বদেশী প্রচার করিয়াছিলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে স্বদেশভক্ত অশ্বিনীকুমারকে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্ট কি চক্ষে দেখিতেন স্যর

ব্যাম্‌ফাইল্ড্‌ ফুলারের লিখিত একখানি পত্রে পাঠকগণ উহার পরিচয় পাইতে পারেন। কর্ম্মত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাইবার পূর্ব্বে তিনি অশ্বিনীকুমারকে স্বদেশী আন্দোলন ত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়া নিম্নলিখিত পত্রখানি লিখিয়াছিলেন—

GOVERNMENT HOUSE,

Shillong, 14-8-1906.

DEAR SIR,

Before leaving India I must write to beg of you, for your country's sake, to take the opportunity, that my resignation affords, of abandoning a position of hostility to the British Government which must be fraught with evil consequences. It has been a matter of deep regret to me that you should have taken so prominent a stand in opposing a Government which only needs the co-operation of leaders of the people to benefit the country very greatly; I have been hoping all along that you would re-consider your position. For you are, I am aware, not one of those who render to their country lip-service only. To the cause of education you have devoted practical and successful effort, remembering that philanthropy is shown by deeds. I beg that you will reflect upon the situation and upon the harm, which the

agitation is causing to the youth of your people, and emphasise the self-denial you have practised in the past—an act of renunciation. which, however distasteful to you, will be for the lasting benefit to those whose interest you have at heart.

Yours truly,
(Sd) Bamfyide Fuller.

লাট্‌ ফুলার সাহেবের এই চিঠিখানি অশ্বিনীকুমারের অজ্ঞাতসারে কোন ব্যক্তি "অমৃতবাজার পত্রিকায়" প্রকাশার্থ পাঠাইয়াছিলেন। পত্রখানি প্রকাশিত হইলে অশ্বিনীকুমার অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"এখানি ব্যক্তিগত পত্র, ইহা এইভাবে প্রকাশিত হওয়ায় লাট্‌ ফুলার আমাকে অত্যন্ত অভদ্র মনে করিবেন।"

যে আন্দোলন দ্বারা অশ্বিনীকুমার শত শত যুবকের অন্তরে স্বদেশসেবার পবিত্র আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিলেন, লাট্‌ ফুলার মনে করিতেন সেই আন্দোলন দ্বারা অশ্বিনীকুমার গভর্ণমেণ্টের সহিত শক্রতা করিতেছেন এবং যে স[illegible]কের কল্যাণ সাধন করিতে তিনি অভিলাষী এই [illegible]-দ্বারা তিনি যেন তাহাদেরই অনিষ্ট করিতেছেন। [illegible] বিচার করিয়া অশ্বিনীকুমার স্বদেশী আন্দোল[illegible] করিয়া গভর্ণমেণ্টের সহায়তা করেন, ইহাই লাট্‌ সা[illegible] অনুরোধ।

বলা বাহুল্য অশ্বিনীকুমার এই অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই। তিনি অতি সুস্পষ্ট বাক্যে স্যর ব্যাম্‌ফাইল্ড্‌ ফুলারকে জানাইয়াছিলেন—“গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে আমি কোন প্রকার শত্রুতার ভাব পোষণ করি না। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের যে সকল কার্য্য আমার মতে অন্যায় আমি সেই সকল কার্য্যের প্রতিবাদ না করিয়া পারি না।”

বরিশালে প্রাদেশিক সমিতি

১৯০৬ অব্দে বরিশাল সহরে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। এই সমিতিতে যোগদানার্থ গমন করিয়া বঙ্গের স্বদেশসেবক শ্রেষ্ঠপুরুষগণ রুষ্ট রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারা রাজপথে‘বন্দেমাতরং’ ধ্বনি করিবার কাল্পনিক অপরাধে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। এইজন্য এই সমিতির স্মৃতি এখনও রক্তাক্ষরে বাঙ্গালীর মনে মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র বঙ্গে তখন যে উত্তেজনার স্মৃষ্টি হইয়াছিল সেই উত্তেজনা হইতেই বাঙ্গালীর নবজীবনের ধারা প্রাচীন পন্থা পরিহার করিয়া নূতন পথে প্রধাবিত হইয়া দেশবাসীর মনে দেশাত্মবোধের সঞ্চার করিতে আরম্ভ করে।

১৯০৫ অব্দে ময়মনসিংহ সহরে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে বাকরগঞ্জ জিলার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে বাগ্মী শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন পরবর্ত্তী বর্ষের অধিবেশন বরিশাল সহরে আহ্বান করেন। তখন হইতেই অশ্বিনী-কুমার এই সভার সাফল্যের উপায় চিন্তনে ব্যাপৃত হইলেন।

তিনি স্থির করিলেন, দরিদ্র বরিশাল জিলাবাসীদের বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যে সভার অধিবেশন হইবে উহাকে তিনি 'দুই তিন দিনের তামাসা' হইতে দিবেন না। এই উপলক্ষে তিনি বরিশাল জিলার প্রত্যেক পল্লীতে প্রাদেশিক সমিতির বার্ত্তা প্রচার করিতে অভিলাষী হইলেন। বর্ষাকালেই তিনি বরিশাল সহরে এক জনসভার অধিবেশন করিয়া পঁয়ত্রিশ জন প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে লইয়া এক কমিটি গঠন করেন। বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটীর সভাপতি উকীল রজনীকান্ত দাস মহাশয় সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভ কাল হইতেই অশ্বিনীকুমার তাঁহার বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়কে গ্রামে গ্রামে স্বদেশী গ্রহণ ও বিদেশী বর্জ্জনের কথা প্রচারের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত কমিটি তাহার প্রতি প্রাদেশিক সমিতির কথা প্রচারের ভারও অর্পণ করেন। এইজন্য শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য নামক অপর এক জন প্রচারকও নিযুক্ত হন। প্রচারকদ্বয় গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া পল্লীবাসী জনমণ্ডলীকে দেশের বাণী শুনাইয়া প্রাদেশিক সমিতির কথা জানাইতে লাগিলেন। কয়েকমাস মধ্যে বাকরগঞ্জ জিলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র প্রাদেশিক সমিতি ও স্বদেশীর মঙ্গলমন্ত্র প্রচারিত হইল। যাহাতে পল্লীর দরিদ্রতম ব্যক্তিও প্রাদেশিক সমিতির উদ্দেশ্য অবগত হইয়া এই সমিতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ তাহার সাধ্যানুরূপ যৎকিঞ্চিৎ

অর্থ প্রদান করে, তৎপক্ষে যথাসম্ভব চেষ্টা করা হইল। বরিশাল প্রাদেশিক সমিতি যাহাতে বাস্তবিকই বরিশাল জিলাবাসী জনমণ্ডলীর সমিতি হয় তজ্জন্য যথোচিত চেষ্টার ত্রুটী হইল না। এই প্রাদেশিক সমিতিকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তির সভা বলিবার উপায় রহিল না। অশ্বিনী-কুমার কেবল প্রচারক পাঠাইয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। বঙ্গব্যবচ্ছেদ, স্বদেশী এবং প্রাদেশিক সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অতি সরলভাষায় পুস্তিকা লিখিয়া তিনি দুইবার বহু সহস্র পুস্তিকা প্রচার করিলেন। অতঃপর শারদীয় পূজাবকাশ সময়ে অশ্বিনীকুমার তাঁহার সহযোগী শিক্ষক ও উকীলদিগকে লইয়া নানাদিকে সমিতির বাণী প্রচার করিয়া অর্থসংগ্রহার্থে বাহির হইলেন। অশ্বিনীকুমার বাটাজোড়, গৈলা, বাকাল প্রভৃতি অঞ্চলে অদম্য উৎসাহসহকারে সকলকে প্রাদেশিক সমিতির মঙ্গলকর উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ করেন। বাকরগঞ্জ জিলার অধিবাসীরা শিক্ষিত যুবকদের মুখে স্বদেশী ও প্রাদেশিক সমিতির বাণী শ্রবণ করিয়া অভূতপূর্ব্ব ভাবে অভিভূত হইল। সকলেই মহা উৎসাহের সহিত প্রাদেশিক সমিতির সাহায্যকল্পে সাধ্যানুরূপ অর্থ সাহায্য করিতে লাগিল।

১৯০৬ অব্দের প্রারম্ভে বাকরগঞ্জ জিলার নানাস্থানের চাঁদাদাতা এবং উৎসাহী কর্ম্মীদিগকে লইয়া বরিশাল নগরে এক বিরাট্ জনসভার অধিবেশন হয়। সভায় অশ্বিনী-

কুমার অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি, উকীল রজনীকান্ত দাস মহাশয় সম্পাদক বৃত হন। প্রাদেশিক সমিতি-সংক্রান্ত কার্য্যাবলীকে (১) সংবাদ ও লিপি (২) মণ্ডপ ও বাসস্থান (৪) খাদ্যদ্রব্য ও সরবরাহ (৫) অভ্যর্থনা এই কয়েক ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক বিভাগের ভার উপযুক্ত সহকারী সম্পাদকগণের উপর অর্পিত হইল। ব্রজমোহন কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র স্বেচ্ছা-সেবকদলের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন।

সকলকেই অবগত আছেন যে, এই সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্টে বিদ্যার্থীদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যে কতকগুলি সার্কুলার জারি করিয়াছিলেন। এদিকে সঙ্কল্পিত মহাসভার কার্য্যসাধনের জন্য বহু স্বেচ্ছসেবকদের দরকার। ছাত্রদিগকে এই কার্য্যে গ্রহণ না করিলে উপযুক্ত-সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক কোথায় পাওয়া যাইবে? সমিতির উদ্যোক্তারা এক মহা সমস্যায় পতিত হইলেন।

পুরুষসিংহ অশ্বিনীকুমার তখন দৃঢ়কণ্ঠে প্রকাশ করিলেন—"কোন ছাত্র যদি নিজের ইচ্ছায় স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হইতে চাহে আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কলেজের ছাত্রগণ স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করিলে আমার কলেজের যদি কোন অনিষ্ট হয়, এমন কি কলেজ যদি উঠিয়াও যায় আমি তাহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত হইব না।" অশ্বিনীকুমারের এই

অভয়বাণী প্রচারিত হইবার পর দলে দলে ছাত্র স্বেচ্ছাসেবক হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা তিন শত হইল।

১৮৯৫ অব্দ হইতে বঙ্গদেশের নানা নগরে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসু, গুরুপ্রসাদ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেব, মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, জগদীন্দ্রনাথ রায়, আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বঙ্গের সুসন্তানগণ সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এত বৎসরমধ্যেও কোন বিশিষ্ট মুসলমান এই সভার সভাপতির পদে বৃত হন নাই। অশ্বিনীকুমার কোন বিশিষ্ট মুসলমানকে এই পদে বরণ করিবার অভিলাষী হইলেন। অশ্বিনীকুমার আমরণ হিন্দুমুসলমান মিলনমন্ত্রের প্রচারক ছিলেন। বহুবর্ষপূর্ব্বে তিনি তাঁহার রচিত "ভারতগীতি" পুস্তিকায় স্বদেশী সঙ্গীত দ্বারা হিন্দু-মুসলমান সকলকে জাতিভেদ বিস্মৃত হইয়া মাতৃভূমির সেবায় আহ্বান করিয়াছেন। কলিকাতার নেতাদের অভিমত গ্রহণ করিয়া অভ্যর্থনা সভা কলিকাতা হাই-কোর্টের ব্যারিষ্টার আবদুল রসুল সাহেবকে সভাপতি মনোনীত করেন। ১৯০৬ অব্দের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল (বাঙ্গলা ১৩১৩ সালের ১লা ও ২রা বৈশাখ) প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনের তারিখ নির্দ্ধারিত হয়। এই সমিতির জন্য আট সহস্র লোকের উপযোগী একখানি সুবৃহৎ সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

বঙ্গের প্রত্যেক জিলা হইতে বহুসংখ্যক প্রতিনিধি বরিশাল কন্‌ফারেন্সে যোগদান করিবার জন্য সাগ্রহে আগমন করিয়াছিলেন।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের শাসনকর্ত্তা ফুলার সাহেব আদেশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার শাসিত প্রদেশে কোন ব্যক্তি প্রকাশ্য পথে 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি করিতে পারিবে না। যাহাতে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন সময়ে লাট্ সাহেবের এই আদেশ লঙ্ঘন করা না হয় তজ্জন্য বরিশালের ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইমারসন্ সাহেব অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি অশ্বিনীকুমার ও অপর নেতৃবর্গের নিকট এই প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়াছিলেন যে, আগন্তুক প্রতিনিধিদিগকে নদীর পাড় হইতে অভ্যর্থনা করিয়া লইবার সময়ে রাজপথে শোভাযাত্রা কিংবা 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি করা হইবে না। বলা বাহুল্য একান্ত ক্ষোভে ও দুঃখে নেতৃবর্গ এই সর্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন।

১৩ই এপ্রিল রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময়ে নারায়ণগঞ্জ এবং খুলনা এই দুই মেইল ষ্টীমারে নানাদিক্‌দেশ হইতে বহু শত প্রতিনিধি বরিশাল নগরে উপস্থিত হন। প্রাদেশিক সমিতির সভাপতি ব্যারিষ্টার রসুল সাহেব, তাঁহার পত্নী, দেশপূজ্য সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, ভূপেন্দ্রনাথ, সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় ও ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জিলার বহু প্রতিনিধি এবং এণ্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ এই একই সময়ে আসিয়াছিলেন। দুই ষ্টীমারের

প্রতিনিধিগণ মহোল্লাসে "বন্দেমাতরং" ধ্বনি করিয়া নৈশ গগন ও নদীবক্ষঃ আলোড়িত করিয়া তুলিতেছিলেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমারের ইঙ্গিতে নদীকূলে সমবেত বিরাট্ জনসঙ্ঘ উহার প্রতিধ্বনি না করিয়া নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া রহিল।

ইহাতে দুঃখিত হইয়া উপস্থিত প্রতিনিধিগণের অনেকেই বলিলেন, "আমরা তীরে অবতরণ করিয়াই রাজপথে বন্দেমাতরং ধ্বনি করিব।' তখন অশ্বিনীকুমার এবং বরিশাল নগরের অপর প্রতিনিধিগণ ষ্টীমারে গমন করিয়া জানাইলেন, অভ্যর্থনাকালে রাজপথে 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি উচ্চারিত হইবে না, আমরা ম্যাজিষ্ট্রেট্কে এই প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হইয়াছি। তীরে নামিয়া আপনারা 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি করিলে পুলিশ লাঠি চালাইতে পারে এবং উহাতে বহু অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে। সুরেন্দ্রনাথ এই সমস্ত অবগত হইয়া প্রতিনিধিদিগকে 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি উচ্চারণে বিরত হইতে অনুরোধ করেন।

কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের এই অনুরোধে এন্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ এবং কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় প্রাণে এমন বেদনা পাইয়াছিলেন যে,তাঁহারা অভ্যর্থনাসভার আতিথ্যগ্রহণ না করিয়া অধ্যক্ষ রজনীকান্ত গুহ মহাশয়ের ভবনে গমন করেন। তাঁহারা সেই রাত্রে কেহই অন্নগ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ক্রন্দন করিয়া রাত্রি যাপন করেন।

সেইদিন রাত্রিকালে রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে এক বিরাট্ সভায় সভাপতি রসুল সাহেব এবং সমাগত প্রতিনিধিগণ মহা সমারোহে অভিনন্দিত হন। সভাস্থলে প্রায় দশ মিনিটকাল অবিশ্রান্ত 'বন্দেমাতরম্'ধ্বনি করিয়া সেই বিরাট্ জনসভা তাহাদের মনের আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং এন্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন—"রাজপথে 'বন্দেমাতরং' উচ্চারণ-নিষেধ-মূলক আদেশ আইনসঙ্গত নহে সুতরাং সেই আদেশ প্রতিপালন করা অন্যায়। রাজপথে 'বন্দেমাতরং' উচ্চারণ করিতেই হইবে।" বস্তুতঃ প্রতিনিধিগণের অনেকেই উক্ত মত পোষণ করিতেন। এই জন্য সভার অধিবেশনদিনে অশ্বিনীকুমারপ্রমুখ বরিশালের নেতৃগণ সুরেন্দ্রনাথ ও অপর প্রতিনিধিদিগকে জানাইলেন—"ষ্টীমারঘাটে শোভাযাত্রা ও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করা হইবে না, ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আমরা এই অঙ্গীকারেই আবদ্ধ ছিলাম। উহা প্রতিপালিত হইয়াছে। প্রতিনিধিগণ অভ্যর্থিত হইয়াছেন। এখন প্রাদেশিক সমিতি-সংশ্লিষ্ট কোন কার্য্যের জন্য অভ্যর্থনাসভা আর দায়ী নহেন। প্রতিনিধিগণ যদি বরিশালের রাজপথে 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি উচ্চারণ করা সঙ্গত মনে করেন, বাকরগঞ্জবাসিগণ উহাতে আনন্দসহকারে যোগদান করিবেন।" অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হয়,—'যে আদেশ আইনসঙ্গত নহে তাহা প্রতিপালন করা অনাবশ্যক। বেলা দুই ঘটিকার

সময়ে প্রতিনিধিগণ রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে সমবেত হইবেন, সেখান হইতে সভাপতির অনুগমন করিয়া 'বন্দেমাতরং' উচ্চারণ করিতে করিতে সকলে সভামণ্ডপে উপস্থিত হইবেন।' প্রতিনিধিগণের এই সিদ্ধান্ত ঘরে ঘরে প্রচারিত হইল—এই সিদ্ধান্ত অবগত হইয়া পুলিশপক্ষ অশ্বিনীকুমারপ্রমুখ নেতৃবর্গের নিকট এই প্রস্তাব পাঠাইলেন—"আপনারা শোভা-যাত্রা করিয়া সভাপতির অনুগমন করুন, কিন্তু রাজপথে যেন 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি করা না হয়।" নেতৃগণ ইহাতে অসম্মত হইলে আবার এই এক প্রস্তাব প্রেরিত হইল,—"রাজাবাহাদুরের হাবেলী হইতে কলেজ পর্য্যন্ত নীরবে গমন করিয়া সেখান হইতে 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি করুন।" নেতৃগণ উহাতেও সম্মতি প্রকাশ করিলেন না।

অতঃপর যখন এন্টিসার্কুলার সোসাইটির পনর জন সভ্য দুই ঘটিকার সময়ে দলবদ্ধ হইয়া রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে প্রবেশ করিতেছিলেন তখন পুলিশ সাহেব মিষ্টার কেম্প্ তাহাদের গতিরোধ করিয়া হস্তস্থিত যষ্ঠিদ্বারা সোসাইটির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্গুলিতে আঘাত করিয়া রক্তপাত করিল। কৃষ্ণবাবু ইহার প্রতিবাদ করিলে পুলিশ সাহেব উহাদিগকে হাবেলীতে প্রবেশ করিতে দিল। যথাসময়ে শৃঙ্খলভাবে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রতিনিধিগণ রাজা-বাহাদুরের হাবেলী হইতে সভামণ্ডপে যাত্রা করিলেন। প্রথমে এক শকটে পত্নীসহ সভাপতি মহোদয় এবং শ্রীযুক্ত আব্দুল

হালিম গজনভী সাহেব। তাঁহার পশ্চাতে সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, ভূপেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, কাব্যবিশারদ, ব্রহ্মবান্ধব, অশ্বিনীকুমার, হীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বঙ্গজননীর কৃতী পুত্রগণ শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিতে লাগিলেন।

যখন সভাপতি মহাশয়ের শকট লোন আফিসের প্রায় সমীপবর্ত্তী হইল এবং তাঁহার পশ্চাতে সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ প্রায় একশত প্রতিনিধি নীরবে রাস্তার একপার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন তখন হাবেলী হইতে এন্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ শৃঙ্খলা-বদ্ধভাবে রাজপথে বাহির হইলেন। যেমন তাঁহারা বাহির হইলেন অমনি অশ্বারোহী সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ হেইনস্ সাহেব তাঁহাদের উপর অশ্ব চালাইয়া দিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ কেম্প্ সাহেব তাঁহাদের গমনে বাধা দিল এবং শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুর বক্ষ হইতে 'বন্দেমাতরং' মন্ত্রাঙ্কিত উত্তরীয় কাড়িয়া লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল। শচীন্দ্রপ্রসাদ হস্তদ্বারা বক্ষঃ আবৃত করিয়া উত্তরীয় রক্ষার চেষ্টা করিলেন। তখন কেম্প্ সাহেব শচীন্দ্রপ্রসাদকে ঘুসি মারিল। সাহেবের এই দৃষ্টান্ত দেখিয়া সুবেদার বাবুরাম সিং "শালা লোককো মারো, হুকুম হুয়া" এই বলিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল, অমনি কনষ্টেবলদিগের দীর্ঘ বংশযষ্ঠি প্রতিনিধি-গণের উপর পতিত হইল। পুলিশের অত্যাচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রতিনিধিগণ নীরব ছিলেন, কিন্তু যখন দেশভক্ত সন্তানের রক্তে ধরণী রঞ্জিত হইল তখন চতুর্দ্দিক্

হইতে ভীমনাদে'বন্দেমাতরং'ধ্বনি উত্থিত হইল। এন্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণের একজনও পলায়ন করেন নাই, তাঁহারা ভীষণ প্রহার খাইয়াও মহোৎসাহে মায়ের নাম করিতে লাগিলেন। আত্মরক্ষার জন্য যাহাদের হস্তে কিছুই ছিল না এমন মাতৃভক্ত সন্তানদিগকে পুলিশেরা নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতে লাগিল ; তাহারা প্রহার করিতে করিতে কয়েক জনকে রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বস্থ নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিল। সোসাইটির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতাকে কনেষ্টবলেরা প্রহার করিতে করিতে রাস্তার পূর্ব্ব পার্শ্বের পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল। চিত্তরঞ্জন যখন জল-মধ্যে দণ্ডায়মান তখনও পুলিশ তাহাকে প্রহার করিতেছিল। ঐ অবস্থায়ও চিত্তরঞ্জন ঊর্দ্ধমুখ হইয়া বলিতেছেন—'বন্দেমাতরং'। চিত্তরঞ্জন এই নির্য্যাতন বর্ণনা করিয়া স্বয়ং বলিয়াছেন—"অবশেষে আমার শরীর অবশ হইয়া আসিল, আমি পৃথিবী শূন্যময় দেখিতে লাগিলাম, মনে হইল বুঝি আর মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার প্রাণ বিয়োগ হইবে।" চিত্তরঞ্জন তাঁহার পিতা মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মহাশয়কে বলিয়াছিলেন—"বাবা,এই অবস্থায়ও পুলিশ আমাকে যতবার প্রহার করিয়াছে আমি ততবারই 'বন্দেমাতরং' বলিয়াছি। এইরূপ অবস্থায় এক কনেষ্টবল, চীৎকার করিয়া বলিল—"মৎমারো, মর্ যায়েগা," প্রহার থামিল। এক কনেষ্টবল চিত্তরঞ্জনকে হাত ধরিয়া উপরে তুলিল।

চিত্তরঞ্জনকে যখন পুলিশেরা প্রহার করিতেছিল তখন

কলিকাতা নগরের অন্যতম প্রতিনিধি বাবু ললিতমোহন ঘোষাল চীৎকার করিয়া বলিলেন—"মনোরঞ্জন বাবুর ছেলেকে মারিয়া ফেলিল।" ব্যস্ত হইয়া অগ্রগামী প্রতিনিধিগণ পশ্চাতে ফিরিলেন। ওদিকে হাবেলীর ভিতরে যে সকল প্রতিনিধি ছিলেন তাহারা বাহির হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে অশ্বারোহী হেইন্‌স সাহেব তাঁহাদের উপর ঘোড়া চালাইয়া দিতে লাগিল। কনেষ্টবলেরা লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে হাবেলীর ফটকের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সেখানে নহবতের নিম্নে কয়েকটা লণ্ঠন ঝুলিতেছিল, পুলিশের লাঠিতে তাহা চূর্ণ হইয়া গেল। পুলিশ যখন ফটকের সম্মুখে লাঠি চালাইতেছিল তখন শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, কৃষ্ণনগরের শ্রীযুক্ত বেচারাম লাহিড়ী, অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয় হাবেলী ও রাজপথের সংযোজক সেতুর উপর আসিলেন। পুলিশ বেচারামবাবু ও রজনীবাবুকে প্রহার করিল। বেচারামবাবু অজ্ঞান হইয়া ভূপতিত হইলেন। ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে পুলিশ এমন সাংঘাতিকরূপে প্রহার করিল যে, তাঁহার মাথা ফাটিয়া গেল, তিনি ধরাশায়ী হইলেন। এই সময়ে কৃষ্ণকুমারবাবু স্থবেদার বাবুরাম সিংকে ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন এবং কেম্প্‌ সাহেবের হাত ধরিয়া টানিয়া আহত ব্রজেন্দ্রলালকে দেখাইলেন। কৃষ্ণকুমার বাবু বলিলেন—"তোমার পুলিশ গুণ্ডার ন্যায় ব্যবহার করিতেছে, ইহাদিগকে থামাও, নতুবা আজ মহাবিপদ্ হইবে।" একটা কনেষ্টবলের গলা ধরিয়া কৃষ্ণকুমার বাবু বলিলেন, "এই

কনেষ্টবল হাবেলীর ফটকে গিয়া প্রতিনিধিদিগকে প্রহার করিয়াছে, আমি তাহা দেখিয়াছি।” কেম্প্‌ সাহেব বলিল—ইহার নাম শ্রীশচন্দ্র দে, আমি ইহাকে গ্রেপ্তার করিলাম। পরক্ষণেই কনেষ্টবল দলে মিশিয়া গেল। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কেম্প্‌ সাহেবকে বলিলেন, “এই কনেষ্টবলগুলি তোমার অধীন, ইহাদিগকে তুমি থামাও।” কেম্প্‌ সাহেব কিঞ্চিৎ উষ্ণ হইয়া বলিল—“আমার কর্ত্তব্য আমি জানি।” পুলিশ বহু প্রতিনিধিকে প্রহার করিল—কেহ কেহ গুরুতররূপে, অনেকে সামান্যরূপে আহত হইলেন। অবশেষে বিউগেল বাজিয়া উঠিল, অমনি পুলিশদল হাবেলীর সম্মুখস্থ রাস্তায় দণ্ডায়মান হইল।

যে স্থলে কৃষ্ণকুমার বাবু ও যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর সহিত কেম্প্‌ সাহেবের কথোপকথন হইতেছিল সুরেন্দ্রনাথপ্রমুখ নেতৃগণ তথায় উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ পুলিশ সাহেবকে বলিলেন—“তোমার পুলিশ এই সকল লোককে প্রহার করিতেছে কেন? ইহাঁরা কোন অন্যায় করেন নাই। তুমি যদি মনে কর ইহাঁরা অন্যায় করিয়াছেন, ইহাঁদিগকে গ্রেপ্তার কর। আমি সকল দায়িত্ব নিজে লইতে প্রস্তুত আছি। তুমি ইচ্ছা করিলে আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পার।” উত্তরে কেম্প্‌ সাহেব বলিল—“আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।” সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—“আমি হাজির আছি।” তখন অমৃত-বাজার পত্রিকার সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক মতিলাল ঘোষ,ভূপেন্দ্রনাথ

বসু এবং অশ্বিনীকুমার বলিলেন—"আমাদিগকেও গ্রেপ্তার কর।" কেম্প্ সাহেব বলিল—"একমাত্র সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ আমি পাইয়াছি।" কেম্প্ সাহেব সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের বাড়ী যাত্রা করিল। অশ্বিনীকুমার, জমিদার বিহারীলাল রায় এবং কাব্যবিশারদ মহাশয় তাঁহার অনুগমন করিলেন। কেম্প্ সাহেব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ম্যাজিষ্ট্রেট্ ইমারসনের গৃহমধ্যে লইয়া গেল, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি বাড়ীর দ্বারদেশে শকটমধ্যে রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে এক চাপরাশী আসিয়া অশ্বিনীকুমার ও বিহারীবাবুকে ম্যাজিষ্ট্রেটের বসিবার ঘরে লইয়া গেল। তাঁহারা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিবা মাত্র ইমারসন্ সাহেব বরিশাল সহরের এই দুই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে চীৎকার করিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—"বাহির হও, তোমাদের মাথায় টুপী নাই।"—ধুতিচাদরপরা অশ্বিনী-কুমার বলিলেন—"ইহাই যে আমার জাতীয় পরিচ্ছদ।" বিহারী বাবুর টুপীটা হাতে ছিল, তিনি উহা দেখাইয়া বলিলেন—"এই ত আমার টুপী।" কিন্তু কে আর কথা শুনে? রুদ্রাবতার ইমারসন্ সাহেব ক্রমাগত বলিতেছিলেন—"বাহির হইয়া যাও।" তাঁহারা এইরূপে অপমানিত হইয়া বাহিরে আসিলেন। তাঁহাদের সঙ্গী কাব্যবিশারদ মহাশয় একখানি পরদার আড়ালে বাহিরে ছিলেন। তাঁহার পরিধানে ছিল কাষায় বস্ত্র, গলে ছিল গৈরিক উত্তরীয়, দেহ সম্পূর্ণ অনাবৃত, তাঁহাকে দেখিয়া ইমারসন্ সাহেব বিকট স্বরে—"বাহির হও, বাহির হও" বলিয়া চীৎকার

করিতে লাগিলেন। তিন জনই লাঞ্ছিত হইয়া চলিয়া আসিলেন।

ইহার পরে বিচার প্রহসন চলিল। সুরেন্দ্রনাথ ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৮৮ ধারার অপরাধী স্থিরীকৃত হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহাকে দুই শত টাকা জরিমানা করিলেন। বিচারাভিনয় শেষ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ হঠাৎ সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন—""This is disgraceful.' "ইহা লজ্জাজনক"। সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"I protest against such a remark, a remark of this kind ought not to come from the Court." অর্থাৎ "আমি আপনার এইরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদ করিতেছি, বিচারা-দালত হইতে এইরূপ মন্তব্য হওয়া উচিত নহে।" ইমারসন্ সাহেব ভীম গর্জ্জনে বলিলেন—"Keep quiet, this is contempt of Court, I draw up contempt proceedings against you." অর্থাৎ "চুপ কর, এতদ্দারা আদালত অবজ্ঞা করা হইতেছে, আমি তোমার বিরুদ্ধে আদালত অবজ্ঞার মামলা রুজু করিতেছি।" উত্তরে সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন—"I have done nothing. Do just as yon please." অর্থাৎ "আমি কোনরূপ অন্যায় করি নাই, আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।" তৎক্ষণাৎ বিচার হইয়া গেল, সুরেন্দ্রনাথকে পুনরায় অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া ইমারসন্ সাহেব দুই শত টাকা জরিমানা করিলেন। এই সময়ে ইমারসন্ সাহেবের এক সিবিলিয়ান বন্ধু অস্ফুটস্বরে তাঁহাকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিলেন। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য

ক্রুদ্ধ ইমারসন্ সাহেবের বুদ্ধির গোড়ায় তখন একটু জল আসিল। তিনি যেন একটু খানি নরম হইয়া বলিলেন—"I give you an opportunity to apologise." 'আমি আপনাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিবার সুযোগ দিলাম।' বুদ্ধিদাতাও বলিয়া উঠিলেন, "You ought to take this opportunity and apologise." "এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।" দৃঢ়চিত্ত সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "I respectfully decline to apologise. I have done nothing wrong." "আমি ক্ষমা স্বীকার করিতে সবিনয়ে অস্বীকার করিতেছি। আমি কোন দোষ করি নাই।" বিচার-প্রহসন এইখানে শেষ হইল। সুরেন্দ্রনাথ পুলিশ সাহেবের দ্বারা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট জরিমানার চারিশত টাকা পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ সহজে ছাড়িয়া দিবার পাত্র নহেন। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের এই অন্যায় বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করেন। সরকার হইতে ১৮৮ ধারার মামলা তুলিয়া লইয়া জরিমানার টাকা ফেরত দেওয়া হইয়াছিল। হাইকোর্ট প্রকাশ করেন—"We can not find any justification for the proceedings for the contempt of Court in the circumstances of the case." "এই মামলার ঘটনাবলীর মধ্যে আমরা আদালত অবমাননার কোন প্রমাণ পাইতেছি না।" হাইকোর্ট ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, সুরেন্দ্রনাথকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটই অন্যায়

করিয়াছিলেন। এই জন্য হাইকোর্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ বাতিল করিয়া জরিমানার টাকা ফেরত দিবার হুকুম দিয়াছিলেন।

যে সকল প্রতিনিধি পুলিস-কর্ত্তৃক নির্ম্মমভাবে প্রহৃত হন তাঁহাদের মধ্যে ব্রজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, ফণিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা বহুকষ্টে থানার এজাহার দিয়া সরকারী ডাক্তারখানার ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা আহত স্থান পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট্ লইলেন।

বন্দী সুরেন্দ্রনাথের সহিত অশ্বিনীকুমার, বিহারীলাল ও কাব্যবিশারদ মহাশয় ম্যাজিষ্ট্রেটের ভবনে গমন করেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এদিকে পুলিশের প্রহার খাইয়াও প্রতিনিধিগণ রণজয়ী সৈন্যের মত মহোল্লাসে নির্ভয়ে 'বন্দেমাতরং' রবে দিঙ্‌মণ্ডল নিনাদিত করিয়া সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। অশ্বিনীকুমার অনুপস্থিত ছিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁহার লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিয়া প্রতিনিধিদিগকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

অশ্বিনীকুমারের অভিভাষণ

অভ্যর্থনাসভা এবং বাকরগঞ্জ জিলার পক্ষ হইতে আমি আপনাদিগকে সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। এতকাল পরে আমরা যে আপনাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিতে পারিলাম

এজন্য আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। বঙ্গবিভাগের পরে এই জিলার উপর দিয়া যে সমস্ত কঠোর অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, এই জিলা যেরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াছে, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় নিরাশায় অভিভূত হয় সত্য কিন্তু আবার এই কারণেই সমগ্র বঙ্গের অধিবাসিগণকে আমাদের আহ্বান করা কর্ত্তব্য, কেননা তাহাদের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ অভিন্ন।

এই সমিতির অধিবেশন দেখিবার জন্য যিনি নিরতিশয় ব্যগ্র ছিলেন সেই স্বর্গীয় প্যারীলাল রায় মহাশয়ের মৃত্যুবেদনা আমরা অদ্য বিশেষভাবে অনুভব করিতেছি। স্বর্গীয় চৌধুরী আস্‌মতালী খাঁ সাহেব ও স্বর্গীয় রোহিণীকুমার রায় চৌধুরীর মৃত্যুতেও আমরা শোকসন্তপ্ত। তাঁহারা জীবিত থাকিলে অভ্যর্থনাসভা নিঃসন্দেহ অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হইত।

"আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে এমন কিছুই অধুনা বরিশালে নাই। তবে আপনারা যেস্থানে মিলিত হইয়াছেন এই স্থান ইতিহাসবিশ্রুত চন্দ্রদ্বীপ পরগণার অন্তর্গত। চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের বীরোচিত কার্য্যকলাপ আপনারা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু আজ আর তাহার কিছুই নাই। আপনাদের সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য আমরা যে অকিঞ্চিৎকর বন্দোবস্ত করিয়াছি তাহা দ্বারা বিচার করিলে আমাদের সহৃদয়তার অভাব অনুভূত হইবে সত্য, কিন্তু আমাদের সরলতা

এবং আন্তরিকতা দ্বারা বিচার করিলে নিশ্চিতই আমরা পরীক্ষোত্তীর্ণ হইব।

অদ্য বাকরগঞ্জের পক্ষে বিশেষ স্মরণীয় দিন। জননী জন্মভূমির নামে আজ বহুসংখ্যক বিখ্যাত ব্যক্তি এস্থানে সমবেত হইয়াছেন এবং একজন অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এই মহতী সভার সভাপতি হইবেন। মুসলমান ভ্রাতৃগণ শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন, এরূপ আশা করি।

আমি বিশ্বাস করি যে, প্রতিকূল অবস্থার ভিতরেও এবার আমরা অতি সুসময়েই এই সভায় সম্মিলিত হইয়াছি। কোটি কোটি বাঙ্গালীর সনির্ব্বন্ধ প্রতিবাদ উপেক্ষা করিয়া বঙ্গদেশ দ্বিধা বিভক্ত করা হইয়াছে। পূর্ব্ব-পশ্চিম উভয় বঙ্গ, বিশেষভাবে পূর্ব্ববঙ্গ এই বিভাগের কুফল ভোগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্গবিভাগের পরে যে অবিশ্বাস ও অত্যাচারমূলক শাসননীতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহাতে রাজশক্তির প্রতি প্রকৃতিপুঞ্জের বিশ্বাসের ভিত্তি শিথিল হইতেছে। এ সমস্তই নিরাশাব্যঞ্জক সত্য, কিন্তু অমঙ্গল হইতে মঙ্গল প্রসূত হয়। এই সমস্ত ঘটনার ভিতর দিয়া যে নবজীবনের সূচনা হইয়াছে তাহা বাঙ্গালীর অশেষ কল্যাণ সাধন করিবে। প্রভুত্বগর্ব্বে যাঁহারা জাতিবিশেষের শুভাশুভকে ক্রীড়ার সামগ্রী করিতে চাহেন, আমাদের সমস্ত ব্যাপার যাঁহারা বিজাতীয় উচ্চপদাভিষিক্ত ব্যক্তি-দিগের খেয়ালের সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন, এতকাল পর্য্যন্ত আমরা স্বীয় নিয়তি বিস্মৃত হইয়া, তাঁহাদেরই হস্তে আত্মসমর্পণ

করিয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলাম। কিন্তু যিনি বঙ্গদেশ, অথবা কেবল বঙ্গদেশই বা বলি কেন, সমগ্র ভারতবর্ষ স্বীয় অভিপ্রায়ানুসারে পুনর্গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন, বিংশশতাব্দীর সেই ভীষণ দাম্ভিক ব্যক্তির কঠোর আঘাতে অবশেষে আমাদের চৈতন্য হইয়াছে। জগদীশ্বরের আশীর্ব্বাদ এই সুপ্ত জাতির উপর বর্ষিত হইয়াছে। সমগ্র বঙ্গদেশ জাগরিত হইয়াছে। বঙ্গদেশ কেন, নিখিল ভারতবর্ষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া অচিরেই আত্মশক্তি বলে স্বীয় নিয়তি নির্দ্ধারণ করিয়া লইবে। আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি যে, মহত্তর কার্য্যের জন্য ভগবান্ আমাদিগকে নিঃসন্দেহ নিযুক্ত করিবেন।

সময়ের গতি যিনি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছেন তিনিই স্বীকার করিবেন যে, আমাদের জন্মভূমির মহত্ত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্বলাভের সময় আগতপ্রায়। ব্রিটিশসম্রাটের অধীনে থাকিয়া ভারতবর্ষ যেদিন পৃথিবীর স্বাধীন জাতিসমূহের মধ্যে আসন লাভ করিবে সেদিন অদূরে। পূর্ব্ব গৌরব এবং মহত্ত্বলাভের উপায় বিস্মৃত হইয়া যখন ভারতবর্ষ দিন দিন অধঃপতিত হইতেছিল, তখন সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বর ভারতবর্ষকে অপর একটি শক্তিশালী জাতির সংস্পর্শে আনিয়া দিয়াছেন। এই উন্নতশীল জাতি আত্মশক্তি বলে বিভিন্ন দিকে অদ্ভুত উন্নতি লাভ করিয়াছে এবং অধুনা সমগ্র পৃথিবীর প্রধান জাতিসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। স্বনামধন্য মহৎ ব্যক্তিদিগের যত্ন ও চেষ্টায় এই উভয় জাতির এই সম্মিলন যে বাঞ্ছিত ফল লাভ করিয়াছে

তাহা কে অস্বীকার করিবে? ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরবের প্রতি আমাদের ভক্তি ও ভালবাসা কি এখন জাগিয়া উঠে নাই? সমসাময়িক ইতিহাস পাঠ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে একটি শক্তিশালী জাতি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার আকাঙ্ক্ষা কি আমাদের হৃদয়ে জাগরিত হয় নাই? যুগযুগান্তরের জড়তা ত্যাগ করিয়া দেশ-হিতকর কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে কি আমরা আরম্ভ করি নাই? কুসংস্কার এবং মূর্খতার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ভারতজননীর নামে আমরা কি এদেশের বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন দৃঢ় করিতে চেষ্টা করিতেছি না? ভগবানের আশ্চর্য্য বিধান লক্ষ্য করুন, সমগ্র দেশ, সমস্ত চিন্তা নব আদর্শ এবং নব আকাঙ্ক্ষায় উদ্বোধিত হইয়াছে। রাজকর্ম্মচারিগণের অত্যাচার ও অবিচারে এই জীবনস্রোত অধিকতর বেগে প্রবাহিত হইবে। সর্ব্বজাতির ভাগ্যবিধাতার ইঙ্গিতে যে স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, পৃথিবী কোন শক্তিই সে স্রোতে বাধা দিতে পারিবে না বলিয়া আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি।

এই সময়ে, এই জাতীয় অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে, উন্নতির উপায় নির্দ্ধারণের জন্য যুক্তবঙ্গের প্রতিনিধিগণ বরিশাল মিলিত হইয়াছেন, এজন্য আমি বিশেষ আনন্দ অনুভব করিতেছি। আপনাদের সম্মুখে এখন জাতিগঠনের সমস্যা উপস্থিত।

আমার বিবেচনায় জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশীয় শিল্পের সৃষ্টি ও উন্নতি এবং সালিশী আদালতগঠন প্রভৃতি কার্য্যই এই জাতীয় উন্নতির ভিত্তিভূমি হওয়া কর্ত্তব্য।

জাতীয় শিক্ষার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি সর্ব্বাগ্রে পতিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী হইতে আমরা বহু উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি। এই শিক্ষা আমাদিগকে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক স্বার্থ বিস্মৃত হইয়া জাতীয় স্বার্থ চিন্তনে উদ্বোধিত করিয়াছে। কোন জাতিই যে কেবল পরপদলেহন করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না, তাহাও এই শিক্ষাই আমাদের হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। শিক্ষা ও শিল্পের আবশ্যকতা এবং যে সমস্ত উদার নীতি দ্বারা জাতীয় উন্নতি সম্ভব হয় তাহাও এই শিক্ষাই আমাদিগের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে। কিন্তু যতদিন এই সমস্ত নীতি আমরা আত্মশক্তিবলে জাতীয়ভাবে গ্রহণ করিতে না পারিব, ততদিন আমাদের অভ্যুত্থান দূরে থাকুক, আমাদের যাহা কিছু মনুষ্যত্ব আছে তাহাও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে রক্ষা করিতে সমর্থ হইব না। আমাদিগের আদর্শ এবং জীবনের উদ্দেশ্য প্রতীচ্য জাতির আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র। যে-সমস্ত রীতিনীতি প্রাচ্য প্রকৃতি গঠন করে তাহা প্রতীচ্য রীতিনীতি হইতে বিভিন্ন। বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী দ্বারা এই পার্থক্যের বোধ আমাদের মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠে না। শিক্ষার্থীরা কি ভারতীয় অধ্যাত্মবিদ্যায় ও ভারতীয় ইতিহাসে শিক্ষিত হয়? প্রাচীনকালের ঋষি এবং সাধুগণকর্ত্তৃক প্রচারিত অবিনশ্বর সত্যের উপাদানে গঠিত ভারতীয় জীবনের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করা আধুনিক শিক্ষকগণের পক্ষে অসম্ভব। প্রাচীন

উপাদান লইয়া নূতন জীবন গঠন করা এই সমস্ত শিক্ষকদিগের পক্ষে সম্ভব কিনা বলিতে পারি না। আত্মশক্তি-দ্বারা আমাদিগকে প্রতীচ্য জগৎ হইতে নূতন জ্ঞান আহরণ করিয়া তাহা প্রাচীনের সহিত মিশাইয়া ভারতভূমির প্রত্যেক সমাজ, প্রত্যেক গৃহ ও প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত করিতে হইবে। আমাদের আকাঙ্ক্ষিত মহাজাতি সংগঠন করিবার জন্য মাতৃভূমির নামে সকলকে সমবেতভাবে কার্য্য-সাধনে আহ্বান করিতে হইবে, এরূপ করিতে পারিলেই জাতীয় শিক্ষা ফলপ্রসূ হইবে। জাতিসংগঠনকারী কোন মহাজন বলিয়াছেন—"জাতীয় শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতিই নৈতিক উন্নতি করিতে পারে না, একমাত্র জাতীয় শিক্ষার উপরই জাতীয় হিতাহিত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।" এজন্যই দেশের সর্ব্বপ্রকার অভাব পূরণ করিবার অভিপ্রায়ে এরূপ সার্ব্বভৌমিক জাতীয় শিক্ষার উদ্যম আমরা আনন্দের সহিত অভিনন্দন করিতেছি।

ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি বিধান করা যাইতে পারে এরূপ কোন জাতীয় উপায় উদ্ভাবন আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা। যে ভারতের ঐশ্বর্য্য এক সময়ে সমগ্র জগতের হিংসার বিষয় ছিল, যে ভারতের উৎপন্ন দ্রব্য সকল এককালে প্রাচ্য জগতের গৌরব ঘোষণা ও প্রতীচ্য জগতের অভাব পূরণ করিত, সেই ভারতবর্ষের অধিবাসিগণ এখন অন্নবস্ত্রের চিন্তায় আকুল। ভারতীয় শিল্পের অধঃপতনের শোচনীয় বৃত্তান্ত সর্ব্বজনবিদিত। প্রায় দুই কোটিগজ ম্যাঞ্চেষ্টার-জাত বস্ত্র প্রতি বৎসর ভারত-

বাসীর লজ্জা নিবারণ জন্য আমদানী হইয়া থাকে। যে বাকরগঞ্জ বঙ্গদেশের 'শস্যভাণ্ডার' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, এখন সেখানে এক বৎসর অজন্মা হইলেই অন্নের জন্য চিন্তিত হইতে হয়। যাহা হউক, সমস্ত প্রদেশেই শিল্প-বিজ্ঞানের উন্নতির চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে। তন্তুবায়গণ অতি অল্পকাল হইল তাহাদের পৈতৃক ব্যবসায় পুনঃ গ্রহণ করিয়াছে। যাহারা ইতঃপূর্ব্বে বিদেশী বস্ত্রের প্রচলনে উৎপীড়িত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছিল, বর্ত্তমানকালে তাহারা আশার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অচিরেই তাহাদের পরিশ্রমজাত বস্ত্র বিদেশী বস্ত্রের সমকক্ষতা লাভ করিবে এই আশায় তাহারা উৎফুল্ল। বস্ত্রবয়নের যে সমস্ত কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে হইবে সেইগুলি এবং ভারতবর্ষের এক কোটি দ্বাদশ লক্ষ তন্তুবায় এদেশের ত্রিশ কোটি অধিবাসীর প্রয়োজনীয় বস্ত্র যোগাইবার পক্ষে কি প্রচুর নহে? কিন্তু কেবল তন্তুবায় সম্প্রদায়ই বা বলি কেন, সম্ভ্রান্ত এবং উচ্চবংশোদ্ভব ব্যক্তিগণও এক্ষণে সন্তানদিগকে বয়ন ও রঞ্জন প্রভৃতি শিল্পবিদ্যা শিক্ষাদান করিতেছেন।

আপনারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, এই সহরের অনেক ভদ্রলোক আপনাদের গৃহে বয়নযন্ত্র স্থাপন করিয়াছেন এবং তাহাদের পুরাঙ্গনাগণ আনন্দের সহিত বয়নকার্য্যে সাহায্য করিতেছেন। শিল্পশিক্ষার এই চেষ্টা ভগবৎপ্রেরিত এবং আমি বিশ্বাস করি অচিরেই ইহা দ্বারা আমাদের সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইবে। বাকরগঞ্জের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র জিলার

ছয় সাতখানি গ্রাম হইতে দুই মাসে প্রায় দুই হাজার টাকা মূল্যের নিব প্রস্তুত করা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? ইহা কি স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপকতা ও সফলতার পরিচায়ক নহে? এই তো মাত্র আরম্ভ। এই উত্তম সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবার চেষ্টা করা কি আমাদের কর্ত্তব্য নহে? জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার জন্য, স্বদেশী আন্দোলনের শুভ সংবাদ দেশের সর্ব্বত্র প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে, আমাদের শিল্পের উন্নতিপথের অন্তরায়—রক্ষণশীলতা ও নিরুদ্যম পরিহারের শিক্ষা দিবার নিমিত্ত, আদর্শ শিল্পবিদ্যালয়সমূহ সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠার্থ, চিরদিনের রীতি অনুসারে ধন গৃহে গচ্ছিত না রাখিয়া নানারূপ কলকারখানা প্রভৃতি স্থাপনকল্পে আমাদের দেশের ধনীদিগকে উদ্বোধিত করিবার জন্য এবং সর্ব্বোপরি বহু যৌথ কারবার স্থাপনের উদ্দেশ্যে দেশের লোকদিগকে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত বহু প্রচারক নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র এই সমস্ত উপায় দ্বারাই দেশীয় শিল্পবিজ্ঞানের উন্নতি সম্ভব।

ইহার পর সালিশী সভাস্থাপন বিষয়ে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। জাতীয় শক্তি-প্রতিষ্ঠার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই। অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এই দেশের প্রত্যেক গ্রামে ‘মোড়ল’ বা পঞ্চায়েত সভা ছিল। এই পঞ্চায়েত সভা বা মোড়লগণ গ্রামবাসীদের ছোটখাট বিবাদগুলি মীমাংসা করিয়া দিতেন এবং সমাজের এমন শাসন ছিল যে, প্রত্যেক ব্যক্তিই এরূপ মীমাংসা অবনত মস্তকে গ্রহণ

করিতে বাধ্য হইত। গ্রামবাসিগণের সমবেত শক্তি এখন অতীতের কাহিনী। যে জনশক্তি এই গ্রাম্যসমাজের মূল ভিত্তি ছিল তাহা নানা কারণে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এখন আর গ্রামের কেহই অভিযোগ মীমাংসার জন্য পঞ্চায়েতের উপর নির্ভর করে না। দুষ্কর্ম্মকারিগণ এক্ষণে স্বচ্ছন্দে লজ্জাভয়হীন হইয়া গ্রামে বাস করে। পুরাতন বিদায় লইয়াছে, গ্রাম্যসমিতি লোপ পাইয়াছে। এখন লোক জেদের বশবর্ত্তী হইয়া আইন-আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। আইনআদালতের ব্যয়বাহুল্যে কত লোক যে সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সমস্ত অশুভ নিবারণ এবং জাতীয় শক্তি প্রতিষ্ঠার জন্য বর্ত্তমান সময়ের উপযোগী করিয়া সেই প্রাচীন সালিশী-বিচারপ্রথা পুনঃপ্রবর্ত্তন কি আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্য নহে? ইহা দ্বারা আমরা আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হইব। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনের আর উপায় নাই। সালিশী আদালত গঠিত হইলে জাতীয় শক্তির বিকাশ হইবে। এজন্য আমি অনুরোধ করিতেছি যে, প্রত্যেক জিলার সালিশী সভা গঠিত হউক। সমাজের বন্ধন এমন দৃঢ় করা হউক যে,ইহার শাসনে যাহারা অবাধ্য তাহাদিগকেও এই সমস্ত সভার মীমাংসা অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হইবে। আপনারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে, বাকরগঞ্জে ইতোমধ্যেই এই কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে এবং গ্রামের লোকসমূহ সালিশী সভার সুফল বিশেষভাবে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বর্ত্তমানকালে বিশেষভাবে যে ব্যাপার আমাদের হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে আমি এখন সেই বঙ্গবিভাগের কথা বলিব। এই ব্যাপারের স্মৃতিও আমাদের পক্ষে ক্লেশকর। ভারত-সচিব বলিয়াছেন যে, বঙ্গবিভাগ আন্দোলন হ্রাস হইয়াছে, এ 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা'। ভগবান্ জানেন, আমরা কি কষ্ট পাইতেছি। আমি মিঃ জন মর্লীকে(এখন লর্ড্) জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তিনি কি আশা করেন যে, এইরূপ একটা ব্যাপারের কারণ বিদূরিত না হইলে সভ্য জগতের কুত্রাপি আন্দোলন হ্রাস হইতে পারে? এরূপ ব্যাপারে ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড বা আয়ার্লণ্ড কোন স্থানেই আন্দোলন হ্রাস হইত বলিয়া তিনি কি আশা করিতে পারেন? একদল আত্মম্ভরী ও অত্যাচারী ব্যক্তি কোন এক বৃহৎ জাতির হৃদয়ে বেদনা দিয়া, তাহাদের সামাজিক, নৈতিক, শিক্ষাবিষয়ক এবং বাণিজ্যব্যবসায়সংক্রান্ত সর্ব্বপ্রকার স্বার্থে প্রচণ্ড আঘাত করিয়া অবশেষে নির্লজ্জের ন্যায় জাতীয় প্রতিবাদকে অল্পসংখ্যক আন্দোলনকারীর তথাকথিত প্রতিবাদ বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন। পৃথিবীর কোন স্থানের লোকই কি এই উপেক্ষা ধীরভাবে সহ্য করিত? অপর যে-কোন জাতিই এরূপ অবস্থায় তুমুল গোলযোগ উপস্থিত করিয়া শাসনযন্ত্র পরিচালন অসম্ভব করিয়া তুলিত। শান্তশিষ্ট বঙ্গবাসীর ধৈর্য্য অপরিসীম। কিন্তু তথাপি বাঙ্গালীর এই বোধ আছে যে, তাহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের বীজ নিহিত রহিয়াছে। বঙ্গদেশ ভাগ করায় বঙ্গবাসীর যে ক্ষতি ও অপমান হইয়াছে তাহা বাঙ্গালী কখনও

বিস্মৃত হইবে না। যে পর্য্যন্ত বিভক্ত বঙ্গ যুক্ত না হইবে সে পর্য্যন্ত এ বেদনা বঙ্গবাসীর হৃদয়ে জাগরূক রহিবে। যে দিন লর্ড্ কর্জ্জনের তরবারি বঙ্গ-জননীর হৃদয় দ্বিধা বিভক্ত করিয়াছে সেই চিরস্মরণীয় ১৬ই অক্টোবর (১৯০৫) বঙ্গবাসী কি ভগবানের নামে শপথ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করে নাই যে, বঙ্গবিভাগের কুফল নাশ এবং বাঙ্গালী জাতির একতা রক্ষা করিতে বঙ্গবাসী যথাশক্তি চেষ্টা করিবে? সে প্রতিজ্ঞা কি এত শীঘ্র, ছয় মাস গত না হইতেই, বঙ্গবাসী বিস্মৃত হইয়াছে? তাহাদের পক্ষে কি এ প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হওয়া সম্ভব? কখনই না। জাতীয় শক্তির বলে এই প্রতিজ্ঞা বৎসরের পর বৎসর দৃঢ়তর হইবে এবং পরবর্ত্তী বংশধরগণ বাঞ্ছিত সুদিন লাভের আশায় পূর্ব্ববর্ত্তিগণ অপেক্ষা, অধিকতর আগ্রহের সহিত আন্দোলন পরিচালনা করিয়া গৌরব অনুভব করিবে।

বঙ্গবিভাগহেতু যে অসন্তুষ্টি ও অসহিষ্ণুতার লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে তাহা কি হ্রাস হইবার কোন চিহ্ন দেখা যাইতেছে? স্যর্ ব্যাম্‌ফাইল্ড্ ফুলার তীব্র অত্যাচারমূলক শাসননীতি প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, তাহাতে অত্যাচারিত ব্যক্তি ক্রমে শান্তভাব ধারণ করিবে ইহা কি স্বাভাবিক? শোকাতুর ব্যক্তিকে কঠোর শাসন করিলে তাহার হৃদয়ের বেদনা দূর করিবার আশা করা যায় কি? কিন্তু স্যর্ ব্যাম্‌ফাইল্ড্ এই নীতিই অনুসরণ করিয়াছেন। "কোন জাতিই আইনদ্বারা শাসিত হয় না, পাশবিক শক্তিদ্বারা ত নয়ই।" লাট্ ফুলার তাঁহার দেশবাসী জনৈক

প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতকর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত রাজনীতির এই প্রথম সূত্রেই বিস্মৃত হইয়াছেন ! যখন বঙ্গদেশ গভীর শোকাচ্ছন্ন তখন তিনি গুর্খা সৈন্য ও পিউনিটিভ্ পুলিশ স্থাপন, স্পেশাল্ কনেষ্টবল সম্প্রদায় গঠন, প্রকাশ্যস্থানে পবিত্র "বন্দেমাতরং" উচ্চারণ নিষেধ, ছাত্রদিগের পক্ষে রাজনৈতিক ব্যাপারে এবং জনসাধারণ সভায় যোগদান নিষিদ্ধ প্রভৃতি আইন জারি করিলেন। যাহার ধমনীতে একবিন্দু শোণিত প্রবাহিত হয় সে কি এ অবস্থায় হৃদয়ের ভাব চাপিয়া রাখিতে পারে ? এ চণ্ড নীতির ফল কি হইয়াছে ? বঙ্গবিভাগের ফলেই এ সমস্ত হইতেছে বলিয়া লোকসাধারণের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মিতেছে। এরূপ ধারণা অসন্তুষ্টির ভাব সংযত, না বৃদ্ধি করিবে ? আমাদের দুঃখকাহিনী শ্রবণ করিবার জন্য পৃথিবীতে কেহ নাই, ভারতীয় প্রজার স্বার্থ সম্বন্ধে ইংরেজ জাতি সম্পূর্ণ উদাসীন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে ক্রমাগত প্রতিনিধি প্রেরিত হওয়া সত্ত্বেও মিঃ হারবার্ট রবার্টস্, স্যর হেন্‌রী কটন ও অপরাপর ভারতবন্ধুগণ পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্যদিগের বিন্দুমাত্র মনোযোগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইতেছেন না ; এই বিশ্বাস পূর্ব্বোক্ত ধারণার সহিত মিলিত হইলে অসন্তুষ্টির ভাব বৃদ্ধি কি হ্রাস হইবে ?"

স্যর হেন্‌রী কটনের বক্তৃতার একস্থলে "বিহার" শব্দ শুনিয়া পার্লামেণ্টের কোন সভ্য ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পার্শ্বস্থ অপর একজন সভ্যকে বলিয়াছিলেন, "বিহারের কথা কি হইতেছে ?" তদুত্তরে ঐ সভ্য বলিলেন "ভগবান্ জানেন কি বলিতেছে, চল

আমরা ধূমপনের গৃহে যাইয়া এক পেয়ালা মন্ত্র পান করি।” ভারতবর্ষের সম্বন্ধে এই দারুণ ঘৃণাব্যঞ্জক ভাব কে সহিতে পারে? বঙ্গদেশ মৃত নহে। এরূপ তাচ্ছিল্য এবং ঘৃণার ভাব বঙ্গদেশ সহ্য করিবে না—করিতে পারে না। ফাঁকা আশার কথা বা ওজর আপত্তিতে আর বঙ্গবাসী ভুলিবে না। ন্যায় এবং বিধিসঙ্গত ভাবে বঙ্গবাসী আন্দোলন চালাইবে ও প্রাণপণে বিলাতী পণ্য বর্জ্জন করিতে কিছুতেই নিরস্ত হইবে না। গভীর নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে, জাতীয় অভ্যুত্থানের সূত্রপাত হইয়াছে। সুকুমারমতি বালকগণের প্রতি অত্যাচারেও বঙ্গবাসী ভীত হইবে না। “যত অত্যাচার তত সাহস—ইহাই উত্তম নীতি।” বঙ্গবাসী ইমার্সনের এই বাক্য অনুসরণ করিয়া জয়লাভ করিবে।

উপসংহারে আমি আপনাদিগকে পুনরায় সাদরে অভিনন্দন করিতেছি। আমি আশা করি যে, এই সভায় আপনাদের আলোচনার ফলে শত শত প্রচারক বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রেরিত হইবেন এবং দেশের রাজনীতি, শিল্পবাণিজ্য, সামাজ-নীতি এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য প্রত্যেক জিলায় স্থায়ী বন্দোবস্ত হইবে।

অতঃপর মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় সভাপতি-বরণ প্রসঙ্গে এমন এক অগ্নিময়ী বক্তৃতা করেন যে, তাহা শুনিয়া সভাস্থ সহস্র সহস্র ব্যক্তি ক্রোধে ও ক্ষোভে উন্মত্তবৎ হইয়াছিলেন। বক্তৃতামধ্যে তিনি বলিয়াছিলেন—“এতদিন ইংরাজের আইন ও ন্যায় বিচারের প্রতি লোক সাধারণের

অবিচলিত শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু অত্য যে ব্যাপার সংঘটিত হইল তাহা দেখিয়া ঐ ধারণা লোকের মন হইতে বিদূরিত হইল।”

সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুলিখিত, সুচিন্তিত বক্তৃতায় বঙ্গব্যবচ্ছেদের তীব্র প্রতিবাদ ও স্বদেশীর সমর্থন করিয়া এই আন্দোলনে মুসলমানদিগকে হিন্দুদের সহিত মনোপ্রাণে যোগদানের জন্য আহ্বান করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—“হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতি অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। আমরা এক জননী জন্মভূমির সন্তান এবং আমাদের রাজনৈতিক স্বার্থ হিন্দুর সহিত অভিন্ন। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ব্যাপারে আমাদের স্বার্থ এবং চীন, তুরস্ক ও জাঞ্জিবার দেশীয় মুসলমানদিগের স্বার্থ এক হইতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলনে আমরা আমাদের স্বদেশীয় হিন্দু ও খৃষ্টানদের সহযাত্রী।” সভাপতি মহাশয়ের বক্তৃতাপাঠ শেষ হইলে—অমৃতবাজার পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক মতিলাল ঘোষ মহাশয় প্রস্তাব করেন—

যেহেতু অত্য দিবালোকে সমস্ত সহরের লোকের সম্মুখে, ডিষ্ট্রীক্ট্ ও আসিষ্টাণ্ট্ ডিষ্ট্রীক্ট্ পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আদেশে সভাপতি রসুল সাহেবের অভ্যর্থনার জন্য সমবেত প্রতিনিধিগণের উপর পুলিশ যেরূপ লাঠি চালাইয়াছে এবং দেশের অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বিনা কারণে যেরূপে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে তাহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বরিশাল জিলায় আইনসঙ্গত শাসন লুপ্ত হইয়াছে। অধিকন্তু পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম বিভাগের নানাস্থানে লোক

স্বদেশসেবার জন্য প্রহৃত ও নানারূপে লাঞ্ছিত হইতেছে তাহা দেখিয়া এই সমিতি বিশ্বাস করেন যে, এদেশে আর বৈধ শাসন-প্রণালী প্রচলিত নাই। সুতরাং বর্ত্তমান দায়িত্বশূন্য গভর্ণমেণ্টের উপর যে সকল কার্য্যের ফলাফল নির্ভর করে, এই বর্ষের সমিতি তৎসমুদায়ের আলোচনা হইতে বিরত থাকিয়া কেবল মাত্র দেশের লোকের আত্মশক্তির উপর যে সমস্ত কার্য্যের ফলাফল নির্ভর করে সেই সমস্ত বিষয়েরই আলোচনা করিবে।

'সন্ধ্যা' পত্রিকার সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ও 'হাওড়া-হিতৈষীর' সম্পাদক পণ্ডিত গীষ্পতি রায় কাব্যতীর্থ প্রভৃতি মহাশয়গণের সমর্থনে উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের আলোচনা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সুরেন্দ্রনাথ সভামধ্যে প্রবেশ করেন। সকলে দণ্ডায়মান হইয়া মুহুর্ম্মুহু 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা করেন। সুরেন্দ্রনাথ মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইলে, সহস্র সহস্র লোক আসন ত্যাগ করিয়া যাইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিল। তাঁহাকে দেখিবার, তাঁহার কথা শুনিবার জন্য সকলে উৎকণ্ঠিত হইল। প্রায় দশমিনিটকাল 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি উচ্চারিত হইবার পরে সভা যখন নিস্তব্ধ হইল তখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অগ্নিময়ী বক্তৃতায় বিদেশজাত পণ্যদ্রব্য বর্জ্জনের জন্য মাতৃভূমির নামে সকলকে কঠোর প্রতিজ্ঞা করাইলেন।

বাঙ্গলা তেরশত তের সালের প্রথম দিন বঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক চিরস্মরণীয় দিন। এই দিন বরিশালের রাজপথে

বঙ্গের মাতৃভক্ত সন্তানগণ পুলিশের দীর্ঘ বংশদণ্ডের প্রহারে নির্য্যাতিত হন, এইদিন বঙ্গবাসীর রাজনৈতিক গুরু ও স্বদেশীর প্রবীণ পুরোহিত সুরেন্দ্রনাথ কেম্প্ ও ইমারসন্ সাহেব কর্ত্তৃক বিনা কারণে লাঞ্ছিত হন এবং এইদিন সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, মতিলাল, ব্রহ্মবান্ধব, মনোরঞ্জন প্রভৃতি বঙ্গজননীর প্রসিদ্ধ সন্তানগণের মর্ম্ম হইতে আত্মনির্ভর ও আত্মশক্তির বাণী উত্থিত হইয়া বঙ্গের রাজনীতিক আন্দোলনকে নূতন আকার দান করে।

এই দিন ম্যাজিষ্ট্রেটের ভবন হইতে স্বদেশী পরিচ্ছদ পরিধান করিবার কাল্পনিক অপরাধে লাঞ্ছিত হইয়া অশ্বিনীকুমার প্রতিজ্ঞা করেন যে, জীবনে কখনও বিদেশী পোষাক পরিধান করিবেন না। তাঁহার এই প্রতিজ্ঞা একদিনের জন্যও লঙ্ঘিত হয় নাই। রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি বহুদিন হইতে স্বাবলম্বন মন্ত্র প্রচার করিয়া আসিতেছিলেন, এই দিন হইতে আরও দৃঢ়তার সহিত উক্ত মন্ত্রসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। প্রাদেশিক সমিতির দ্বিতীয় দিনে সর্ব্বপ্রথমে এই প্রস্তাব করা হয় যে, যেখানে সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে ঐস্থলে এক স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ করা হউক। অতঃপর যথাক্রমে বঙ্গব্যবচ্ছেদ, জাতীয়-শিক্ষা, বিলাতী বর্জ্জন সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপিত, অনুমোদিত ও পরিগৃহীত হয়। বিলাতী দ্রব্যবর্জ্জনের প্রস্তাবটি সভাপতি মহাশয় স্বয়ং উত্থাপন করেন। সুরেন্দ্রনাথ ঐ প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া উপসংহারে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে প্রতিজ্ঞায়

আবদ্ধ করেন। সেই বিশাল জনসঙ্ঘ দণ্ডায়মান হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন—

"জগদীশ্বর ও জন্মভূমির নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা সাধ্যমত বিদেশী দ্রব্য পরিত্যাগ এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব। ভগবান্ আমাদের সহায় হউন।" সুরেন্দ্র-নাথ প্রথমে এক একটি শব্দ উচ্চারণ করেন, পরে দণ্ডায়মান ব্যক্তিগণ তাহা পুনরুচ্চারণ করেন। এইরূপে প্রতিজ্ঞার সমস্ত শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়া সকলে 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি করিয়া আসন গ্রহণ করেন।

সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতান্তে বিলাতী বর্জ্জন প্রসঙ্গে মৌলভী আবুল হোসেন, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও কাব্যবিশারদ মহাশয় বক্তৃতা করেন। কাব্যবিশারদ মহাশয়ের বক্তৃতা শেষ হইবার পূর্ব্বে কেম্প্ সাহেব, অপর এক শ্বেতাঙ্গ এবং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ ভবানীপ্রসাদ নিয়োগী সভাস্থলে উপস্থিত হন। কেম্প্ সাহেবকে দেখিয়া সভায় মহা উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। সে সুরেন্দ্রবাবুর নিকটে আসিয়া বলিল—"আশা করি, আপনার নিকটে থাকিলে আমি নিরাপদ্ থাকিব।" অতঃপর কেম্প্ সাহেব ঘোষণা করিল—"সভাভঙ্গের পর কেহ রাজপথে 'বন্দেমাতরং' উচ্চারণ করিবেন না, নেতৃগণ এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলে সভার কার্য্য চলিতে পারে, অন্যথা নহে।" কিন্তু কেহই ঐ প্রতিশ্রুতি দিলেন না। তখন কেম্প্ সাহেব আবার বলিল—"তবে আপনারা

সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া যান, নচেৎ আমি বলপূর্ব্বক ভাঙ্গিয়া দিব।” এই কথায় প্রতিনিধিগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হইল। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এবং বরিশালের উকীল দীনবন্ধু সেন মহাশয় সভা ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইবার পক্ষে মত দিলেন। কিন্তু ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় উহাতে আপত্তি উত্থাপন করিলেন। কৃষ্ণকুমার বাবু বলিলেন—“পুলিশ লাঠি বা বন্দুকের গুলি চালাইয়া সভাভঙ্গ করুক, নচেৎ আমরা এস্থান ত্যাগ করিব না।” সভায় এই লইয়া আলোচনা চলিল। কেম্প্ সাহেব পুনরায় বলিল—“আমি আপনাদিগকে সভাভঙ্গ করিয়া যাইতে বলিতেছি। দুই রকমে এই কাজ হইতে পারে। পুলিশের দ্বারা তাড়িত হওয়া বা নীরবে চলিয়া যাওয়া। আমি আশা করি, আপনারা নীরবে চলিয়া যাইবেন।”

অতঃপর শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী অশ্রুপ্লাবিত হইয়া বলিলেন—“যাও, সকলে গৃহে যাও। গৃহে গৃহে সভা হউক, চতুর্দ্দিকে আগুন জ্বলুক, সে আগুনে চিরদিনের মত বিলাতী জিনিষ দগ্ধ হউক।” রোষে ও ক্ষোভে উন্মত্ত জনসঙ্ঘ সভাগৃহ ত্যাগ করিলেন। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়কে সভা হইতে লইয়া আসিবার জন্য তাঁহার বন্ধুদিগকে অনেক ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি তখনও বলিতেছিলেন —“পুলিশ আমাকে লাঠি মারিয়া বা গুলি করিয়া তাড়াইয়া দিউক।” এইরূপে বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির আরব্ধ কার্য্য

অকালে শেষ হইল। এই সমিতি-সংশ্লিষ্ট কতগুলি মামলা আদালতে রুজু হইয়াছিল। অনাবশ্যক বোধে সেই প্রসঙ্গ পরিত্যক্ত হইল।

বরিশালে দুর্ভিক্ষ

স্বদেশীর সেই স্মরণীয় যুগে যখন বরিশালের সুনাম সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, যে বৎসর প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনকালে বঙ্গের শত শত মাতৃভক্ত সন্তান বরিশালের রাজপথে পুলিশের লাঠির প্রহারে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, সেই বৎসরই অকস্মাৎ বাকরগঞ্জ জিলায় দুর্ভিক্ষের হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়। অশ্বিনীকুমারের সম্মুখে অকস্মাৎ এক নূতন সমস্যা উপস্থিত হইল। তিনি বরিশাল জিলার জনমণ্ডলীর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা, সুতরাং তাঁহাকেই অন্নদানের ভার গ্রহণ করিতে হইল। তিনিই ভিক্ষাভাণ্ড লইয়া রাজপথে বাহির হইলেন।

কালবিলম্ব না করিয়া তিনি বরিশাল জনসাধারণ সভার সম্পাদকরূপে নিরন্ন বরিশাল জিলার জনমণ্ডলীর পক্ষ হইয়া আবেদন প্রচার করিলেন। তাঁহার সেই আবেদনে নিখিল ভারত আশ্চর্য্যরূপে সাড়া দিয়াছিল। অল্পদিন মধ্যে তিনি দুর্ভিক্ষভাণ্ডারে আশী সহস্রেরও অধিক অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। অশ্বিনীকুমার এই সময়ে তাঁহার সুযোগ্য সহকারী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর স্বদেশবান্ধব-সমিতি

পরিচালনার সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া আপনার সমগ্র শক্তি দুর্ভিক্ষনিবারণ কার্য্যে নিয়োগ করিলেন।

প্রত্যহ নানাগ্রামের অধিবাসীদের নিকট হইতে বহুসংখ্যক পত্র আসিত। তিনি স্বয়ং সেইগুলি পাঠ করিয়া কাহাকে কি প্রকার সাহায্য করিতে হইবে তাহা লিখিয়া রাখিতেন। চাউল, বস্ত্র, থলিয়া প্রভৃতি সংগ্রহের ব্যবস্থা করিতেন। কাহার দ্বারা কোথায় কি প্রকারে সাহায্য প্রেরিত হইবে তাহাও লিখিয়া দিতেন। ফলতঃ অল্পসংখ্যক কর্ম্মী লইয়া দিবারাত্রি তাঁহাকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হইত।

প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া ছয় ঘটিকার সময়ে কার্য্য আরম্ভ করিতেন। ১২টার সময়ে উঠিয়া স্নান আহার সমাধা করিয়া ২টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করিতেন। ২টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত আবার কার্য্য করিতেন। কিয়ৎক্ষণ ভ্রমণের পর আবার রাত্রি ৭টা হইতে ১২টা পর্য্যন্ত কার্য্য চলিত।

এইভাবে দুই চারি দিন নহে, সুদীর্ঘ ছয় সাত মাস তিনি কঠোর পরিশ্রম করিয়া অন্নক্লিষ্ট নরনারীর সেবা করিয়াছিলেন। সাধ্যাতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁহার সুস্থ-বলিষ্ঠ দেহ ভাঙ্গিয়া পড়ে। বরিশালের দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হইলে তিনি স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বোম্বাইর অদূরবর্ত্তী মাথেরন্ নামক স্থানে গমন করেন।

বরিশাল জিলার নানাস্থলে দেড় শতেরও অধিক স্বদেশ-বান্ধবসমিতির শাখা ছিল। এই সমিতিগুলির দ্বারা দুর্ভিক্ষ-কালে অশ্বিনীকুমার জিলার নানা অংশে ১৬০টি সাহায্য বিতরণ-

কেন্দ্র স্থাপন করিয়া প্রত্যেক সপ্তাহে প্রায় ছয় সহস্র টাকার চাউল বিতরণ করিতেন। এমন ব্যূহবদ্ধ প্রণালীতে এই বৃহৎ ব্যাপার অনায়াসে নির্ব্বাহিত হইত যে, অশ্বিনীকুমারের অসামান্য কার্য্যপ্রণালী দর্শনে ভগিনী নিবেদিতা বিস্ময়ে অভিভূতা হইয়াছিলেন। তিনি বরিশালে গমন করিয়া স্বচক্ষে কয়েকটি সাহায্যবিতরণ-কেন্দ্রের কার্য্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বরিশালের দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তিনি তখন "মডারন্ রিভিউ" পত্রিকায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন, উহাতে লিখিত হইয়াছিল— "সরকারী সাহায্য ব্যতীত এই দেশে যে-সকল প্রতিষ্ঠান স্বেচ্ছায় লোকসেবায় নিযুক্ত আছে, সেই সকলের মধ্যে কোন প্রতিষ্ঠানই বরিশালের এই দুর্ভিক্ষনিবারণী সমিতির মত এমন দ্রুত গঠিত হয় নাই, কোন সমিতিই নেতার প্রতি এমন অনুরাগ দেখাইতে পারে নাই, কোন সমিতিই এমন সুশৃঙ্খলরূপে পরিচালিত হয় নাই। বস্তুতঃ কোন দেশেই এমন সমিতি ইতঃপূর্ব্বে দেখা যায় নাই। আমার মনে হয় বঙ্গদেশে কেহ কখন এমন মহৎ অনুষ্ঠান করেন নাই। বাকরগঞ্জে ছাত্রদের সাহায্যে এক স্কুল-মাষ্টার এমন আশ্চর্য্য কাণ্ড করিয়াছিলেন—বস্তুতঃ স্কুলমাষ্টারই অশ্বিনীকুমারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিচয়। 'লোকসাধারণকে অন্নদান করাই সকল রাজনীতির চরম লক্ষ্য।' অশ্বিনীকুমার এই আন্দোলনে সাফল্য লাভ করিয়া উহাই প্রমাণিত করিলেন।"

১৯০৬ অব্দের ১১ই জুন অশ্বিনীকুমার সাহায্যবিতরণকার্য্য

আরম্ভ করেন। কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ১৬০টি। প্রতি কেন্দ্র ৬ হইতে ১২টি গ্রাম লইয়া গঠিত হইয়াছিল। সাহায্যসমিতি মোট ৩১,১৬২ টাকা, ৫,৭৬৬ মণ চাউল ও ৩৫১০ জোড়া কাপড় মোট ৪,৮০,৩০১ ব্যক্তির মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। সাহায্যসমিতির কার্য্য ১৯০৬ অব্দের ২২এ ডিসেম্বর বন্ধ করা হইয়াছিল।

অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রথম যৌবন হইতেই সর্ব্বপ্রকারে বরিশালজিলাবাসী জনমণ্ডলীর হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। কেবল মধুর বাক্যের দ্বারা নহে, সেবা ও প্রেমের দ্বারাই বিশেষভাবে তিনি লোকের 'আপন জন' হইয়াছিলেন। প্রেমিক অশ্বিনীকুমার তাঁহার বাড়ীর গোপাল মেথরকে কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। তিনি বিসূচিকা রোগাক্রান্ত এক অসহায় ও মুমূর্ষু মুসলমান রোগীকে রাজপথ হইতে নিজের পৃষ্ঠে করিয়া চিকিৎসালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। লোকসেবার জন্য আমরণ তাঁহার বুকে এমনই অফুরন্ত প্রেম ছিল। এই লোকপ্রীতিদ্বারাই তিনি বরিশাল জিলার নিরন্ন নরনারীর সেবা করিয়াছিলেন। সাহায্য বিতরণকালে তিনি দিবারাত্রি কর্ম্ম-ব্যস্ত থাকিতেন, কিন্তু ব্যস্ততার মধ্যেও অনাহারক্লিষ্টা দুঃখিনী-দিগকে সান্ত্বনাসূচক বাণী শুনাইবার মত সময়ের অভাব তাঁহার হইত না। এই সময়ে তিনি সত্য সত্যই দীন-দুঃখীর 'মা-বাপ' হইয়া তাহাদিগকে পালন করিয়াছেন। যাহারা দয়ামায়া বিসর্জ্জনপূর্ব্বক দস্যুবৃত্তি করে তাহারাও এই রাজ্যহীন

রাজার নামে মাথা মত করিত। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে এক ঘটনায় মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের অসামান্য প্রভাব নিম্নলিখিত-রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল—

বরিশালের দক্ষিণাঞ্চলে এখনও মাঝে মাঝে জলদস্যুর উৎপাত হইয়া থাকে। দুর্ভিক্ষের সময়ে ডাক্তার নিশিকান্ত বসু ঐ অঞ্চলের একগ্রামে চাউল বিতরণের জন্য গিয়াছিলেন। সন্ধ্যার সময়ে তিনি যে স্থানে আসিলেন ঐ স্থানে চোর ডাকাতের ভয় ছিল। মাঝিরাও ভীত হইয়া পড়িল। অন্ধকার হইবার পরে নৌকার কাছে দুই একটি করিয়া লোক আসিতে আরম্ভ করিল। ইহাদের মনের ভাব বুঝিতে নিশিবাবুর বিলম্ব হইল না। অশ্বিনীবাবুকে লোকে কি চক্ষে দেখে, কিরূপ মানিয়া থাকে তাহা তিনি জানিতেন। উহা স্মরণ করিয়া তিনি নৌকার বাহিরে আসিয়া সমবেত লোকদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'তোমারা জান এই নৌকা কাঁর ?' ডাকাতেরা প্রশ্ন করিল—'কাঁর ?' নিশিবাবু বলিলেন—"এ 'বাবুর' নৌকা, তিনি তোমাদের ঐ গ্রামটায় বিলাইবার জন্য চাউল পাঠাইয়াছেন। আমার সঙ্গে তেমন লোকজন নাই বলিয়া এতক্ষণ চাউল উঠাইতে পারি নাই, তাই, তোমারা আসায় বড়ই ভাল হইয়াছে, এই চাউলের বস্তাগুলি পঁহুছাইয়া দিয়া আইস।" বরিশালের মুকুটহীন রাজার নাম শুনিবামাত্র যাহারা ডাকাতি করিবার মত্‌লবে আসিয়াছিল তাহারাই বিনা পয়সায় মজুরের কাজ করিয়া যথাস্থানে চাউল পঁহুছাইয়া দিল। কেবল তাহা

নহে, দস্যুদের এক ব্যক্তি নিশিবাবুর কাছে তাহাদের কুমতলব ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, "আপনি সময়মত 'বাবুর' নাম না করিলে আমরা বড়ই কুকাজ করিয়া ফেলিতাম।"

সত্যনিষ্ঠ পরোপকারী অশ্বিনীকুমার চিরদিনই বরিশাল জিলাবাসীদের শ্রদ্ধাভক্তির পাত্র ছিলেন। এই দুর্ভিক্ষের সময়ে তিনি যখন অন্নদাতা পিতার তুল্য প্রায় পাঁচ লক্ষ লোককে অন্ন-দান করিয়া বাঁচাইয়াছিলেন, তখন তিনি সমগ্র জিলার নরনারীর হৃদয়মন্দিরে দেবতার আসন প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছেন—

"যিনি বরিশালবাসী সকলের খবর রাখেন, সকল অভাব অভিযোগ দূর করেন, দুর্ভিক্ষের সময় অন্ন আইসে যাঁহার নিকট হইতে, কলেরার সময় চিকিৎসক পাঠান যিনি, প্রেমে গদগদ হইয়া গোপাল মেথরকেও কোল দেন যিনি, সেই অশ্বিনী-কুমারকে ত বরিশালবাসী দেবতা জ্ঞান করিবেই। নূতন গাছের প্রথম ফলটি তাই বরিশাল জিলার গৃহস্থ সুফলের আশায় অশ্বিনীকুমার দত্তের নামে মানত করিত। যে ব্যাপারীর জ্বালের গুড় কেবল পুড়িয়া যায় সেও প্রথম জ্বালের গুড়খানা 'বাবুর' নামে রাখিয়া দিত। আমি নিজে জানি মৃত্যুশয্যাশায়ী পুত্রের জননী আকুল হইয়া অনুনয় করিয়াছেন—'ওরে অশ্বিনী বাবুকে আনিয়া দে, তাঁহার পায়ের ধূলা পাইলেই বাছা আমার আরাম হইবে।' আরও জানি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত

বরিশালপ্রবাসী এক সরল হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ নির্ব্বাসিত অশ্বিনীকুমারের মুক্তির জন্য অশ্বিনীকুমারেরই নামে পুরী-তরকারীর ভোগ মানত করিয়াছিল।"

দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সাহায্য বিতরণ কার্য্যে অশ্বিনীকুমারের অনুরাগী কর্ম্মিগণ যে কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। যাহারা কখন কোন শ্রমসাধ্য কার্য্য করেন নাই এমন ভদ্রসন্তানগণ পল্লীগ্রামে বর্ষার কর্দ্দমাক্ত পথ অতিক্রম করিয়া এক মাইল, দুই মাইল দূরে চাউলের বস্তা বহন করিয়া লইয়া যাইতেন। যে-সকল ভদ্রলোক লোক-লজ্জাভয়ে কেন্দ্রে আসিয়া সাহায্য গ্রহণ করিতেন না, যুবকগণ রাত্রিকালে তাহাদের ঘরে ঘরে চাউল দিয়া আসিতেন। এক লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া, এক দলপতির আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কর্ম্মিগণ পরমোৎসাহে কার্য্য করিয়া এই মহাযজ্ঞের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন।

যুক্তপ্রদেশ, মধ্যভারত ও পঞ্জাবের দুর্ভিক্ষ

মহাপ্রেমিক অশ্বিনীকুমারের চিত্ত কেবল বরিশাল জিলা-বাসীর নহে, মানবমাত্রেরই বেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিত। ১৯০৮ অব্দে যখন যুক্তপ্রদেশ, মধ্যভারত ও পঞ্জাবে দুর্ভিক্ষের আর্ত্তনাদ উত্থিত হইয়াছিল, তখন অশ্বিনীকুমার বরিশাল সহর হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া তাঁহার বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন মজুমদার মহাশয়কে উক্ত অঞ্চলে পাঠাইয়াছিলেন।

ভবরঞ্জন বাবুর সহিত শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার গাঙ্গুলী, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও খগেন্দ্রনাথ দাস এই তিনজন স্বেচ্ছাসেবক দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের সেবা করিতে গিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ দেশসেবক লালা লাজপৎ রায় ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়দ্বয় এই দুর্ভিক্ষনিবারণী সমিতির সম্পাদক ছিলেন। বরিশালের সেবকগণ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে যাস্‌রা, বান্দা, নারায়ণী ও কালিঞ্জার কেন্দ্রে কার্য্য করিয়াছিলেন।

কয়েকটি বিশেষ সভা

১৯০৬ অব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা মহানগরীতে স্বর্গীয় দাদাভাই নৌরজী মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে মহাসভার অধিবেশন হয় ঐ সভায় অশ্বিনীকুমার অভ্যর্থনাসমিতির অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। নৌরজী মহাশয়ের অভিভাষণে এই সময়ে সর্ব্বপ্রথমে 'স্বরাজ' শব্দের ব্যবহার হইয়াছিল। এই মহাসভায় সভ্যদের মধ্যে মত বিরোধ ঘটে। মহাসভার সভ্যগণ তখন 'মধ্যপন্থী' ও 'চরমপন্থী' এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া পড়েন।

অশ্বিনীকুমারের রাজনীতিক মত চরমপন্থীদের তুল্যই ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি এই দুই দলের কোন দলের সহিতই যোগ দান করিতেন না। তিনি জাতীয় মহাসমিতিকে মানিয়া নিজের মতানুসারে কার্য্য করিতেন।

স্বদেশী যুগে যখন কলিকাতা নগরে 'শিবাজী-উৎসব' প্রবর্ত্তিত হয় তখন অশ্বিনীকুমার ঐ সভায় সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন।

সুরাট্ কংগ্রেসে চরমপন্থীরা সভাপতিপদে বরণ করিবার জন্য অশ্বিনীকুমারের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে অশ্বিনীকুমার উহাতে সম্মতি প্রদান করেন নাই।

স্বদেশী যুগে অশ্বিনীকুমার একবার কলিকাতার দলাদলি মিটাইবার জন্য তথায় আহূত হইয়াছিলেন। সে আহ্বানে তিনি সাড়া প্রদান করেন নাই। বন্ধুদের নিকট তিনি বলিয়াছিলেন—কলিকাতায় একটা আছে "সৌর" দল, আর একটা "বৈপিন" দল, আবার আমি কি সেখানে একটা "আশ্বিন" দল গঠন করিব?"

বরিশালে এক মহতী সভায় অশ্বিনীকুমার বলিয়াছিলেন—"আজ যদি কর্ত্তা (পরমেশ্বর) এসে বলেন, অশ্বিনী, মুক্তি নাও, তা'হলে আমি বলি, না কর্ত্তা, আর একটু সবুর কর। আর একবার এই বরিশালের মাটীতে শিশু হয়ে ভূমিষ্ঠ হই, যৌবনে সকলের সেবা করি, বৃদ্ধ হ'য়ে সকলের চোখের জলের মধ্যে অন্তর্হিত হই।"

অশ্বিনীকুমারের নির্ব্বাসন

১৯০৮ অব্দের ১৩ই ডিসেম্বর রবিবার অশ্বিনীকুমার নির্ব্বাসিত হন। অশ্বিনীকুমার কেন নির্ব্বাসিত হইলেন? এই প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দেওয়া অসম্ভব। যে আইনের দ্বারা

কাহাকেও দণ্ড দিলে কোন প্রকার বিচার আবশ্যক করে না বা জবাবদিহি হইতে হয় না, গভর্ণমেণ্ট সেই ১৮১৮ অব্দের ৩ আইন দ্বারা অশ্বিনীকুমারকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ মনে করেন, স্বদেশী যুগে বরিশাল জিলায় অশ্বিনীকুমারের প্রভাব উক্ত জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিয়াছিল, এই কারণেই হয়ত তিনি রাজরোষে পতিত হইয়া নির্ব্বাসিত হইয়া থাকিবেন।

কেহ কেহ মনে করেন, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, ব্রজমোহন বিদ্যালয় রাজনীতি আলোচনার দুর্ভেদ্য দুর্গ, গভর্ণমেণ্ট ঐ বিদ্যালয়টির বিনাশসাধনের জন্য বিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ প্রতিষ্ঠাতা অশ্বিনীকুমার ও তাহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ অধ্যাপক সতীশচন্দ্রকে নির্ব্বাসিত করেন।

অশ্বিনীকুমার যে বিনাদোষে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন দেশের লোক তাহা তখনও মনে করিতেন এখনও মনে করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডের 'টাইমস্' পত্রিকায় মিঃ চিরলের (স্যর ভ্যালেণ্টাইন্ চিরল্) মত স্বেচ্ছাতন্ত্রীও লিখিয়াছিলেন যে, বঙ্গদেশের যে সকল ব্যক্তিকে ১৮১৮ অব্দের ৩ আইন মতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ দুই একজনের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগই নাই। কেহ কেহ বলেন, অশ্বিনীকুমারের যে ডায়েরী চুরি গিয়াছিল, উহা হয়ত পুলিশের হাতে পড়িয়া থাকিবে এবং সুচতুর পুলিশ হয়ত উহার মধ্যে

কোন অপরাধ আবিষ্কার করিয়া থাকিবে। ইহাও শুনা গিয়াছিল, অশ্বিনীকুমার নাকি কোন এক গুর্খা সৈনিকের রাজ-ভক্তি বিচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহাই নাকি অশ্বিনীকুমারের বিরুদ্ধে প্রকৃত অভিযোগ। অশ্বিনীকুমারের তুল্য ন্যায়নিষ্ঠ, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির পক্ষে এইরূপ নীতি-বিগর্হিত কার্য্য কত দূর অসম্ভব তাহা যাঁহারা তাঁহাকে জানেন, তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আবার অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহ হইতে স্বদেশবান্ধবসমিতির কাগজ-পত্র চুরি গিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, সেই চুরির সহিত অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্রের নির্ব্বাসনের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব আছে। এই সকল অনুমানের মধ্যে কোন্‌টী সত্য, কোন্‌টী মিথ্যা তাহা কেবল গভর্ণমেণ্ট বলিতে পারেন। অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে সরকার পক্ষ হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক অধিবেশনে স্যর হিউ ষ্টিভেন্‌সন্‌ ১৮১৮ অব্দের ৩ আইনের প্রয়োগ ব্যাখ্যা করিবার সময়ে বলিয়াছিলেন—"শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয়ের সহিত আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল না। সরকারের বিরুদ্ধে সুদূর-বিস্তৃত তীব্র আন্দোলন এবং ব্রজমোহন বিদ্যা-লয়ের শত শত যুবকের উক্ত আন্দোলনে যোগদানই তাঁহার নির্ব্বাসনের প্রধান হেতু।"

স্বদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনে যাঁহারা প্রবৃত্ত হন, কারাদণ্ডকে তাঁহারা ভয় করেন না। নির্ব্বাসন দণ্ড অশ্বিনী-কুমারের আন্তরিক স্বদেশসেবার গৌরবময় পুরস্কার। অশ্বিনী-

কুমার বরিশালে যে প্রকার আন্দোলন চালাইতেছিলেন তাহাতে তাঁহাকে এইরূপ দণ্ড পাইতে হইবে তাহা তিনি জানিতেন। এই জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন। নির্ব্বাসনের দিন দুই পূর্ব্বে তিনি এই সংবাদ পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার নামে নির্ব্বাসনের পরোয়ানা আসিতেছে।

সে দিন রবিবার, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯০৮, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বহু শিক্ষক ও ছাত্র জগদীশবাবুর আশ্রমে ধর্ম্মসভায় গিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র সেই সভায় নিবিষ্ট মনে হরিনামামৃত পানে মাতোয়ারা ছিলেন। তখন এই সংবাদ আসিল, সশস্ত্র পুলিশ অশ্বিনীবাবুর বাড়ী ঘেরাও করিয়াছে। খবর পাইয়া অশ্বিনীকুমার উঠিলেন, তাঁহার পেছনে পেছনে সতীশচন্দ্রও ছিলেন। ইহাঁরা অধ্যাপক কামিনীকান্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বাড়ীর মধ্য দিয়া মাঠ অতিক্রম করিয়া সোজা পথে আসিয়া ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তাঁহারা লোক মুখে শুনিলেন, সতীশচন্দ্রের বাড়ীও সশস্ত্র পুলিশ ঘেরাও করিয়াছে। তখন দুইজনে স্ব-স্ব গৃহাভিমুখে দ্রুতগতি চলিতে লাগিলেন।

অশ্বিনীকুমার তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইবামাত্র বরিশালের অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্ মিঃ হাওয়ার্ড. গম্ভীর স্বরে বলিলেন—"আমাকে অতি অপ্রিয় সত্য বলিতে হইবে, আপনি এখন বন্দী।" অশ্বিনীকুমার বলিলেন—"আমি কি অপরাধে বন্দী হইলাম, আপনি দয়া করিয়া তাহা বলিবেন কি ?" সাহেব বলিলেন—"আপনি

১৮১৮ অব্দের ৩ আইন আনুসারে ধৃত হইয়াছেন।” অশ্বিনীকুমার বলিলেন—“তাহা হইলে আমি নির্ব্বাসিত হইয়াছি। আচ্ছা, আমাকে কি প্রস্তুত হইবার জন্য কতক সময় দিবেন?” সাহেব উত্তর করিলেন—‘হাঁ, আপনি প্রস্তুত হউন।’ গৃহমধ্যে মহিলারা কাঁদিয়া উঠিলেন। অশ্বিনীকুমার স্নানাহার সমাধা করিয়া জিনিষপত্র গুছাইয়া লইলেন। সঙ্গে লইলেন—খুব বড় অক্ষরে ছাপা তাঁহার প্রাণপ্রিয় একখানি শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং অপর কয়েকখানি পুস্তক। একবার ভিতরের কক্ষের দিক মুখ বাড়াইয়া বলিলেন—“লালা লাজপত্‌ রায়ের যাহা হইয়াছিল, এ তাহাই।” তারপর অশ্বিনীকুমার অবিচলিত কণ্ঠে—“দুর্গা, দুর্গা” বলিতে বলিতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হইয়া পড়িলেন।

এই সময়ে তাঁহার গৃহ-প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। তাঁহার পরমপ্রিয় বরিশালনগরবাসী সহস্র সহস্র ব্যক্তির হৃদয়-গলা অশ্রু-অর্ঘ্যে অভিনন্দিত হইয়া অশ্বিনীকুমার শকটে আরোহণ করিলেন। যাঁহার মনে ভ্রমেও বিপ্লব-বিদ্রোহ স্থান পাইত না সেই শান্ত, ধর্ম্মপ্রাণ, স্বদেশসেবক অশ্বিনীকুমারের শকট তখন সশস্ত্র পুলিশ প্রহরিবেষ্টিত হইল। অশ্বিনীকুমারকে লইয়া সাহেবেরা যখন যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন, ঠিক এমন সময়ে অকস্মাৎ কোথা হইতে এক পাগল সেখানে উপস্থিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে হস্তস্থিত নর-কপাল দেখাইয়া বলিল, “পরমেশ্বর এত অধর্ম্ম বেশী দিন সহ্য করিবেন না, দুই দিন পরে যাহা হইবে তাহা এই দেখিয়া লও।”

অযোধ্যাবাসীকে কাঁদাইয়া রামচন্দ্র যেমন বনবাসে গিয়াছিলেন, বৃন্দাবন শোকের আঁধারে আবৃত করিয়া কৃষ্ণচন্দ্র যেমন গোকুলে গিয়াছিলেন,সেইরূপ বরিশালবাসীর নয়নের আনন্দ,প্রিয়তম নেতা সদানন্দ অশ্বিনীকুমার সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া নির্ব্বাসনে যাইতেছেন। যাত্রাকালে জনসঙ্ঘ অকস্মাৎ তুমুলস্বরে এমন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল যে, সেই শব্দে অশ্ব ভীত হইয়া নিশ্চল হইল। তারপর প্রহরিবেষ্টিত অশ্বযান ছুটিয়া চলিল, পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেই বিপুল জনতা ষ্টীমারঘাটের দিকে দৌড়িয়া চলিল। সহস্র সহস্র ব্যক্তি উন্মত্তবৎ মুহুর্ম্মুহু 'বন্দেমাতরং' ধ্বনি করিতে লাগিল। সেই ধ্বনি যেন সমগ্র নগরবাসীর নিরুদ্ধ বক্ষের আকুল ক্রন্দনের মত অনন্ত গগন আলোড়িত করিতেছিল। দেখিতে দেখিতে অশ্বিনীকুমার নদীতীরে আসিয়া বরিশাল নগরের পবিত্র ধূলিদ্বারা ললাট ভূষিত করিয়া জিনিষপত্রসহ জাহাজে উঠিলেন।

এদিকে অশ্বিনীকুমারের সুদক্ষ সহকারী সতীশচন্দ্রও পরিজনবর্গের নিকট বিদায় লইয়া আসিয়াছেন, তিনি পত্নীকে বলিয়াছিলেন—"পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া, শান্ত হইয়া থাকিও।" ভগিনীকে বলিয়াছিলেন—"দুঃখ করিও না, এই ব্রতের এই কথা।"

দেশসেবার শ্রেষ্ঠ ফল অর্জ্জন করিয়া অশ্বিনীকুমার তাঁহার স্নেহাস্পদ সহকর্ম্মীর সহিত নির্ব্বাসনে চলিলেন। জাহাজে অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র পৃথক্ পৃথক্ কক্ষে স্থান পাইয়াছিলেন।

জাহাজখানি যখন চাঁদপুরের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন অপর একখানি জাহাজ উহার সমীপবর্ত্তী হইল। ঐ জাহাজের ঢাকার অনুশীলনসমিতির নেতা শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস এবং তাঁহার সুযোগ্য সহযোগী বারদি-নিবাসী শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ নাগ মহাশয় ৩ আইনের পরোয়ানায় ধৃত হইয়া আনীত হইয়াছিলেন। তখন দুই জাহাজ এক সঙ্গে কলিকাতার অভিমুখে চলিতে লাগিল। ঠিক এই সময়েই 'সঞ্জীবনী'সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, এণ্টিসার্কুলার সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, 'নবশক্তি' সম্পাদক পরলোকগত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, 'সারভেণ্ট্' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী এবং বিখ্যাত দানবীর 'রাজা' সুবোধচন্দ্র মল্লিক এই পাঁচ জন স্বদেশসেবকও নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার ও সতীশচন্দ্র যে জাহাজে ছিলেন ঐ জাহাজ বুধবার কলিকাতার সমীপস্থ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনের নিকটে উপস্থিত হয়। শুক্রবার অশ্বিনীকুমার লক্ষ্ণৌ নগরে প্রেরিত হইয়াছিলেন। যখন যাত্রার সময় হইল তখন সহযাত্রী পুলিশ কর্ম্মচারী কোটস্ সাহেব অশ্বিনীকুমারকে বলিলেন—"অশ্বিনীবাবু, আপনি সতীশ বাবুর পিতার তুল্য, বিদায়কালে যদি তাঁহাকে কোন হিতোপদেশ দিতে ইচ্ছা করেন ত আমার সম্মুখে বলিতে পারেন।" অশ্বিনীকুমার বলিলেন—"সতীশকে আমি আর কি উপদেশ দিব, সতীশ সমস্তই জানে। ঠিক এই মুহূর্ত্তে আমার যে কথাটি মনে জাগিতেছে তাহা ম্যাডাম্ গোঁয়োর উক্তি—

"I pity my enemies, for these do not know that iron-bars can not shut out my beloved"

ঐ দিনই সতীশবাবু রেঙ্গুনে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেখানে বেসিন সহরের কারাগারে তিনি নির্ব্বাসনকাল যাপন করেন।

অশ্বিনীকুমার যে দিন নির্ব্বাসিত হন সেই দিন বরিশাল সহরে যে কি ভীষণ দুঃখ ও নৈরাশ্যের হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল তাহা বাক্যে প্রকাশ করিব কি প্রকারে? সে দিন নগরবাসী অধিকাংশ ব্যক্তি অনাহারে দিন যাপন করিয়াছিলেন। কেহ মনের দুঃখে শয্যাশায়ী হইলেন, কেহ কেহ হতবুদ্ধির মত নদীতীরেই বসিয়া রহিলেন। এই শোকে এক হিন্দুস্থানী মিঠাইওয়ালা দুই দিন উপবাস করিয়াছিল! এক মুসলমান অশ্বিনীকুমারের মুক্তিকামনায় রোজার সময়ে দশ দিন অতিরিক্ত রোজা করিয়াছিল। অশ্বিনীকুমার চৌদ্দ মাস নির্ব্বাসনে ছিলেন। এক ব্রাহ্মণ ঐ চৌদ্দ মাসের প্রত্যেক দিন নারায়ণকে ১০৮টি করিয়া তুলসী দিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার যখন নির্ব্বাসিত হইলেন তখনই গভর্ণমেণ্ট তাঁহার সুগঠিত স্বদেশবান্ধবসমিতিগুলিকে বে-আইনী সমিতি বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছিলেন। কেবল তাহা নহে, এই সময়ে বরিশালের স্বদেশী আন্দোলন দলনের জন্য ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, "দেশের গান" নামক সঙ্গীতপুস্তিকার সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত ভবরঞ্জন মজুমদার আঠার মাসের এবং

"মাতৃপূজা" নামক প্রসিদ্ধ স্বদেশীযাত্রা পুস্তকের রচয়িতা শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস তিন বৎসরের জন্য রাজদ্রোহের অপরাধে দণ্ডিত হইয়া যথাক্রমে সুদূর রাওয়ালপিণ্ডি ও দিল্লী কারাগারে অবরুদ্ধ হন। অশ্বিনীকুমারের নির্ব্বাসনের দশদিন পরে ২৩এ ডিসেম্বর তারিখে ইহাঁরা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গভর্ণমেণ্ট হইতে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগের বিরুদ্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সমীপে যে সকল অভিযোগ প্রেরিত হয় তন্মধ্যে লিখিত হইয়াছিল— "Babu Bhabaranjan Majumdar has been second only to Professor Satish Chandra Chatterji in the activity of his political work." অশ্বিনীকুমারের স্নেহাস্পদ সহকর্ম্মী অধ্যাপক সতীশচন্দ্র ও শিক্ষক ভবরঞ্জন দুই জনেই একনিষ্ঠ স্বদেশসেবার অবশ্যম্ভাবী পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার কারাগারে দুঃসহ নির্জ্জনতা বা নৈরাশ্যে অনুভব করিয়াছেন এমন কথা তাঁহার মুখে কদাচ শুনি নাই। নির্ব্বাসন-কাহিনী লিখিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"কি লিখিব ? লিখিবার মত ত তেমন কিছু হয় নাই, 'sorrow and solitude' কিছুই ত আমি অনুভব করি নাই।" কৌতুকী অশ্বিনীকুমার পরিহাসচ্ছলে বলিতেন—"একবার ছোট লাট্ বেলি বৃষ্টির সময়ে আমার মাথায় ছাতা ধরিয়াছিলেন, নির্ব্বাসনের সময়ে চামরের হাওয়া খাইয়াছি। লক্ষ্ণৌ কারাগারের কয়েদীরা

মনে করিত আমি কোন রাজা, মহারাজ হইব, আমার স্বাস্থ্যের সংবাদ নিতে ছোট লাট্ হিউয়েট্ সাহেবও জেলে আসিয়াছিলেন। ছত্র, চামর, উপাধি সমস্তই হইল, বাকী কেবল দণ্ড, কেন, দীর্ঘ নির্ব্বাসনই ত আমার রাজদণ্ড!”

এই নির্ব্বাসন-কালেও অশ্বিনীকুমার তাঁহার স্বভাব-সুলভ রসিকতা হারাইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। লক্ষ্ণৌর ম্যাজিষ্ট্রেট্ একদিন অশ্বিনীকুমারকে অনুরোধ করিলেন—“আপনি এই যে ঘরটিতে থাকেন ইহার প্রাঙ্গণে একটি গাছ আপনাকে রোপণ করিতে হইবে। কারণ, তাহা হইলে আপনি চলিয়া যাইবার পরেও আমরা বলিতে পারিব, মহাত্মা অশ্বিনী-কুমার নিজ হাতে এই গাছটি লাগাইয়াছেন।” অশ্বিনীকুমার বলিলেন—“আমি নিঃসন্তান, আমার কোথাও কোন চিহ্ন থাকে ইহা ভগবানের অভিপ্রেত নহে।” সাহেব কিছুতেই ছাড়িলেন না; অবশেষে অশ্বিনীকুমার বলিলেন—“কি গাছ লাগাইব?” সাহেব বলিল—“আপনার যে গাছ খুসী।” অশ্বিনীকুমার হাসিয়া বলিলেন,—“আমি সরিষা গাছ লাগাইব।” ‘ভিটায় সরিষা বোনার’ অর্থ সাহেব জানিতেন না বলিয়াই তিনি এই রসিকতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

অশ্বিনীকুমারের নির্ব্বাসনপ্রসঙ্গে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছেন—“কারাগারে তাঁহার খাওয়া ও চিকিৎসার বিশেষ যত্ন লওয়া হইত। অনেক দামের ভাল ভাল ‘মেওয়া’ তাঁহার জন্য অনেক দূর হইতে আমদানী করা হইত। তাঁহার সামান্য

ইচ্ছা পূর্ণ হইতেও দেরী হইত না। অশ্বিনীকুমারের বাস-কক্ষের বাহিরে একটি সুন্দর নিমগাছ ছিল। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্‌কে বলিয়াছিলেন—'ঐ নিমগাছটির তলায় একটি সান্‌ বাঁধান বেদী থাকিলে মাঝে মাঝে গাছের ছায়ায় বসিতে পারিতাম, কিন্তু কাছেই যে ঐ পায়খানা রহিয়াছে দুর্গন্ধে ওখানে বসা যাইবে না।' তিনি অবশ্যই ইহা মনে করেন নাই যে, তাঁহার এই সামান্য ইচ্ছা পূরণের জন্য জেল কর্ত্তৃপক্ষ সরকারী তহবিলের অনেক টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত হইবেন। কিন্তু পরদিন সকালে নিদ্রাভঙ্গে জানালা দিয়া দেখিলেন, পায়খানাটি ভাঙ্গিয়া সেখানকার জমি 'রোলার' দিয়া সমতল করা হইতেছে, আর নিমগাছের তলায় বেদী বাঁধাও আরম্ভ হইয়াছে। তিনি বিদেশী বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না, সেইজন্য শীতকালে বারাণসী শাড়ীর পাড় কাটিয়া দিয়া তাঁহার জন্য বালাপোষ তৈয়ার করা হইয়াছিল। গ্রীষ্মকালে দিবারাত্রি ষোল জন ভৃত্য তাঁহাকে ব্যজন করিত। সরকারী আদরের এতটা বাহুল্য ও প্রাচুর্য্য দেখিয়া তিনি কৌতুক বোধ করিতেন। তাই তিনি রহস্য করিয়া লিখিয়াছেন—

আমায় সখের কয়েদী করেছে,
খাবার শোবার কেমন সুন্দর ব্যবস্থা হয়েছে।
পূরব জনমে যেন
কার গো সখের ময়না ছিনু,

নবাব ছিল সে এই লক্ষ্ণৌ
তাই হেথা এনেছে।
ছিল নবাব সেবারে যে
এবারে লাট্ হয়েছে সে,
সোণার পিঞ্জর আমার
গোরা-বারিক্ বনেছে।
সেই সেই সুখাদ্য নানা
সেই কদলী সেই বেদানা
সেই পুরাণো টানে এসে
আবার জুটেছে।
তখন যা' বলাতো তাই বলিতাম,
যা' শোনাতো তাই শুনিতাম,
সোণাকাণী ময়না বলে
তাই আদর করেছে।
এখন যা' বলাবে তাই বলিব,
যা' শোনাবে তাই শুনিব,
সেদিন ত নাইরে যাদু,
সে বুদ্ধি ঘুচেছে।

যাঁহারা যথার্থ মনীষী তাঁহারা আপনার মনের মধ্যেই জীবিত থাকেন। লক্ষ্ণৌ কারাগারে অশ্বিনীকুমার গুরুমুখী ভাষা শিক্ষা করিয়া 'গ্রন্থসাহেব' অধ্যয়ন করিয়াছেন। এখানে

তাঁহার সঙ্গী ছিল—শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসীদাসের রামায়ণ ও ভক্তমাল। অশ্বিনীকুমার প্রকৃত ভক্তের মত ভক্তচরিত অধ্যয়ন করিয়া ভক্তিরসের মধ্যে আপনার মনটি ডুবাইয়া রাখিতেন। তাঁহার রক্তমাংসের দেহটা কারাগৃহে থাকিলেও তাঁহার মন অনেক সময়ে অনন্ত বিমানে বিহার করিত। এই কারাবাসকালে রচিত একটি সঙ্গীতে তিনি লিখিয়াছেন—

রক্তমাংস নিয়ে বল ক'দিন থাকা যায়।
আমি যারে আমি বলি সে তো রক্ত মাংস নয়॥
রক্তমাংসের নট্‌-বহরা,
টেনে টেনে হলেম সারা,
কিছুতেই ছাড়েনা তারা
ছাড়ান যে দায়।
যখন রক্তমাংস ছেড়ে উঠি,
আপন সুখে আপনি লুঠি,
কয়েদী যেমন পেলে ছুটী
বাতাস লাগায় গায়।
ঐ যে ঐ অনন্ত বিমান,
ঐ ত আমার ঘরের নিশান,
যেতে প্রাণ করে আন্‌চান্‌
শিকল বাঁধা পায়।

৭-১-১৯০৯

আমরা এই পৃথিবীতে এমন পেচকবদন ব্যক্তিও দেখিয়াছি যাহারা কদাচিত হাসিয়া থাকে, কাতুকুতু দিয়াও ইহাদিগকে হাসান যায় না। যাঁহারা যথার্থ রসিক, তাঁহাদের রসের প্রস্রবণ রহিয়াছে তাঁহাদের হৃদয়মধ্যে। একটু কিছু উপলক্ষ্য পাইলেই এই প্রস্রবণ হইতে আনন্দের রসধারা উথলিয়া উঠে। লক্ষ্ণৌ কারাগারের বাহিরে কোন্ এক শিশু 'বাবাজান্' বলিয়া ডাকিতেছিল; ঐ ধ্বনি শুনিয়া অশ্বিনীকুমারের প্রাণ আনন্দে ভরিয়া গেল। তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়া গাহিলেন—

শিশু ডাকে বাবাজান্
আমার আনন্দে ভাসে প্রাণ।
ও ত আমি ডাকি আমাকে, আমারি আহ্বান।
আমি পুত্র আমি পিতা,
আমি কন্যা আমি মাতা,
আমি আমার ভগ্নী ভ্রাতা, আমি'র সমাধান।
আমি নির্গুণ আমি অরূপ,
আমি সগুণ আমি স্বরূপ,
আমি রস বিষকূপ, দুয়েরই বিধান।
আমরি, আমার খেলা
আমি গুরু আমি চেলা
আমি সাগর আমি ভেলা, আমিই তুফান।

আমি আমার গলা ধরি,
আমি আমার সংহার করি,
আমি মিত্র আমি অরি, বিচিত্র বিধান। ২৯।১।১৯০৯

আর এক দিন জ্যোৎস্নাধবল রজনীকালে কারাকক্ষ হইতে দূরাগত বংশীধ্বনি শ্রবণে আনন্দে আকুল হইয়া অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে নিবেদন করিয়াছিলেন—

বিনোদিয়া, তুই কি ঐ বাজাস্ বাঁশী তোর ?
মরমে গেল সে ধ্বনি প্রাণ হল ভোর।
স্থষ্টির পারেতে বসি
বাজাস্ তুই মোহন বাঁশী,
কতকালের কথা আসি পশে প্রাণে মোর।
সেই স্থষ্টির আগের কথা
যেথা নাই 'আমি' নাই 'মমতা',
মনে আসে সেই বারতা যার নাই ওর।
ভাবিতে ভাবিতে তাই
বিদেহ যে হ'য়ে যাই,
সত্ত্ব রজ'র মুখে ছাই, খসে যায় ডোর।
তোর মোহন বাঁশীর তানে,
কি হয় মন, মনই জানে,
আমার মন যে থাকেনা মনে, ওরে মনচোর।

১৮।১।১৯০৯

যিনি আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম, তাঁহার সহিত যাঁহার যথার্থ পরিচয় হয় তিনি কাহাকেও ভয় করেন না, কিছু হইতেই ভয় পান না। এই যে অভয়দাতা দেবতা মানুষের অন্তরে বাস করেন, লক্ষ্ণৌর কারাকক্ষে তাঁহারই অভয়বাণী শুনিয়া অশ্বিনীকুমার গাহিয়াছিলেন—

শুনি মাভৈ মাভৈ ধ্বনি মাভৈ মাভৈ।
অভয় ত হ'য়ে গেছি, ভয় আর কই ॥
বিপদ্ পাহাড়ের মত,
আসুক না আস্‌বে কত,
ঐ পদে হবে হত ব্রহ্মকবচ ঐ ॥
ঐ পদ থাকিলে বুকে,
হাজার শত্রু আসুক রূখে,
ছাই পড়বে তাদের মুখে, হব জগজ্জয়ী ॥
শোক বিপদ্ দুঃখ দৈন্য,
পাপ তাপের যত সৈন্য,
কাকেও না করি গণ্য, বৈকুণ্ঠেতে রই ॥
ও পদে মন থাকে যবে,
এমন কেউ দেখি না ভবে,
যারে দেখ্‌লে ডর হবে, যত ছোট হই ॥

যাঁহারা সদানন্দ অশ্বিনীকুমারকে নির্ব্বাসনদণ্ড প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন তাঁহারা এই মহাত্মার অন্তরের সংবাদ রাখিতেন না। তিনি কারাকক্ষের কঠিন প্রাচীর ও

ধূলিরাশিকে আপনার অন্তরের আনন্দরসে পূর্ণ করিয়া একাকী নৃত্য করিতেন এবং ধূলিমুষ্টিকে মনের আনন্দে চুম্বন করিতেন। অশ্বিনীকুমারের এই আনন্দ, এই স্ফূর্ত্তি কারাগারে রচিত নিম্নলিখিত সঙ্গীতে ব্যক্ত হইয়াছে—

স্ফূর্ত্তি মন্ত্রের পূজক আমি, স্ফূর্ত্তি আমার ধ্যান।
স্ফূর্ত্তি আমার জপ তপ, স্ফূর্ত্তি আমার দান।
আমি যাঁর করি পূজা,
সে স্ফূর্ত্তি মুলুকের রাজা,
স্ফূর্ত্তিতে তাঁর বাজ্‌ছে বাজন, স্ফূর্ত্তির হচ্ছে গান।
স্ফূর্ত্তি থেকে সৃষ্টি হয়,
স্ফূর্ত্তিতে ব্রহ্মাণ্ড রয়,
স্ফূর্ত্তিতেই হয় লয়, স্ফূর্ত্তির বিধান।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ভাবের এই স্বর্গলোকেই অশ্বিনীকুমারের চিত্ত দিবারাত্রি বিহার করিত, তিনি কখনও বিচ্ছেদবেদনা বা কোনরূপ দুঃখ অনুভব করিতেন না, কিন্তু আমরা তাহা মনে করি না। তিনি বলিয়াছেন—"একদিন কেমন হইল, অনেক দিন অনাথের (ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সুকুমার দত্তের) চিঠি পাই না। ভয়ানক কান্না পাইতে লাগিল। খানিকটা কাঁদিলাম, পরক্ষণেই মনে হইল আমি কি পাগল? এ কি করিতেছি?"

সাময়িক দুর্ব্বলতা মানুষ মাত্রেরই আসে, অশ্বিনীকুমার সেই

দুর্ব্বলতার ধূলি মুহূর্ত্তমধ্যে ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাঁহার মন প্রেম-মধুদ্বারা ভরিয়া লইতে পারিতেন। কারাগারেই স্বরচিত এই সুললিত সঙ্গীতে তিনি তাঁহার এই মহাভাব ব্যক্ত করিয়াছেন—

তুমি মধু, তুমি মধু মধু মধু মধু।
মধুর নির্ঝর মধুর সায়র, আমার পরাণ-বঁধু॥
মধুর মূরতি, মধুর কীরতি, মধুর মধুর ভাষ;
মধুর চলনি, মধুর দোলনি, মধুর মধুর হাস॥
মধুর চাহনি, মধুর সাজনি, মধুর রূপের লেখা,
মধুর মধুর মধুর মধুর মাহেন্দ্র ক্ষণের দেখা॥
ও মধু রূপের মধুর কাহিনী মধুর কণ্ঠে গায়,
শুনিতে শুনিতে গলিতে গলিতে প্রাণ মধু হয়ে যায়।
(তখন) অনল অনিলে জলে মধু প্রবাহিণী চলে,
মেদিনী হয় মধুময়।
(তখন) প্রকৃতি মোহিনী সাজে, হৃদয়ে মৃদঙ্গ বাজে,
মধুর মধুর ধ্বনি হয়॥
(তখন) যেরূপ ভাতে যেখানে, যেকথা পশে গো কাণে,
স্তুতি নিন্দা সকলি মধুর।
(তখন) বজ্ররব কুহুধ্বনি গুরু সোম রাহু শনি,
মধুরসে সকলই ভরপুর॥ ১৯,১০,১৯০৯

পরমভাগবত ভক্তের মত অশ্বিনীকুমার আপনাকে দীনহীন সেবক বলিয়া মনে করিতেন। তিনি নিজেকে বড় মনে করিয়া অন্তরে কোন প্রকার অভিমান পোষণ করিতেন না

স্নেহাস্পদ বন্ধুদের শত তাড়নায়ও তিনি তাঁহার জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে সম্মত হন নাই। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"অশ্বিনী-কুমার যখন অন্তরীণে আবদ্ধ ছিলেন তখন তাঁহাকে একখানা বাঁধা খাতা পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহার জীবন-রচিত লেখার জন্য। সেই খাতা সেই অবস্থায়ই তাঁহার সঙ্গে ফিরিয়া আসিয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "খাতা যে অবস্থায় আসিয়াছে ইহাই আমার জীবনচরিত। বাঁধান খাতার কঠিন দুই মলাট—উপরেরটি জন্ম, পিছনেরটি মৃত্যু, আর ভিতরের সব পাতাগুলি সাদা, অর্থাৎ জন্মমৃত্যুর মাঝখানে যে জীবন তাহা (Blank) ফাঁকা।"

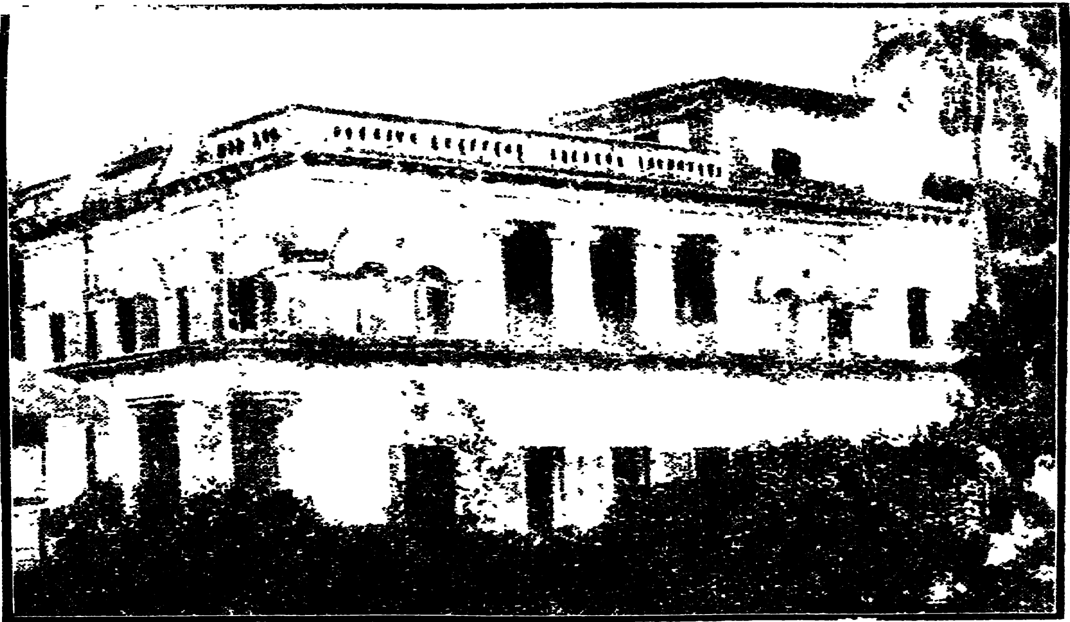
১৯১০ অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী অশ্বিনীকুমার নির্ব্বাসন হইতে মুক্তি লাভ করেন।

পঞ্চম অধ্যায়

পরিবারে অশ্বিনীকুমার

আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান্ সরলকুমার দত্ত তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত অশ্বিনীকুমার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—শৈশবে পিতৃহীন হইয়া আমরা যে ভাবে তাঁহার বুকে আশ্রয় পাইয়াছি, সেই ভাবেই তাঁহার জীবদ্দশায় আমাদের দিন কাটিয়াছে। পিতার অভাব তিনি কোন দিন বোধ করিতে দেন নাই এবং একাধারে তাঁহার নিকট হইতে মাতাপিতার স্নেহ পাইয়াছি। তাই তাঁহার কথা লিখিতে যাইয়া ব্যক্তিগত কথাই হয়ত অধিক থাকিবে, সেইজন্য ক্ষমা করিবেন। জ্যেঠামহাশয়ের স্নেহ ও আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়া যে কতদূর অনাথ ও দীন হইয়া পড়িয়াছি, তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না।

আমাদের জীবনে জ্যেঠামহাশয় যে কতখানি ছিলেন, তাহা কেবল তাঁহাকে হারাইয়াই ভাল করিয়া বুঝিতেছি, তিনি জীবিত থাকিতে আমাদের তাহা বুঝিতে দেন নাই। জ্যেঠা-মহাশয়ই ছিলেন আমাদের জীবনপথে প্রধান ও পরম সম্বল। সংসারে আমাদের ভাল মন্দ কোন কাজই আমরা বিচারবুদ্ধিতে করিতে পারি নাই। শুধু ভাল কাজ করিলে জ্যেঠামহাশয়



অশ্বিনীকুম রর বরিশাল সহরের বাড়ী

২৫ পৃঃ

খুসী হইয়া আদর করিবেন, ইহাই ছিল পরম পুরস্কার। অন্যায় করিলে তাঁহার মুখ কালো হইবে, আমরা তাহা সহিতে পারিতাম না। আজ কীর্ত্তিখ্যাতি শুষ্ক বোঝার মত মনে হইতেছে—কারণ এই সকলের পিছনে যে হাসিটুকু ছিল, তাহা আমরা হারাইয়াছি।

আমরা জ্যেঠামহাশয়কে পারিবারিক জীবনের মধ্যেই পাইয়াছি এবং তিনি জীবিত থাকিতে পরিবারের মধ্যে যে ছন্দ ও সুর জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন, আজও তাহার কিছু কিছু আছে। ছেলেবেলায় আমাদের মানুষ করিয়া তুলিবার ভার তাঁহার উপরই ছিল এবং এই কর্ত্তব্য তিনি একটু স্বতন্ত্র রকমেই সম্পন্ন করিতেন। আমার যতদূর মনে হয় শৈশবে আমাদিগকে কোন নীতিকথা বুঝাইয়া কেহ শিক্ষা দেন নাই। জ্যেঠামহাশয়ও কোন দিন বলেন নাই, "এ কথা বলিস্‌নে, বা এ কাজ করিস্‌নে।" কিন্তু এমন ভাবেই আমাদের ভালবাসিতেন যে, দুর্নীতিপূর্ণ কোন অন্যায় কাজ করিতেই পারিতাম না, পাছে তিনি দুঃখ পান তাহাই ছিল আমাদের ভয়। মিথ্যা কথা বলা, থিয়েটার দেখা বা অন্য কোনরূপ বিলাস বা ব্যসন জ্যেঠামহাশয়ের জীবদ্দশায় আমাদের পরিবারে স্থান পায় নাই—কারণ তাহাতে তিনি খুসী হইতেন না। তিনি নিজে জীবনে কোন দিন থিয়েটার দেখেন নাই বা বিলাসিতা কি জানিতেন না। বাড়ীর ভৃত্যবর্গও কোনরূপ চুরি বা অপকার্য্য করিত না, কারণ

কর্ত্তা টের পাইলে দুঃখ পাইবেন। জ্যেঠামহাশয়ের খুসী ও ইচ্ছানুযায়ী চলাই ছিল আমাদের পরিবারের প্রধান নিয়ম ও পরম পরিতোষ।

ঐরূপ ব্যক্তিগত মতের প্রাধান্য দেওয়া হইত বলিয়া অনেক সময়ে বাহিরের লোক একটু বিরক্তও হইতেন এবং আমাদের বাড়ীর ভৃত্যগণ এইজন্য একটু 'বেহায়া' বলিয়া বদ্‌নাম লাভ করিয়াছিল। আমার মনে আছে, আমাদের বি, এম্, কলেজে যখন সরকারী সাহায্য লওয়া হয় তখন জ্যেঠামহাশয় আমাদের প্রত্যেককে ডাকিয়া সরকারী সাহায্য লওয়ার সুফল ও কুফল সোজা কথায় বুঝাইয়া দিয়া ছেলেপিলে, কর্ম্ম-চারী ও ভৃত্য সকলের মতামত জানিয়া লইয়াছিলেন। বিষয়-সংক্রান্ত কোন কথাই আমাদের পরিবারে কাহারও কাছে গোপন থাকিত না। তাহাতে অনেক কথা বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ায় ক্ষতিও হইয়াছে যথেষ্ট। কিন্তু এই ক্ষতি অনিবার্য্য ছিল, কারণ পরামর্শ সভায় জ্যেঠামহাশয় সকলকে আহ্বান করিয়া লইতেন।

বাহিরের এত কাজে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি পরিবারের কোন কর্ত্তব্যে কখনও ভুল করেন নাই। কাহার অসুখ হইয়াছে, কে বাড়ীতে নাই, রাত্রিতে কেন ঘোড়াটা ক্ষুধার তাড়নায় ডাকে, ইত্যাদি খুঁটিনাটি সকল খবরই তাঁহার জানা থাকিত। দীর্ঘ নির্ব্বাসনে থাকিয়া তিনি আমাদের কাছে যে পত্র লিখিতেন তাহা পড়িলেই সকল কথা স্পষ্ট হইবে। পত্রে তিনি

কত ধর্ম্মকথা, কত সুন্দর আখ্যায়িকা লিখিয়া আমাদের উপদেশ দিতেন, আবার আমাদের পত্রে তারিখ দেওয়া না থাকিলে ত্রুটী ধরিতেন। সকলের খবর না লিখিলে দুঃখিত হইতেন। এমন কি আমাদের ঘোড়ার খবর, প্রাঙ্গণের আমলকী, তমাল ও ম্যাগ্‌নোলিয়া গাছের খবর, বিষ্ণুমন্দিরের খবর—সকল কথা বিভিন্ন দফায় সবিশেষ লিখিয়া জানাইতে হইত। আজ সংসারে প্রবেশ করিয়া পদে পদে ভুল হইয়া যায়, নানারূপ ত্রুটী-বিচ্যুতি ঘটিতেছে, আর সজলনয়ন হইয়া জ্যেঠামহাশয়ের কথা ভাবিয়া অবাক্ হইতেছি।

লোকনিন্দা হইলে জ্যেঠামহাশয় বলিতেন "আচ্ছা একটু হো'ক, তাতে ক্ষতি কি?" গুরুতর আর্থিক ক্ষতি হইলে বলিতেন, "যানে দেও"। বাড়ীতে কোন বিপদ্ হইলে বলিতেন, "সংসারে এ ত আছেই, এর জন্য কি সব চলে যাবে?" তাঁহার মনের অফুরান আনন্দের কাছে যেন কোন দুঃখের স্থানই ছিল না। বর্ষাধিক কাল শয্যাশায়ী অবস্থায় থাকিয়াও বলিতেন, "নালিশের আছে কি? ৬৭ বছর ত বেশ কেটেছে, এক বছর শুয়ে থাকার জন্য নালিশ কিসের?" Stroke হওয়ার পরে যখন কথায় ভুল হইত, তখন ভুল করিয়া তিনি নিজেই হাসিয়া কুটিপাটি হইয়া বলিতেন—"ভক্তিযোগ হয়ে গেছে, কর্ম্মযোগও সারা, এখনকার পালা হচ্ছে গোলযোগের।" তাঁহার এই আনন্দপূর্ণ উদ্বেগহীন সরল মনটি

জগতে সকল দুঃখকষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া চলিত এবং আমাদেরও মনে কথঞ্চিৎ এই ভাব সংক্রামিত করিয়া দিত। মনে এই সুন্দর ভাবটি লাভ করিতে আমাদের কোন বিপুল প্রয়াসের প্রয়োজন হয় নাই। ভগবান্‌ই আমাদের এই বিষয়ে ভাগ্যবান্ করিয়া দিয়াছিলেন।

শাসন আমাদের পরিবারে ছিল একটু বিভিন্ন রকমের। বাহির হইতে আমাদের বাড়ী দেখিলে মনে হইত যেন একটি হোটেলে কতকগুলি লোক একত্র বাস করে—কোন শাসন নাই। উপহাস করিয়া আমাদের বাড়ীকে অনেকেই বলিতেন, "অশ্বিনী দত্তের হোটেল।" কিন্তু কেহ একটু বেশীদিন থাকিলেই শাসনের বিশেষত্ব বুঝিতে পারিতেন। জ্যেঠামহাশয় আমাদের কোন দিন ভয় দেখাইয়া শাসন করেন নাই, করিতে পারিতেনও না। কি আশ্চর্য্য উপায়ে তিনি আমাদের এই বৃহৎ পরিবারের সকলকে একটি মালায় গাঁথিয়া লইয়াছিলেন, তাহা ভাবিয়া বিস্মিত হই। গালাগালি, প্রহার, ভ্রূকুটি ইত্যাদি আমাদের বাড়ীতে কাহারও কোন দিন জানা ছিল না। আমাদের আচারপদ্ধতির স্বাধীনতা কোনদিন কঠোর শাসনে খর্ব্ব করা হয় নাই। যাহা কিছু নিয়ম ও শৃঙ্খলা পরিবারে ছিল, তাহা আপনা হইতেই আসিয়াছিল। আমাদের আত্মসম্মান উদ্বোধিত করিয়া বিচারবুদ্ধি ও কর্ত্তব্যবোধ জাগাইয়া দিয়া জ্যেঠামহাশয় আমাদের সুনিয়ন্ত্রিত করিতেন। খাওয়া দাওয়ায় দেরী করিলে বলিতেন, "তোমরা ঠাকুর কি পরিশ্রম করচে

বোঝনা, তাকে তোমাদের বিশ্রাম দেওয়া উচিত।" চাকরকে বেশী খাটাইলে বলিতেন—"চাকর তোমার সাহায্য করবে —ওকে দিয়ে সব কাজ করান উচিত নয়।" ইত্যাদি। আমার মনে আছে একবার একটি মুসলমান ভৃত্য ইদের দিনে কয়েক সের ভাল চাল চুরি করে, পরামর্শ বৈঠকে স্থির করিয়া আমরা জ্যেঠামহাশয়কে বলিলাম—"ওকে পুলিশে দি'ন।" অমনি তিনি বলিলেন, "ছি, ছি, আমার বাড়ীর লোককে শাসন করবে অন্যে—লজ্জার কথা, আর তা'তে কি ওর কোন সম্মান থাক্‌বে? সে হবে না—যা হয় আমরাই ওকে শাসন করে দেব।" আমরা সকলে, এমন কি ভৃত্যগণ পর্য্যন্ত, অশ্বিনীবাবুর বাড়ীর লোক বলিয়া শ্লাঘা বোধ করিতাম। এইজন্য বিশৃঙ্খলভাবে জীবন যাপন বা অন্যায় কার্য্য করিতে আমরা সাহস পাইতাম না।

আর একটি মজা আমাদের বাড়ীতে ছিল, যাহা আজকাল বড় দেখা যায় না। সমাজের বাহিরে যাহারা, লোকে যাহাদের দূরে রাখিয়া দেয় আমাদের বাড়ীতে তাহাদের আনাগোনা ছিল। একদিকে পাগল, চরিত্রহীন, গঞ্জিকাসেবী, আর অন্যদিকে সন্ন্যাসী এখানে সকল রকমের লোকের ভিড় হইত। সকলেই জ্যেঠামহাশয়ের অতি প্রিয় ছিল এবং সকলেই ভাবিত—"বাবু আমাকেই ভালবাসেন বেশী।" পাগল দুষ্মন্ত-বিক্রমাদিত্য, গঞ্জিকাসেবী গুরুজান্, আজিজ্ পাগলা, ভেগাই হালদার সকলেই আমাদের বাড়ীকে তাহাদের আপন

বাড়ী মনে করিত। খাওয়া দাওয়া এবং অন্য কোন বিষয়ে তাহাদের বিন্দুমাত্র ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। বড় বড় অতিথি এবং এই শ্রেণীর লোক সকলেরই পরিবেশন সমভাবেই চলিত। ইহাদের কেহ জ্যেঠামহাশয়ের সহিত এক তক্তপোষে বসিয়া গল্প করিত, কেহ তাঁহাকে দোস্ত ডাকিত, কেহ আবার গঞ্জিকা সেবন বা অন্য কোন কাজের জন্য আব্‌দার করিয়া ধম্‌কাইয়া পয়সা লইয়া যাইত, যেন পয়সাগুলি তাহাদের গচ্ছিত ধন। সন্ন্যাসীর জন্য আমাদের বাড়ীর দ্বার ত সর্ব্বদাই মুক্ত ছিল। তাঁহারা কেহ মাসাধিক কালের কম আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন বলিয়া মনে হয় না।

একবার আমাদের বাড়ীতে একটি পাগল ও কোন সন্ন্যাসী এক সময়ে আসিয়া স্থান লয়। পাগলটি সন্ন্যাসীর গেরুয়া বস্ত্র দেখিয়া ও নিশীথে নাম কীর্ত্তন শুনিয়া চটিয়া যায় এবং এই সন্ন্যাসীকে স্থান দেওয়ার জন্য তিরস্কার করিয়া বলে—"এ একটা মস্ত পাগলের আড্ডা, এখানে থাকা আমার সম্ভব নয়।" সন্ন্যাসী আবার চরিত্রহীনের আশ্রয়প্রাপ্তিতে অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি জ্যেঠামহাশয়কে বলিলেন "এসব লোককে স্থান দেওয়া কেন?" জ্যেঠামহাশয় একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন—"এ বাড়ীটা একটা চিড়িয়াখানা। আমার মাথাতেও একটু ছিট্ আছে। তাই চিড়িয়াখানায় থাকিতেই ভালবাসি।"

আজ কিন্তু আমাদের বাড়ীর সে আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া

গিয়াছে। সেই নানা শ্রেণীর লোকের পদধূলিপূত তীর্থস্থান আর নাই। কে জানে কবে আবার আমাদের গৃহ উৎসব-মুখরিত হইয়া হাসিয়া উঠিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রন্থকার অশ্বিনীকুমার

ভক্তিযোগ

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ‘প্রবাসী’ পত্রিকায় বঙ্গের বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণের অভিমত লইয়া বঙ্গভাষার একশতখানি উৎকৃষ্ট পুস্তকের এক তালিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমারের “ভক্তিযোগ” উক্ত উৎকৃষ্ট শত পুস্তকের অন্যতম ছিল। এই পুস্তক যখন প্রকাশিত হয় তখন সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া গ্রন্থকারকে লিখিয়াছিলেন—“আমার বিশ্বাস যে, এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আমি বাঙ্গলা ভাষায় সংপ্রতি দেখি নাই অথবা বাঙ্গলা ভাষায় অল্পই দেখিয়াছি।” স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছিলেন—“আমি আপনার গ্রন্থ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া যে কত পরিতৃপ্ত হইয়াছি, বলিতে পারি না। আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে, আপনার পুস্তক পাঠে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বিশেষ উপকৃত হইবেন। বিশেষতঃ উদাহরণগুলি অতি চমৎকার হইয়াছে।

অশ্বিনীকুমারের গুণ-মুগ্ধ দেবগৃহের ঋষি রাজনারায়ণ বসু



ভক্ত অশ্বিনীকুমার

১৫৮ পৃঃ

মহাশয় "ভক্তিযোগ" পাঠে পরম পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"তুমি বরাবরই আমার প্রিয় কিন্তু এই গ্রন্থ-প্রকাশে তুমি "প্রিয়াবতারে খলু ন সতী" নিশ্চয়ই পূর্ব্বাপেক্ষা আমার প্রিয় হইলে। তুমি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য এই গ্রন্থ লিখ নাই, সকল সম্প্রদায়ের জন্য লিখিয়াছ, ইহা আমার বিশেষ সন্তোষের কারণ হইয়াছে। রিপু-দমন যাহা পৃথিবীতে সকল কার্য্য অপেক্ষা কঠিন এবং যাহাতে বড় বড় ধার্ম্মিক লোক হার মানেন এবং যাহাতে এমন কি আমাদিগের কোন কোন প্রধান প্রাচীন যোগী মুনির অক্ষমতার নিদর্শন পুরাণে বর্ণিত আছে, সে বিষয়ে তুমি তোমার গ্রন্থে অনুষ্ঠান-যোগ্য অনেক নিয়ম ও প্রকরণাবলীর ব্যবস্থা দিয়াছ। সেই সকল নিয়ম পালন ও প্রকরণাবলীর অনুসরণ করিলে পাঠক রিপু-দমনে অবশ্য কৃতকার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই।

"তুমি যেখানে ঈশ্বরপ্রেমের বিষয় লিখিয়াছ সেই সকল স্থান অমৃত ; সেই অমৃত—যাহা দেবতারা তাঁহা হইতে নহে, তাঁহাতে অহর্নিশ পান করিতেছেন। শিশু যেমন মাতৃবক্ষে সংলগ্ন হইয়া স্তন্য পান করে, তাঁহার হস্ত হইতে তাহা পায় না, সেইরূপ দেবতারা ঈশ্বর বক্ষে একেবারে সংলগ্ন হইয়া, সেই বক্ষের সহিত একীভূত হইয়া,সেই ব্রহ্মানন্দরূপ অমৃতধারা পান করেন। এই জন্য "তাঁহাতে" শব্দ ব্যবহার করিলাম "তাহা হইতে" নহে। তুমি ভক্তির যে সকল লোমহর্ষক ও

অশ্রু-নিঃসারণকারী গল্প তোমার গ্রন্থে বলিয়াছ, তাহা চমৎকার। এত রত্ন তোমার মনোভাণ্ডারে সঞ্চিত ছিল, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। ঐ সকল গল্প স্মরণ করিয়া "হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহু, হৃষ্যামি চ পুনঃপুনঃ"। তুমি পরিশেষে এমন গ্রন্থ রচনা করিয়াছ যাহা মানববর্গ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিস্মৃতি-সাগরে বিলীন হইতে দিবে না।"

বস্তুতঃই 'ভক্তিযোগ' চিরকাল আদৃত হইবার মত অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। যাহারা এই পুস্তক পাঠ করিয়াছেন তাহাদিগকে ইহা একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের সরল ও আন্তরিক সমালোচনা অতিরঞ্জিত নহে। অশ্বিনীকুমার যদি শিক্ষা, রাজনীতি প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে যশোভাজন হইতে নাও পারিতেন, তথাপি "ভক্তিযোগ-প্রণেতা" বলিয়া বিশেষ কীর্ত্তি লাভ করিতেন, এইরূপ মনে হয়। "ভক্তিযোগ" মৌলিক গ্রন্থ না হইতে পারে, শিল্প ও সৌন্দর্য্যের বিচারে সাহিত্যিকেরা এই গ্রন্থখানিকে সাহিত্য-সৃষ্টির উচ্চ শ্রেণীতে স্থান দান করিতে সম্মত হইবেন না, তথাপি ভবিষ্যৎ বংশীয়েরা এই গ্রন্থখানি কোনদিন বিস্মৃত হইবেন বলিয়া মনে হয় না। বঙ্গভাষায় যুবক ও বালকদের উপযোগী সুনীতিগ্রন্থ এমন আর একখানিও নাই।

যিনি রস-স্বরূপ সেই পরম দেবতার প্রতি পরানুরক্তি এবং তাঁহার বিমল সৌন্দর্য্য সম্ভোগই মানব-জীবনের গৌরবময় পরিণাম। সাধারণ মানুষও পাপের সহিত সংগ্রাম করিয়া

কি প্রকারে এই চরম গৌরব লাভ করিতে সমর্থ হইতে পারে "ভক্তিযোগে" তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

অশ্বিনীকুমার বহুভাষাবিৎ ও নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। উপনিষৎ, গীতা ও ভাগবত তাঁহার একরূপ কণ্ঠস্থ ছিল। তাঁহার স্মৃতি-শক্তিও অসাধারণ ছিল। তিনি অভিনিবেশ-সহকারে যাহা পড়িতেন কখনও তাহা বিস্মৃত হইতেন না। টেনিসন্, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ্, বাইরন্, সেলি প্রভৃতি কবিদিগের সুদীর্ঘ কবিতা তিনি অনায়াসে পরমানন্দে আবৃত্তি করিতেন। হাফেজের কবিতা তাঁহার মুখে প্রায় সর্ব্বদা শুনা যাইত। ভক্ত অশ্বিনীকুমারের "ভক্তিযোগ" নানা শাস্ত্রমথিত অমূল্য রত্ন। এই গ্রন্থ তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক।

১২৯৪ অব্দে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে অশ্বিনীকুমার ভক্তিতত্ত্বসম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র রায় ও শ্রীযুক্ত ললিতমোহন সেন উক্ত বক্তৃতাগুলির মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেই পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করিয়া 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। বরিশাল সহরের 'কাশীপুর-নিবাসী' পত্রিকার প্রবীণ সম্পাদক মহাশয় উক্ত বক্তৃতাগুলি শুনিয়াছিলেন। তিনি এই পুস্তক সমালোচনায় লিখিয়াছেন— "বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে অশ্বিনীবাবু ভক্তিযোগ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন তদবলম্বনে এই পুস্তক রচিত হইয়াছে। আমরা সেই বক্তৃতাগুলি শ্রবণ করিয়াছিলাম। যখন অশ্বিনীবাবু বক্তৃতা করিতেন, তখন সভাস্থ সকলে

অনন্যমনা হইয়া তাহা শ্রবণ করিত। সভায় কখনও হাসির রোল উঠিত, কখনও নয়নাশ্রু পতিত হইত। আমরা জানি, এই বক্তৃতাদ্বারা অনেকের জীবন-স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, 'ভক্তিযোগের' ন্যায় গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ শীঘ্র বাহির হয় নাই। ধর্ম্মজীবন যাঁহারা গঠন করিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে ত ভক্তিযোগ অমূল্য রত্ন। চিন্তাশীলতা যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের নিকট ভক্তিযোগ বড়ই আনন্দপ্রদ। নানা শাস্ত্রমথিত বহুমূল্যরত্নাবলীর যাঁহারা একত্র সমাবেশ দেখিতে চাহেন তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিযোগ মধুর হইতেও মধুর হইবে।"

ভক্তিযোগের বক্তৃতাগুলি শ্রোতাদের মনের উপর কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল সম্পাদক মহাশয়ের মন্তব্য হইতে আমরা তাহা অবগত হইতে পারিলাম। এইরূপ না হইবেই বা কেন? একে ত ভক্তির কথা স্বভাবতঃই সুমধুর, তারপর সেই ভক্তি-তত্ত্ব যিনি ব্যাখ্যা করিতেন তিনিও ভক্ত, শিশুকাল হইতেই হরিনামরসে মাতোয়ারা।

অশ্বিনীকুমার তাঁহার গ্রন্থারম্ভে ভক্তি কাহাকে বলে নানা শাস্ত্রবাক্য হইতে তাহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। ভগবৎপদে যে একান্ত রতি তাহারই নাম ভক্তি। যাঁর মুকুন্দপদে এইরূপ আনন্দসান্দ্রা ভক্তি হয়, মোক্ষ স্বয়ং আসিয়া তাঁর পায়ে লুণ্ঠিত হয়। ভক্ত মুক্তির জন্য লালায়িত হন না, মুক্তিই তাঁহার পদাশ্রয়ের জন্য লালায়িত। যাহাতে মোক্ষপদ তুচ্ছ

এমন ভক্তির নাম অহৈতুকী ভক্তি। প্রহলাদের প্রাণে প্রথম হইতেই এই ভক্তির আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। তিনি দিবানিশি কৃষ্ণ নাম জপ করিতেন। মুখ্যা ভক্তিও ইহারই নাম। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কোন ভক্তি হইতে পারে না, ইহার নিম্নস্তরে যে ভক্তির উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহাকে ভক্তি না বলিলেও দোষ হয় না। কিন্তু মন্দ ব্যক্তিও তাহার নিকৃষ্ট ভক্তি সাধন করিতে করিতে উচ্চ ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়, এই জন্য গৌণী ও হৈতুকী ভক্তিও উপেক্ষণীয় নহে।

ভক্ত অশ্বিনীকুমার আমাদিগকে এই আশার কথা শুনাইয়াছেন—"ক্রমাগত শাস্ত্র্যাধ্যয়ন ও শাস্ত্রশ্রবণ এবং ভগবানের স্বরূপপ্রতিপাদক তর্ক করিতে করিতে ও শুনিতে শুনিতে ভগবদ্বিষয়ে মতি হয়, তাঁহাতে ভাব হয়। অমন মধুর বিষয়ের আলোচনা করিতে করিতে তাহাতে লোভ না হইয়া যায় না। লোভ হইলে প্রাণে টান হয়, টান হইলেই রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হয়। ভগবানের নাম উপর্য্যুপরি শুনিতে শুনিতে মানুষ ক'দিন স্থির থাকিতে পারে? কত নাস্তিক ভগবানের কথা শুনিতে শুনিতে পাগল হইয়া গিয়াছে।"

"যিনি সর্ব্বান্তঃকরণে ভক্ত হইতে চান, ভগবান্ তাঁহার সহায়, তাঁহার বাঞ্ছা সিদ্ধ হইবেই। কেহ যেন এমন কথা মুখেও আনেন না যে, এ সংসারে ভক্ত হইবার উপায় নাই, তাহা হইলে ভগবানের প্রতি ভয়ানক দোষারোপ করা হয়।

কেহ দুরাচার হইয়াও ভগবানকে ডাকিলে সে অল্পদিনের মধ্যে ধর্ম্মাত্মা হইয়া যায় এবং নিত্য শান্তি লাভ করে। তবে আর নিরাশ হইবার কারণ কোথায়? সকলেই বুক বাঁধিয়া অগ্রসর হইতে পারেন, ভগবান্ সকলকেই কৃতার্থ করিবেন। আমরা যত জগাই মাধাই আছি সকলেই উদ্ধার হইয়া যাইব।"

"চুম্বক পাথর যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমন তিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করিতেছেন। কাদামাখান লৌহখণ্ডের মত বলিয়াই আমরা তাঁহাতে লাগিতে পারিতেছি না, কাঁদিতে কাঁদিতে যাই কাদা ধুইয়া যাইবে অমনি টক্ করিয়া তাঁহাতে লাগিয়া যাইব। তাঁহাকে ডাকিতে হইবে এবং পাপের জন্য কাঁদিতে হইবে, তাহা হইলেই তাঁহার কৃপার অনুভূতি হইবে। ইহাতে বিদ্যা, ধন ও মানের প্রয়োজন নাই। তিনি যাঁহাকে কৃপা করেন সেই ব্যক্তিই তাঁহাকে পান।"

"ভগবানকে ডাকিবার এবং তাঁহার কৃপা উপলব্ধি এবং তাঁহাতে প্রাণ সমর্পণ করিবার পথে কতকগুলি বাধা আছে। কুসঙ্গ, কুচিত্র দর্শন, কুসঙ্গীত শ্রবণ, কুগ্রন্থ অধ্যয়ন প্রভৃতি ভক্তিপথের বাহিরের কণ্টক। আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, উচ্ছৃঙ্খলতা, সাংসারিক দুশ্চিন্তা, পাটওয়ারি বুদ্ধি অর্থাৎ কৌটিল্য, বহ্বালাপের প্রবৃত্তি, কুতর্কেচ্ছা, ধর্ম্মাড়ম্বর এবং লোকভয় প্রভৃতি ধর্ম্মপথের মানস কণ্টক।"

ভক্তিপথের এই বাহ্য ও মানস কণ্টকগুলি দূর করিবার অনুষ্ঠানযোগ্য উপায় নির্দ্দেশ করিয়া ভক্ত অশ্বিনীকুমার আমাদিগকে বলিয়াছেন—

আত্মচিন্তা ভক্তিপথের প্রধান সহায়। প্রত্যেক দিন যদি আমরা ভাবিয়া দেখি—কি অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছি, সৎকার্য্য কত করিয়াছি, অসৎ কার্য্যই বা কত করিলাম, পাপের সহিত কিরূপ সংগ্রাম করিতেছি—তাহা হইলেই নিজের যথার্থ অবস্থা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিব। এইরূপে যিনি নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া থাকেন, তিনিই ভগবানের শরণাপন্ন হইতে ব্যাকুল হন। ইহাই ভক্তির প্রথম সোপান। কুসঙ্গ যেমন ভক্তিপথের কণ্টক, সৎসঙ্গ তেমনি ভক্তিপথের সহায়। সাধুগণ তাঁহাদের সদুপদেশরূপ কিরণমালা দ্বারা লোকের হৃদয়ের পাপরূপ অন্ধকার সর্ব্বতো-ভাবে নাশ করেন। যিনি প্রাণের সহিত ভগবৎ কথা কহেন, তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করা আমাদিগের কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেই ফল পাইব। "সঙ্গগুণে রং ধরিবেই নিশ্চয়।" সাধুসঙ্গে কি উপকার হয় জগাই মাধাইএর উদ্ধার উহার দৃষ্টান্ত।

যিনি যে দেবতার উপাসক তিনি সেই দেবতার পূজা আরাধনা করিলে ভক্তিলাভ করিতে পারেন। যাহারা মূর্ত্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না তাহাদিগের পক্ষে প্রকৃতির মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার চিন্তা

ও লীলাকীর্ত্তন প্রভৃতি করাই কৃষ্ণসেবা। বিশ্বময় ভগবানের আশ্চর্য্য রচনাকৌশল ও বিবিধ খেলা দেখিলে কাহার না প্রাণ তাঁহাতে ডুবিয়া যায় ?

ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ বিশেষ উপকারী। ভগবানের স্বরূপবর্ণন লীলাকীর্ত্তন, শক্তিপ্রচার ও ভক্তদিগের কাহিনী যে গ্রন্থে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সেইসকল অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিলে মন ভক্তিপথে অগ্রসর হইয়া থাকে।

নাম কীর্ত্তন, শ্রবণ ও জপ ভক্তিপথের প্রধান সহায়। ভগবানের নাম ও লীলাকীর্ত্তনরূপ ব্রত যিনি অবলম্বন করিয়াছেন, সেই প্রিয়তম ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে অনুরাগের উদয় ও চিত্ত দ্রবীভূত হয়। বন্ধু-বান্ধব লইয়া প্রতিদিন কোন সময়ে নাম সংকীর্ত্তন করার ন্যায় আনন্দের ব্যাপার আর নাই। সত্য সত্যই তখন আনন্দসাগর উথলিয়া উঠে, প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়, বিষয়বাসনা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য তিরোহিত হয়। নামকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রেমের সঞ্চার ও পাপ নাশ হয়।

নাম জপ করিতে হইলে নামের অর্থ ও শক্তি জানিয়া লইতে হইবে। যিনি যে নাম মন্ত্র-স্বরূপ জপ করিবেন উহার অর্থ ও শক্তি তাঁহার জানা আবশ্যক। যে সাধক মন্ত্রের অর্থ কিংবা শক্তি জানেন না তিনি শত শত বার জপ করিলেও তাঁহার মন্ত্র সিদ্ধ হইবে না। ক্রমাগত নাম জপ করিলে কি লাভ হয় তাহা ভক্ত কবীর আপন জীবনে বুঝিতে

পারিয়াছিলেন। কবীর তাঁহার দোঁহায় ব্যক্ত করিয়াছেন—"কবীর তুমি তুমি করিতে করিতে তুমি হইয়া গেল, তোমাতেই মগ্ন হইয়া রহিল, তোমাতে আমাতে মিলাইয়া গেল, এখন আর মন অন্য দিকে যায় না।" জপ করিতে করিতে সাধক এই অবস্থা প্রাপ্ত হন, ভগবানে ডুবিয়া যান, চারিদিকে তাঁহাকে ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডময় ভগবৎস্ফূর্ত্তি হইতে থাকে।

তীর্থ ভ্রমণ বা তীর্থে বাস করিলে হৃদয়ে ভক্তির ভাব জাগরিত হয়। তীর্থকে পুণ্যস্থল বলে কেন? ভূমির কোন অদ্ভুত প্রভাব, জলের কোন অদ্ভুত তেজ কিংবা মুনিদিগের অধিষ্ঠান জন্য তীর্থ পুণ্যস্থল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

জ্বালামুখী তীর্থে গিরিনিঃসৃত বহ্নিশিখা, সীতাকুণ্ডে জলের উষ্ণ প্রস্রবণ, কেদারনাথে তুষার-মণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ, হরিদ্বারে প্রসন্নসলিলা ভাগীরথী দর্শন করিলে কাহার না প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়? আর বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া, নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের লীলা মনে করিয়া, অযোধ্যায় রামচন্দ্রের কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিয়া কাহার না হৃদয়ে পবিত্র ভাবের উদয় হয়? আর কেবল সাধুস্মৃতির কথাই বা বলি কেন? তীর্থস্থলে মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কত লোক কৃতার্থ হইয়াছেন তাহা মনে করিলেও প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হয়।

ভগবানকে নিবেদন না করিয়া কোন কার্য্য করিব না, কোন বাক্য বলিব না, কোন চিন্তাকে মনে স্থান দিব না

যদি একবার এইরূপ ভাব হৃদয়ে দৃঢ় করিয়া লইতে পারি তবে আপনা হইলে প্রাণ ভক্তিতে ভরিয়া যাইবে। সকল বিষয়ে তাঁহাকে স্মরণ করিলে মানুষ তাঁহাতে আকৃষ্ট না হইয়া পারেই না।

অতঃপর ভক্তির ক্রম ও ভক্তের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়া ভক্ত অশ্বিনীকুমার শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পাঁচ প্রকার ভক্তিরস ব্যাখ্যা করিয়া তাঁহার ভক্তিতত্ত্বের ব্যাখ্যান শেষ করিয়াছেন।

ঈশ্বরে যখন নিষ্ঠা হয়, সংসারাসক্তি যখন লোপ পায় তখনই মন শান্ত হয়। শান্তরস ভক্তির প্রথম সোপান। পরমেশ্বর যে পরমব্রহ্ম, পরমাত্মা—শান্তরসে ভক্তের চিত্তে এই জ্ঞান জন্মিয়া থাকে।

দাস্যরতিতে ভক্তের মনে মমতার সঞ্চার হয়। তিনি ভগবানের সেবা করিতে ব্যস্ত হন। কৃষ্ণসেবা ভিন্ন তাঁহার আর কিছু ভাল লাগে না। তিনি ভগবানের নিকট কিছুই কামনা করেন না, কেবল তাঁহার সেবা করিতে চাহেন।

সখ্যরসের প্রধান লক্ষণ ভক্তের নিকট ভগবান্ অপেক্ষা কেহ প্রিয়তর নহেন। গুহরাজ বলিয়াছেন, "পৃথিবীতে রাম অপেক্ষা কেহ আমার প্রিয়তর নাই।" যে ভক্ত প্রাণের ভিতর ভগবানের সহিত ক্রীড়া করেন, তিনিই সখ্যরসের মাধুরী সম্ভোগ করিতে পারেন। সখ্যরতিতে ভক্ত ভগবানকে আপনার অলঙ্কার করিয়া লন। বৃন্দাবনের পথে অন্ধ

বিল্বমঙ্গলের পথপ্রদর্শক কৃষ্ণ বলপূর্ব্বক তাঁহার হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে তিনি বলিয়াছিলেন—"হে কৃষ্ণ, তুমি বলপূর্ব্বক হস্ত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? হৃদয় হইতে যদি দূর হইতে পার, তবে তোমার পৌরুষ আছে মনে করিব।" ভক্ত তাঁহার সখাকে একেবারে হৃদয়ের অলঙ্কার করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। ভগবানের আর পালাইবার পথ নাই।

বাৎসল্যরসে ভগবান্ গোপাল। ভক্ত তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় আদর করেন, স্নেহ করেন, ক্রোড়ে তুলিয়া লন। মাতা যশোদার নিকট ভগবান্ গোপাল-বেশে উপস্থিত হইয়া প্রেম ভিক্ষা করিতেন, তিনি তাঁহাকে একটু আদর দেখাইয়া পরে বিমুখ করিতেন, আবার যদি তিনি অন্তর্হিত হইতেন, অমনি গোপাল-হারা ভক্ত অনুতাপে ছট্‌ফট্ করিতেন।

প্রাণে মধুররসের সঞ্চার হইলে—"সতী যেমন পতি বিনে অন্য নাহি জানে"—ভক্তও তেমনি ভগবান্ ভিন্ন আর কিছু জানেন না। এই অবস্থায় ভক্ত ও ভগবান্—সতী ও পতি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এইভাবে বিভোর হইয়াছিলেন। চৈতন্য ও ভগবান্—রাধা ও কৃষ্ণ, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। যিনি এই মধুররসে ডুবিয়াছেন তাঁহার আর বাহিরের ধর্ম্মকর্ম্ম থাকে না। তিনি 'বেদবিধি ছাড়া'। পাগল হাফেজ্ এই জন্যই তাঁহার শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের গোপিকাগণের কামগন্ধহীন প্রেম মধুররসের পরম আদর্শ।

এই রসের আবেশে প্রাণে কি ভাবের উদয় হয় আমরা তাহার কি বুঝিব ? তখন হৃদয়বল্লভকে বুক চিরিয়া হৃদয়ের ভিতরে পূরিয়া রাখিলেও পিয়াস মিটে না। ভগবানের সঙ্গে বুকে বুকে, মুখে মুখে থাকা যে কি, তাহা আমরা কি কিছু বুঝিতে পারি ? এই ভাবের আবেশে বিভোর হইয়া বিল্বমঙ্গল বলিয়াছিলেন—"এই বিভুর শরীর মধুর। মুখখানি মধুর মধুর, মধুর , অহো, মৃদু হাসিটি মধুগন্ধি—মধুর, মধুর, মধুর, মধুর !"

ভক্তির চরমোৎকর্ষ এই পর্য্যন্ত। ইহার পর কি তাহা কে বলিবে ?

ভক্তিযোগ ইংরাজী ও ভারতীয় বহু ভাষায় অনূদিত হইয়া সমগ্র ভারতে প্রচলিত হইয়াছে। ইংলণ্ডের মনস্বী সমালোচক ষ্টপ্‌ফোর্ড্ ব্রুক্, ডাউডেন্, বষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ওয়ারেন্ এবং অধ্যাপক টনি সাহেব এই সদ্‌গ্রন্থখানির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন।

Rev. Stopford A. Brooke, M. A., L. L. D,, লিখিয়াছেন —

"Since I have read, I have been in another world than this noisy world of the West, where we spend our days in pursuing nothing which we think everything, and I have felt as if I could live otherwise. And in my old age I shall

have time to assimilate, I hope, a great deal of that which this book of yours ought to give to me, I am grateful to you for it,

The way it has been done will help us over here to take in and digest its lessons. The little stories which illustrate your points of thought and practice are of great interest, and I am personally delighted wtth the quotations from the poets of India. The life of that great country is made clearer and nearer to me."

কর্ম্মযোগ

অশ্বিনীকুমারের কোন স্নেহাস্পদ বন্ধু—'কর্ম্মযোগ' রচনা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে—ইহা জানিতে চাহিয়া তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। ভগ্ন-স্বাস্থ্য সুরসিক অশ্বিনীকুমার পত্রোত্তরে লিখিয়াছিলেন—"আমার 'কর্ম্ম-ভোগ' আর এই মরধামে থাকিতে কি প্রকারে শেষ হইবে?" কর্ম্মযোগের ভূমিকায় পূজনীয় শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও লিখিয়াছেন—সঙ্কল্পিত ধারা অনুসারে গ্রন্থখানি সম্পূর্ণ হইলে বৃহদায়তন হইত কিন্তু গ্রন্থকারের রোগজীর্ণ দেহ হইতে সে সঙ্কল্প-সিদ্ধির সম্ভাবনা নাই দেখিয়া অগত্যা এই পুস্তকে কর্ম্মযোগের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁহার স্থূল স্থূল বক্তব্য বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা হইল।

গ্রন্থকার এবং ভূমিকা-লেখক দুইজনেই গ্রন্থখানি অসমাপ্তভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু গ্রন্থখানি পাঠ করিলে অশ্বিনীকুমারের কর্ম্মযোগ-সম্বন্ধে বক্তব্য সম্পূর্ণরূপেই বুঝিতে পারা যায়। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিষ্কাম কর্ম্মের যে মহোচ্চ আদর্শ অর্জ্জুনের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন গ্রন্থকার আলোচ্য গ্রন্থে ভারতীয় ও বিদেশীয় সকল শাস্ত্র হইতে যুক্তি ও প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া সেই কর্ম্মযোগেরই বিবৃতি করিয়াছেন। কর্ম্মযোগে অশ্বিনী-কুমার আমাদিগকে বলিয়াছেন—

এই সংসার কর্ম্মভূমি। স্বয়ং ভগবান্ মহাকর্ম্মী। তিনি এই ব্রহ্মাণ্ডগৃহের মহাগৃহস্থ। স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বব্যাপী এই মহাপরিবারের যাহার যাহা প্রয়োজনীয় তিনি তাহা যথাযথরূপে নিত্যকাল যোগাইতেছেন। কর্ম্ম ভিন্ন এই সংসারে কাহারও তিষ্ঠিবার সাধ্য নাই। আত্মরক্ষা ও জগৎ রক্ষার জন্য সকলেই কর্ম্মচক্রে ঘূর্ণায়মান। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ভিন্ন আমাদের উদ্ধারের অন্য পন্থা নাই। জাতীয় উত্থান-পতন কর্ম্ম নিরপেক্ষ হইতে পারে না। ভারতবর্ষ যখন নিষ্কাম কর্ম্মের উচ্চ আদর্শ বিস্মৃত হইল তখনই এই দেশের অধোগতি আরম্ভ হইল। কর্ম্ম অন্তর্ম্মুখ করিয়া লইলে উহার দ্বারা যেমন বাহিরের মঙ্গল সাধিত হয় তেমন ভিতরের মঙ্গলও সংসাধিত হইয়া থাকে, কর্ম্মকুণ্ঠ অকাল সন্ন্যাসী ও কর্ম্মাসক্ত ঘোর বিষয়ী কাহারও ইহা ধারণার বিষয় রহিল না।

ভগবান্ সচ্চিদানন্দ। আমাদের জীবনেও এই সচ্চিদানন্দের লীলা চলিতেছে। আমরা যত দিন হৃদয়ে হৃদয়ে এই সচ্চিদানন্দকে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিব তত দিন 'কর্ম্মযোগ' 'কর্ম্মভোগেই' পর্য্যবসিত হইবে। জগৎ ব্যাপিয়া আংশিকভাবে ক্রমেই যে এই সচ্চিদানন্দের প্রতিষ্ঠা হইতেছে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। সিকাগোর সর্ব্বসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমহাসমিতি, হেগের (Hague) আন্তর্জ্জাতিক বিবাদ-মীমাংসক মধ্যস্থ ধর্ম্মাধিকরণ এবং সার্ব্বভৌমিক জাতীয় মহাসমিতি ইহারই নিদর্শন। কবি যে ভুবন-মিলন (Federation of the word) কল্পনার দিব্য-চক্ষে দেখিয়াছেন তাহা একদিন যে সংগঠিত হইবে হেগ ধর্ম্মাধিকরণে তাহারই পূর্ব্বভাস দেখা যাইতেছে।

মহাভারতে বিদুর বলিয়াছেন—"যাহা সর্ব্বভূতের হিতজনক, আপনার সুখপ্রদ তাহাই করিবে। কর্ত্তার পক্ষে ইহাই সর্ব্বার্থ-সিদ্ধির মূল।"

দার্শনিক চূড়ামণি ক্যাণ্ট্ও ঐ কথাই বলিতেছেন—"এমনভাবে কর্ম্ম কর যেন তোমার কর্ম্মের মূলসূত্র বিশ্বগত বিধি বলিয়া গ্রহণ করিতে পার।"

সুপ্রসিদ্ধ যোষেফ্ ম্যাট্সিনি কর্ম্মীকে উপদেশ দিয়াছেন—"তুমি পরিবারের কিংবা দেশের জন্য যে কার্য্য করিতে যাইতেছে তাহার প্রত্যেক কার্য্যের পূর্ব্বে আপনাকে জিজ্ঞাসা করিবে, আমি যাহা করিতে যাইতেছি তাহা যদি সকল মনুষ্যই

করিত এবং সকলের জন্যই করা হইত, তদ্দারা সমগ্র মানব-সমাজের মঙ্গল হইত, কি ক্ষতি হইত ? যদি তোমার বিবেক বলে ক্ষতি হইত, তাহা হইলে থামিবে, যদি তদ্দারা স্বদেশ কিংবা স্বপরিবারের আপাত কোন লাভও হয় তথাপি থামিবে।”

এই যে কর্ম্মের কথা বলা হইল এস্থলে স্বার্থপরতা ও পরার্থ-পরতা এক, আমার প্রয়োজন ও বিশ্বের প্রয়োজন এক। ইহাকেই বলা যায় বিশ্বব্যাপী যিনি অর্থাৎ বিষ্ণু, তাঁহার প্রীত্যর্থে কর্ম্ম করা। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগের এই মূলমন্ত্রই বলিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রীতিকাম যে কর্ম্ম তাহা ভিন্ন অন্য কর্ম্ম সংসারে আবদ্ধ করে, অতএব বিষ্ণুপ্রীত্যর্থে অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম কর।

কর্ম্মের এই উচ্চ আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নিখিল ভারত কিরূপে রাজসিকতা ও তামসিকতার গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়াছে তাহা বিবৃত করিয়া অশ্বিনীকুমার আমাদিগকে এই আশার বাণী শুনাইয়াছেন,—“ঋষিগণ, ভক্তগণ এই দেশের অস্থিমজ্জায় সাত্ত্বিক ভাব এমন দৃঢ়ভাবে প্রবেশ করাইয়া দিয়া-ছিলেন যে,অদ্যাপি সামান্য কৃষক তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসিলে সে কিছুতেই তাহা প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইবে না, পাছে তাহাতে তাহার মনে অহঙ্কার স্থান পায়। এখনও এমন অনেক লোক আছেন যাহারা সংবাদপত্রে নাম প্রকাশ না পায় তজ্জন্য অতি সঙ্গোপনে দান করেন।”

"কর্ত্তার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি, কোন জাতির প্রতি হিংসাদ্বেষে দগ্ধবুদ্ধি হইয়া আমরা যেন অন্তঃসারশূন্য বাহ্য উন্নতির মোহে মুগ্ধ না হই। আমরা যেন ঋষিনির্দ্দিষ্ট সাত্ত্বিক লক্ষ্য স্থির রাখিয়া শুভেচ্ছাদ্বারা সমস্ত পৃথিবী আবৃত করি। আমাদের ব্যক্তিগত, জাতিগত, রাষ্ট্রগত যাবতীয় উদ্যম, অনুষ্ঠান ও প্রচেষ্টা বিষ্ণুপ্রীতিকাম হউক!"

প্রেম

বাঙ্গলা ১৩০০ অব্দে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের 'বান্ধব-সমিতিতে' অশ্বিনীকুমার ছাত্রদের নিকট 'প্রেম' সম্বন্ধে তিনটি বক্তৃতা করেন। অতঃপর ঐ বক্তৃতা তিনটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষক অশ্বিনীকুমার ছাত্রমণ্ডলীকে এই প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহার মর্ম্ম এই—

আজকাল বাজারে সয়তান প্রেম নাম দিয়া অনিষ্টকর পদার্থ বিক্রয় করিতেছে। যুবকগণ তাহা না বুঝিয়া ক্রয় করিতেছে। প্রেমের নামে কাম, মোহ বিকাইতেছে। প্রকৃত প্রেম জগতের সার, অমূল্য পদার্থ, স্বর্গ হইতে প্রেরিত হয় ধরাকে স্বর্গে পরিণত করিবার জন্য। স্বয়ং প্রেমস্বরূপ প্রেম প্রেরণ করেন। যেখানে ভগবানে মতি নাই সেখানে প্রেম দাঁড়াইতে পারে না। প্রেমের ভিত্তি ভগবান্। যুবকগণ, অনুসন্ধান করিয়া দেখ তোমাদের ভালবাসার মূলে ভগবান্ আছেন কি না? যাহাকে ভালবাস তাহার সহিত ভগবানের কথা বলিতে ইচ্ছা করে কি না? পবিত্রতা সঞ্চয়ের জন্য পরস্পর সাহায্য করিতেছে কি না?

যে স্থলে পবিত্রতা নাই সেস্থলে ভালবাসা নাই। প্রেম-স্বরূপের সত্তা পবিত্রতাময়। পৃথিবীর কোন কলঙ্ক যে ভাল-বাসায় লাগিয়াছে সে ভালবাসা কখন ভালবাসা নামের উপযুক্ত নহে। তুমি যাহাকে ভালবাস একবার তাকাইয়া দেখিও, তাহার মুখ দেখিলে ভগবানকে মনে পড়ে কি না ?

প্রেম সম্বন্ধে সর্ব্বদা আত্মপরীক্ষা করিবে। তোমার ভাল-বাসার পাত্র তোমার আত্মসংযম নষ্ট করে কি না ? কর্ত্তব্য কার্য্য করিবার ইচ্ছা কমাইয়া দেয় কি না ? তাহার মিলন বা বিরহে প্রাণ বিশেষভাবে চঞ্চল হয় কি না ? তাহাকে লইয়া তরল আমোদ করিতে ইচ্ছা হয় কি না ? তোমাকে যিনি ভাল-বাসেন তিনি আর কাহাকেও ভালবাসিলে মনে ঈর্ষার উদয় হয় কি না ? যদি দেখ আত্মসংযম নষ্ট হয়, কর্ত্তব্য কার্য্যে ব্যাঘাত হয়, তরল আমোদ করিতে ইচ্ছা হয়, ঈর্ষার উদয় হয়, তবে জানিও তোমার এ কলঙ্কিত ভালবাসা প্রকৃত ভালবাসা নহে !

প্রেমের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্ম স্বার্থরাহিত্য। প্রেম কখনও আপনাকে চিনে না। পরের জন্য সর্ব্বদা উন্মত্ত। স্বার্থপরতা আর প্রেম বিরুদ্ধধর্ম্মী। যেখানে স্বার্থপরতা সেখানে প্রেম নাই। যত প্রেমের বৃদ্ধি তত স্বার্থপরতার হ্রাস। প্রেমিক প্রেমাস্পদের সুখের জন্য নিজের সুখ ত্যাগ করেন। সামান্য সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কোন অকিঞ্চিৎকর পদার্থ ভোগ করিতে হইলেও আগে প্রেমাস্পদের ভোগ চাই, নতুবা প্রেমিক তাহা ভোগ

করিবেন না। আর বিষম সঙ্কট সময়ে যখন মরুভূমির মধ্যে পিপাসায় প্রাণ যায় যায় হইয়াছে, একজন বই দুইজনে পান করিতে পারে এতটুকু মাত্র জলের সংস্থান হইল না, সে স্থলেও প্রেমাস্পদের জীবনরক্ষা পূর্ব্বে। পিথিয়াস্ বলে, 'ড্যামন্, তুমি থাক, আমি মরি'। আবার ড্যামন্ বলে, "না, তা' হবে না, আমিই মরিব।" কিছুতেই ড্যামন্ পিথিয়াস্‌কে, আবার পিথিয়াস্ ড্যামন্‌কে মরিতে দিবেন না। দুইজনেই নিজের প্রাণ দিয়া বন্ধুর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পাগল। ইহাই প্রেমিকের ছবি। প্রেম প্রতিদান চায় না, মোহ প্রতিদান চায়।

"দিলে নিলে বদল পেলে
ফুরিয়ে গেল প্রেম পিয়াসা।"

এই বিনিময়ের ভাব তো বণিগ্‌বৃত্তি। প্রকৃত প্রেমিক কখনও বণিক্ হইতে পারেন না। তিনি ভালবাসিয়াই সুখী, প্রেমাস্পদের ভালবাসা পাইবার জন্য ব্যাকুল নন। 'ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে'—প্রেমিকের ধর্ম্ম।

প্রেমের ব্যাপিত্ব মনে করিলে বড়ই আনন্দ হয়। যিনি বিশ্বব্যাপী তাঁহার খাস্ তহবিলের মাল কি না, তাই প্রেম বিশ্ব গ্রাস করিতে ধাবিত। প্রেমের ক্রমে বিস্তৃতি, ক্রমে বিস্তৃতি। আজ ভালবাসিলাম একজন, সে আনিল আর একজন, পাইলাম দুইজন, মধুচক্র বাঁধিবার চেষ্টা হইল, ক্রমে আরও দুই একজন আসিল, জমিতে জমিতে কত জমিয়া গেল। একজন, দুইজন, তিন জন, ক্রমে দশজন, এইরূপে পঞ্চাশ জন, একশত জন,

এইরূপে প্রেমাস্পদের সংখ্যা বাড়িতে বাড়িতে চলিল। প্রেমের চালনা যত অধিক হইবে, প্রেমিক জগৎ ততই অধিক সুন্দর দেখিতে থাকিবেন। ততই অধিক জীবে প্রেম ছড়াইয়া পড়িবে।

ক্রমে সমগ্র মনুষ্যমণ্ডলীময় প্রেম ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। অবশেষে মানব-রাজ্য অতিক্রম করিয়া সজীব নির্জ্জীব সমস্ত পদার্থই আয়ত্ত করিয়া ফেলে! তখন জগন্ময় কেবল মধু বর্ষণ হইতে থাকে। প্রকৃত প্রেমিক সত্য সত্যই দেখেন—"দিবাকরে সুধাকরে সুধা ক্ষরে, সুধামাখা হয়ে পবন সঞ্চরে, সরিৎ বহে সুধা, মেঘে সুধা ঝরে, চরাচরে সুধামাখা সমুদয়।" এই অবস্থায় যখন পহুঁছিবে তখন আনন্দের সীমা থাকিবে না। তখন যাহা সম্মুখে দেখিবে তাহাই জড়াইয়া ধরিতে ছুটিয়া যাইবে।

দুর্গোৎসবতত্ত্ব

অশ্বিনীকুমারের অপর পুস্তক তিনখানির মত "দুর্গোৎসব তত্ত্বও" তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে প্রণীত। কিন্তু অপর তিনখানি পুস্তকে যেমন অসাম্প্রদায়িক সার্ব্বজনীন বিষয় আলোচিত হইয়াছে এই পুস্তকখানিতে সেইরূপ বিষয় আলোচিত হয় নাই। এই পুস্তক বরিশালের "ধর্ম্মরক্ষিণী সভায়" প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে, দুর্গোৎসবকারী হিন্দুজনমণ্ডলীর জন্য লিখিত হইয়াছে। এই পুস্তকে অশ্বিনীকুমারের ধর্ম্মবিষয়ক অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া জীবনচরিত আলোচনার দিক্ দিয়া এই পুস্তকখানির বিশেষ মূল্য আছে।

হিন্দু-সমাজে অধুনা যে-ভাবে দুর্গোৎসব করা হয় তৎসম্বন্ধে অশ্বিনীকুমার নিম্নলিখিত তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

আজ হিন্দু প্রকৃত দুর্গাপূজা করে কৈ? আমি যতদূর বুঝি, প্রায়ই ত দেখিতে পাই পুতুলের পূজা হইয়া থাকে। হিন্দু সত্য সত্যই পৌত্তলিক হইয়াছে। তাহারা সর্ব্বব্যাপিনীকে, আদ্যাশক্তিকে সামান্য মাটীর পুতুলে পরিণত করিয়াছে। তাহা না হইলে তাঁহার সম্মুখে অশ্লীল গান, সুরাপান, এবং নানা প্রকার কুৎসিত আমোদ করিতে সাহস পায় কে? যিনি শুদ্ধা, অপাপবিদ্ধা তাঁহার পূজা করিতে বসিয়া কে পাপের স্রোতে গা ঢালিয়া দিতে পারে? তাঁহার সাক্ষাতে পাপ করিতে কাহার না হৃৎকম্প উপস্থিত হয়? যিনি সর্ব্বব্যাপিনী তাঁহাকে এতদূর সঙ্কোচ করা হয় যে, কোন কোন হিন্দু বলিয়া থাকেন, এই পাঁঠাটি পাষাণময়ী কালীবাড়ীতে দিও, চামার পটীর কালীবাড়ীতে দিও না, যেন কালী পাষাণময়ী কালীবাড়ীতে আছেন, চামার পটীতে নাই। আমাদের সঙ্কীর্ণতা আরোপ করিতে করিতে ভগবানকে এত খর্ব্ব করা হইয়াছে যে, আপনারা শুনিলে অবাক্ হইবেন, কোন্ ব্যক্তি প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া তামাক সাজাইয়া একটি হুকা লইয়া তাহার ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেন, পরে তাঁহাকে পায়খানায় নিয়া বসাইতেন, তারপর তাঁহার মুখ প্রক্ষালন ও অঙ্গারচূর্ণাদি দ্বারা দন্ত ধাবনাদি করিয়া দিতেন। আবার

কোন কোন ব্যক্তিকে দেখা যায়, শীতকালে ঠাকুরের কাপড়ের জন্য ব্যতিব্যস্ত, বলিয়া থাকেন, তাঁহাকে কাপড় না দিলে শীতে কষ্ট পাইবেন। হায়, হায়, যেন একখানি বালাপোষ না পাইলে ভগবান্ যিনি, তিনি আমাদের ন্যায় শীতে কষ্ট পান! যিনি পরাৎপর, পরব্রহ্ম, ত্রিভুবনেশ্বর, যাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া শীতগ্রীষ্ম ঋতুচক্র ঘুরিতেছে, সেই জগদীশ্বর নাকি শীতে কাঁপিতে থাকেন। হায়, কি বিড়ম্বনা। ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হইতেছে? আর্য্য সন্তানগণ ভগবৎ পূজা ছাড়িয়া নিতান্ত সঙ্কীর্ণ-হৃদয় পৌত্তলিক হইয়া পড়িয়াছেন।

পূজা করিতেছি অথচ মিথ্যাকথা কহিতেছি, পরের অপকার করিতেছি, ইন্দ্রিয়লালসায় প্রাণ ভাসাইয়া দিয়াছি, হিন্দু মহাশয়দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহারা বলুন এই ভাবে পূজা করিলে পূজা হয় কি না? প্রকৃত পূজা করিতে করিতে উপাস্য দেবতার ভাব পূজকে সঞ্চারিত হইবেই হইবে। আমাদের দেশে তাহা কি হইতেছে? যে শক্তি-পূজা লোককে শক্তিমান্ করিবার জন্য, সেই শক্তিপূজা করিয়া এই দেশের কোটী কোটী প্রাণী নিতান্ত নির্জ্জীবের মত অবস্থায় মূষিকের ন্যায়, পিপীলিকার ন্যায় কালাতিপাত করিতেছে। ইহার নাম কি পূজা? এখন কেবল বাহিরে ঢাকঢোলের বাজ্না, বলিদানের ঘটা, ডাকের গয়নার সজ্জা, আর কিছুই নয়। প্রকৃত শক্তিপূজা এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে।

মূর্ত্তিপূজা সম্বন্ধে অশ্বিনীকুমার নিম্নলিখিতরূপ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন —

আমার একটি বিশ্বাস আছে, মূর্ত্তি কি সাকার পদার্থের পূজা কোন কোন লোকের মধ্যে আপনাআপনি আসিয়া পড়ে। খৃষ্টানদিগের ত মূর্ত্তিপূজার বিধান নাই, তথাপি রোমান-ক্যাথলিক্ দলে খ্রীষ্ট ও তাঁহার মাতার মূর্ত্তিপূজা হইয়া থাকে। শিখধর্ম্মে মূর্ত্তিপূজা নিষেধ, তথাপি শিখগণ কি করিতেছেন ? তাহাদের ধর্ম্মমন্দিরে গুরুপ্রণীত গ্রন্থের পূজা হইয়া থাকে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ত সাকার পূজার বিরোধী ছিলেন, এখন শুনিতে পাই, তাঁহার কোন কোন অনুচর না কি তাঁহার উত্তরীয় ও পাদুকা পূজা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এইরূপ অনেক দৃষ্টান্ত দেখান যাইতে পারে। স্থূলবুদ্ধি মনুষ্য একটা কিছু সাকার না পাইলে কিছুই ধারণা করিতে পারে না। এমন অনেক লোক আছেন, তাহাদিগকে ঈশ্বর নিরাকার, নির্ব্বিকল্প, চিন্ময় বলিলে তাঁহাকে শূন্য বলিয়া মনে করেন, নাস্তিকতায় গড়াইয়া পড়েন। এইজন্য বোধ হয় পাশ্চাত্য সাধারণ লোক অপেক্ষা এইদেশের সাধারণ লোক সুশীল ও অপেক্ষাকৃত ধর্ম্মভীরু।

অশ্বিনীকুমার শাস্ত্রবচন বিবৃত করিয়া বলিতেছেন—ভগবান্ ও জীব এক হইয়া গিয়াছেন এই ভাব উত্তম, ধ্যান-ভাব মধ্যম, স্তুতিজপ অধম, বাহ্যপূজা অধমের অধম। কিন্তু অধমের অধম বলিয়া কেহ ইহা উড়াইয়া দিবেন না। ইহার

অনেক প্রয়োজন। ইহা হইতে ক্রমে ক্রমে নির্গুণ ব্রহ্মে পঁহুছান যায়। অল্পবুদ্ধি লোকদিগের জন্য বাহ্যপূজা—নিরাকারার সাকার পূজা আবশ্যক হয়।

স্থূলে মন নিশ্চল হইলে, পরে সূক্ষ্মেও মন নিশ্চল হয়। একটি গল্প প্রচলিত আছে,—কোন একটি ছাত্র বেদ পড়িতে গিয়া মন স্থির রাখিতে পারে না দেখিয়া গুরু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার মন এদিক ওদিক যায় কেন? সে উত্তর করিল, 'আমার একটি প্রিয় মহিষ আছে, আমার মন কেবল সেদিকে ধায়।' গুরু তাহাকে আজ্ঞা করিলেন—'তবে তুমি বেদ ছাড়িয়া মহিষই ভাবিতে থাক।' মহিষাটাকে ভাবিতে ভাবিতে যখন মন স্থির হইল, তখন তাহাকে পুনরায় বেদ পড়াইতে আরম্ভ করিলেন, শিষ্য এবার কৃতকার্য্য হইলেন। বাহ্যপূজা কেবল মনকে সূক্ষ্মের দিকে লইয়া যাইবার জন্য, রূপ হইতে অরূপে যাইবার জন্য, নাম হইতে নামের উপরে উঠিবার জন্য, কেবল মনটাকে বাঁধিবার জন্য এসব করা হইয়াছে।

ভক্ত তুলসীদাস একটি দোঁহায় বলিয়াছেন, বালিকা যতদিন আপন প্রিয়তম স্বামীর দেখা না পায় ততদিন পুতুল লইয়া খেলা করে। আর যাই স্বামীর সহিত দেখা হইল অমনি সব পুতুল পেটারায় বন্ধ হইল। যতদিন পরমেশ্বরের সহিত দেখা না হয় ততদিন রূপ-নাম লইয়া খেলা, আর যাই ব্রহ্মজ্ঞান হইল খেলাও শেষ। কেবল যে রূপই কল্পনা

তাহা নয়, ব্রহ্ম বলুন, আল্লা অথবা আর যাই বলুন, সমস্তই কল্পনা। সুতরাং রূপ ও নাম এই দুইয়ের শেষ হবে যখন, মুক্তি হবে তখন।

রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি
জেনেও মন কি তা' জান না ?
মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তাঁর
করতে চাওরে উপাসনা ?

আরও গাহিয়াছেন,

ত্যজিব সব ভেদাভেদ
ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকারা।

দেখুন ভক্ত রামপ্রসাদ কোথা হইতে কোথায় উঠিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের মধ্যে দেখিতে পাই বৃদ্ধেরাও পাঠশালায় রহিয়া গেলেন। উপরে আর উঠিতে পারিলেন না। উঠিবেন কি করিয়া ? এই দুর্গাপূজা আসিতেছে, কেহ কি চিন্তা করেন দুর্গাপূজা কি ? তাহা অনুসন্ধান করিলে তবে ত উন্নতি হইবে। নতুবা 'ক-খ'তেই আরম্ভ 'ক-খ'তেই শেষ।

দুর্গাপূজার মন্ত্রার্থ এবং প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া অশ্বিনীকুমার দেশ-প্রচলিত পূজা-পদ্ধতির একটি বিশেষ দৌর্ব্বল্য নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—

এখন পূজা করিবে কে? যে শাস্ত্রে পূজায় বিধি রহিয়াছে সেই শাস্ত্রই বলিয়াছেন—"স্বয়মসমর্থে ব্রাহ্মণং বৃণুয়াৎ" নিজে না পারিলে ব্রাহ্মণ নিয়োগ করিবে। কিন্তু এই নিয়ম অনুসারে কি কেহ কার্য্য করিয়া থাকেন? ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতির প্রায় কেহই নিজে পূজা করেন না। ব্রাহ্মণেরাই বা কয়জনে করিয়া থাকেন? ভগবানকে ডাকিতে হইলে কি মোক্তারদ্বারা ডাকিতে হইবে? চণ্ডীমণ্ডপে পূজা হইতেছে, ব্রাহ্মণ মন্ত্র পড়িতেছেন, আমি ততক্ষণ ঘরে বসিয়া প্রজার বাজে জমা আদায় করিতেছি কিংবা 'কবি' গানের বন্দোবস্ত করিতেছি। এই ভাবে পূজা করিলে কি ফল হইতে পারে? এ দিকে যে ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইয়াছেন তিনি হয়ত উষ্ট্র স্থলে একবার বলিতেছেন উষ্ঠ আবার বলিতেছেন উষ্ট্র এবং সতৃষ্ণ নয়নে এক একবার নৈবেদ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছেন। কি অপূর্ব্ব পূজাই হইতেছে! নিজে যদি পূজা করিতে না পার, তবে ব্রাহ্মণ ডাক; কিন্তু ব্রাহ্মণের নিকট মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া লইয়া যাহাতে মনে ভক্তির সঞ্চার হয় তাহা করা দরকার। যদি আম্‌মোক্তার কি উকীল নিযুক্ত করিতে হয় তবে সচ্চরিত্র, শুদ্ধ, শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ যেন নিয়োগ করা হয়। আমরা যে উকীল কি আম্‌মোক্তার দিয়া পূজা করাইয়া থাকি তাহারা প্রায়ই মোকদ্দমা নষ্ট ও তহবিল তস্‌রুপ করিয়া থাকেন।

অশ্বিনীকুমারের রচিত কতগুলি সরল, সরস, শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত "দুর্গোৎসব-গীতি" নামক এক পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

গুণগ্রাহী ও রসগ্রাহী অশ্বিনীকুমার

আমরা এমন অনেক লোকের কথা জানি যাহারা প্রাণ খুলিয়া পরের প্রশংসা করিতে পারেন না। ইহাতে যেন তাহারা ক্লেশ বোধ করেন, কিন্তু অশ্বিনীকুমারের স্বভাব ছিল ইহার বিপরীত, যাহারা যথার্থ গুণী তাহাদের গুণের প্রশংসা করিয়াই তিনি পরম আনন্দ লাভ করিতেন, বরিশাল সহরের অনেক গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়নিহিত বিকচোন্মুখ গুণরাজি তাঁহার সহানুভূতিরূপ সলিল-সেচনে অবাধে দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ছোট চারাগাছগুলি যেমন আলো পাইবার জন্য আকাশের দিকে মাথা বাড়াইয়া দেয়, বরিশাল নগরবাসী গুণী ও জ্ঞানীরা তাহাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেক প্রচেষ্টায় সেইরূপ অশ্বিনীকুমারের সহানুভূতি পাইবার জন্য তাঁহার সমীপস্থ হইতেন। সকলেরই ইহা জানা ছিল যে, তাহাদের যদি কোন গুণ থাকে অশ্বিনী-কুমার উহার যেমন আদর করিবেন আর কেহ তেমন করিতে পারিবে না।

পরলোকগত ভক্ত ইন্দুভূষণ রায় মহাশয়ের রচিত কতকগুলি মধুর ভক্তিসঙ্গীত "রসলীলা" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। ভক্ত ইন্দুভূষণের ভক্তি-সঙ্গীতের সর্ব্বপ্রধান সমজ্‌দার ছিলেন অশ্বিনীকুমার। এক একটি গান রচনা করিয়া উহা শুনাইবার



গুণগ্রাহী অশ্বিনীকুমার

২৮৬ পৃঃ

জন্য তিনি এই গুণগ্রাহী মহাত্মার নিকট আগমন করিতেন। একদিন পতিব্রতা সাধ্বীর মত কপালে সিঁদূরের ফোঁটা দিয়া আসিয়া ভক্ত ইন্দুভূষণ গাহিয়াছিলেন—

"পথপানে চেয়ে জীবন গোঁয়ানু, বন্ধু আমার কেন এল না।" আর এক জ্যোৎস্নাধবল রাত্রিতে আসিয়া বেহাগ রাগিণীতে গাহিলেন—

"সে-কোন্ জোছনা দেশ সইরে।"

ভক্ত ইন্দুভূষণ গুণগ্রাহী পরম ভাগবত অশ্বিনীকুমারকে তাঁহার সঙ্গীত শুনাইয়া যে বিমল আনন্দ লাভ করিতেন, তাঁহার সঙ্গীতরচনায় উহাই ছিল প্রধান প্রেরণা।

আমরা যখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে পড়িতাম তখন প্রত্যেক বৎসর পূজার ছুটীর পূর্বে শারদোৎসব হইত। এই উৎসবে সঙ্গীত, কবিতা আবৃত্তি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিনয় দ্বারা নির্দ্দোষ আনন্দের আয়োজন করা হইত। ব্রাহ্মভক্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের কবিত্ব শক্তির আস্বাদন অশ্বিনীকুমার পাইয়াছিলেন বলিয়াই এই উৎসবের গান তিনি তাঁহার দ্বারা রচনা করাইতেন। তাঁহার রচিত—

"ভুলে যা' ভাই অতীতের সব বেদনা" (১৩০১)
"চল্‌রে চল্‌রে চল্‌রে ও ভাই জীবন আহবে চল" (১৩০৪)
"কাঁপায়ে মেদিনী কর জয়ধ্বনি জাগিয়া উঠুক মৃত প্রাণ"(১৩০৩)
"জাগরে উঠরে চলরে সবে, ভুবনবিজয়ী রবে" (১৩০৫)
"প্রমোদ মগন বিশ্বভুবন কহিছে গান গাহিতে।"

প্রভৃতি সঙ্গীতগুলি অশ্বিনীকুমারের উৎসাহে উৎসব উপলক্ষে রচিত। ভক্ত মনোমোহন এই যে উৎসাহ পাইয়াছিলেন উহারই ফলে উত্তরকালে তাঁহার "বিবিধ সঙ্গীত ও সংকীর্ত্তন" নামক সঙ্গীত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। গুণী ও ভক্ত মনোমোহন বাবুকে অশ্বিনীকুমার কনিষ্ঠ সহোদরের তুল্য স্নেহ করিতেন, এবং স্নেহপূর্ব্বক "ভাইটী" বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

বরিশালের হাস্যরসের রসিক কবি শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দাস মহাশয় তাঁহার রচিত কবিতা গুণগ্রাহী অশ্বিনীকুমারকে শুনাইয়া আনন্দানুভব করিতেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহার রচনার প্রশংসা করিতেন। অশ্বিনীকুমার যখন প্রবাসে থাকিতেন তখন সময়ে সময়ে চন্দ্রনাথবাবু কৌতুক করিয়া তাঁহাকে ভাবরসপূর্ণ কবিতায় চিঠি লিখিতেন। রোগশয্যাশায়ী অশ্বিনীকুমারকে তিনি ১৯২০ অব্দের ১৩ই মে এই কবিতাটি লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—

অশ্বিনীকুমার, কত বাকী আর,
এ দেহের ভার, ব'বে কত দিন ?
একি ব্যবহার, বুঝিনা তোমার
বুঝালে হাজার (বোঝেনা) জ্ঞানবুদ্ধিহীন।
যাবেইত যাও, ঘাটে বাঁধা নাও,
এখনো ঘুমাও, ধর ভব পাড়ি ;
করিবেন পার, ভবপারাবার
ভবকর্ণধার, ভবভয়হারী।
"শিব শিব" বলে, যাও তুমি চলে

আমরা সকলে দেই হরিবোল,
গণেশেরে (১) সাথে নিয়ে যেও পথে
যাইলে বিপথে মাথে ঢেলো ঘোল্।
বৈষ্টমী সুন্দরী, (২) চিরসহচরী,
নিও সাথে করি, মহাযাত্রাকালে ;
জগু (৩) তন্ত্রধার বয়স্য তোমার
কেবা আছে আর যোড়া হবে হালে ?
বিদূষক কবি, কি সুন্দর ছবি
যেন বালরবি পূরব গগনে।
সাথে নিও তারে তুষিবে তোমারে
আহারে বিহারে শয়নে স্বপনে।
করি এ মিনতি, হ'ক শুভ মতি,
চল শীঘ্রগতি অন্তিম যাত্রায়,
বিলম্বে কি কাজ, ওহে ব্রজরাজ,
স্বপনেতে আজ, কি দেখিনু হায়।

গুণগ্রাহী অশ্বিনীকুমারের পুণ্যস্পর্শে যাঁহাদের মঙ্গলশক্তি জাগরিত হইয়া কল্যাণবর্ত্মে প্রধাবিত হইয়াছিল শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন উঁহাদের অন্যতম। অশ্বিনীকুমারের অভিপ্রায়ে সুকণ্ঠ হেমচন্দ্র অভিনব কথকতাদ্বারা শ্রোতৃবর্গের মনোরঞ্জন করিতেছেন। লোকের প্রচ্ছন্ন শক্তিকে সহৃদয়তাদ্বারা

(১) অশ্বিনীকুমারের প্রিয় ভৃত্য, (২) পত্নী, (৩) ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত জগদীশ মুখোপাধ্যায়।

টানিয়া বাহির করিয়া উহাকে মঙ্গলকর্ম্মে নিয়োজিত করিবার শক্তি গুণগ্রাহী অশ্বিনীকুমারের প্রভূত পরিমাণে ছিল। কথক হেমচন্দ্র অশ্বিনীকুমারের সংস্পর্শে আসিয়াই আপনার শক্তির পরিচয় পাইয়াছিলেন। কোন লোকের দ্বারা কি কাজ করান যাইতে পারে মানুষ দেখিয়া তাহা বুঝিবার ক্ষমতা অশ্বিনী-কুমারের ছিল। এই প্রসঙ্গে কথক হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"তুমি মোরে কত দে'ছ, দে'ছ প্রাণভরি,
অসার নিজ্জীব জড়ে সঞ্চারিলে প্রাণ,
অন্ধজনে করিয়াছ দিব্যচক্ষু দান,
অধমেরে অধিকার দিয়াছ সেবার,
ভিখারীরে চিনায়েছ রতনভাণ্ডার।"

অশ্বিনীকুমারের বুকভরা ভালবাসার আকর্ষণে লোকে তাঁহার চারিদিকে ভিড় করিত, এবং তাঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের চৌম্বক শক্তি দ্বারা তিনি অনেক লোহাকে চুম্বকে পরিণত করিয়াছেন।

স্পর্শমণি অশ্বিনীকুমারের স্পর্শ পাইয়াই শ্রীযুক্ত মুকুন্দ দাস "মাতৃপূজার" পূজারী হইতে পারিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের ভাবরাজি যাত্রাওয়ালা মুকুন্দদাসের সরল সঙ্গীতে অভিব্যক্ত হইয়া শত শত নরনারীর চিত্তে দেশানুরাগের সঞ্চার করিতেছে।

স্বদেশীর যুগে বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের পরলোকগত শিক্ষক রামচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় "জাগরণ," "দীক্ষা" ও "দৈববাণী" নামক তিনখানি কবিতা পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন। তাঁহার কবিত্বপূর্ণ আবেগময়ী কবিতাপাঠে লোকের মনে দেশাত্মবোধ জাগরিত হইত। কবি রামচন্দ্রের এই কবিতা রচনার সহিত অশ্বিনীকুমারের কোন প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, কিন্তু আমরা জানি অশ্বিনীকুমারের বক্তৃতা তখন বরিশালে যে অগ্নিবৃষ্টি করিত রামচন্দ্রের কবিতা উহারই ছন্দোময় প্রকাশ।

যে সকল গুণবান্ ছাত্র ও শিক্ষক ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যপনাকালে পরলোক গমন করিয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমার তাঁহাদের স্মৃতির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া যথার্থ গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। শিক্ষক অক্ষয় কুমার সেন,কালীহর রায় ও ছাত্র হেমচন্দ্র বসুর স্মৃতি বিদ্যালয়ের প্রাচীর-গাত্রে মর্ম্মর ফলকে খোদিত রহিয়াছে। শিক্ষক হেমন্ত কুমার সেন ও ছাত্র হেরম্বচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর স্মৃতি পুস্তিকা প্রচার করিয়া রক্ষা করা হইয়াছে। হেরম্বচন্দ্রের প্রতি অশ্বিনীকুমারের শ্রদ্ধা এমন গভীর ছিল যে, তিনি তাঁহার ধর্ম্মজীবনের বৈশিষ্ট্য তৎপ্রণীত "কর্ম্মযোগে" বিবৃত করিয়াছেন। হেরম্বচন্দ্রের জীবনীপুস্তিকার ভূমিকাখানিও অশ্বিনীকুমারের লিখিত।

মানবের মহত্ত্ব বিকাশের জন্য যে, শিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্য-চর্চ্চার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে, ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের সঙ্গীতে উহা ব্যক্ত হইয়াছে। ললিতকলার আলোচনার জন্য এক সময়ে একটি সমিতিও এই বিদ্যালয়ে ছিল। আমরা যখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন ছাত্র ও শিক্ষকগণের সাহিত্য-

লোচনার উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত অশ্বিনীকুমারের অভিপ্রায়ে "ছাত্রবন্ধু" নামক একখানি ক্ষুদ্রকায় মাসিকপত্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। উক্ত মাসিকপত্রিকাখানিতে ছাত্র ও শিক্ষকগণের লিখিত ধর্ম্ম ও সুনীতিমূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত। বঙ্গের নানাস্থলের ছাত্রগণ এই পত্রিকার গ্রাহকও হইয়াছিল। পত্রিকাখানি কতকাল চলিয়াছিল তাহা ঠিক মনে নাই। এই গ্রন্থকার কিঞ্চিদধিক এক বৎসরকাল এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ঐ সময়ে অশ্বিনীকুমার এক সংখ্যায় "রাজগৃহের ঋষিপ্রবর"নামে একটি তথ্যপূর্ণ সুখপাঠ্য প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

এই দীন লেখকের রচনাশক্তির প্রতি অশ্বিনীকুমারের শ্রদ্ধা ছিল। এই শ্রদ্ধা তিনি নানাসময়ে নানাভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের উৎসাহেই ছাত্রজীবনে মৎপ্রণীত "হেমন্তকুমার," "হেরম্বচন্দ্র" ও "শান্তিরঞ্জন" নামক তিনখানি জীবনীপুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই লেখকের লিখিবার, বলিবার যাহা কিছু শক্তি সমস্তই অশ্বিনীকুমারের উৎসাহের প্রত্যক্ষ ফল।

পরলোকগত খোসালচন্দ্র রায় মহাশয় যখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন তখন ১৮৯৫ অব্দে তৎপ্রণীত "বাখরগঞ্জের ইতিহাস" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ প্রকাশে তিনি অশ্বিনীকুমারের নিকট যেমন উৎসাহ ও সহায়তা পাইয়াছিলেন অন্য কাহারও কাছে তেমন পান নাই।

কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের প্রিয়শিষ্য পরলোকগত সতীশচন্দ্র

রায় বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র। সতীশচন্দ্র যখন স্কুলের দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীতে পড়িতেন তখনই তিনি ছোট ছোট কবিতা লিখিতেন। ঐ সময়েই তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, সেলি, বাইরন্ প্রভৃতি কবিগণের কবিতাবলী, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের কবিতা আগ্রহে পাঠ করিতেন। আমার এখনও মনে পড়ে, কলেজের ও স্কুলের উচ্চ শ্রেণীর একদল ছাত্র সতীশের সাহিত্যানুরাগের নিন্দা করিত, তাহারা মনে করিত সতীশ পঠিত কবিতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন না, তাহার পড়া কেবল লোক-দেখানো ব্যাপার। কিন্তু অশ্বিনীকুমার এই বালকের কবিতা আবৃত্তি এবং সাহিত্যানুরাগের প্রশংসা করিতেন। একবার সতীশ শারদোৎসবে রবীন্দ্রনাথের "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাটি আবেগপূর্ণ মধুর কণ্ঠে আবৃত্তি করিয়া সভাস্থ সকলের, বিশেষতঃ অশ্বিনীকুমারের, প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। বরিশালে অধ্যয়নকালে বালক সতীশচন্দ্র একবার সরস্বতী পূজায় 'ধর্ম্মরক্ষিণী সভার' উৎসবের জন্য একটি গান রচনা করিয়া দিয়াছিলেন। গানটি প্রশংসিত হইয়াছিল। উহার প্রথম পদটি এই—

একি হেরি শোভা আজি
ভূতলে গগনে কাননে ;
শুভ্র শোভন চারিধার
হাসি প্রকৃতির আননে।

উত্তরকালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যানুরাগী সতীশচন্দ্রের

কবিত্বশক্তির প্রশংসা করিয়া তাঁহার অকাল মৃত্যুতে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন।

ঢাকার উকীল শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সুবক্তা ও সুলেখক। তাঁহার লিখিত অনেক সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রসিদ্ধ মাসিকপত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়া থাকে। তিনি যখন বরিশালে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তখনই তাঁহার বক্তৃতা ও রচনাশক্তি বিকশিত হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমারের পরোক্ষ প্রভাব ইহার মূলে নিহিত আছে বলিয়া মনে হয়। "ঢাকার পুরাতন কাহিনী" প্রণেতা স্বর্গীয় ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় এক সময়ে ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। "মনসা মঙ্গল" সঙ্কলয়িতা শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাসগুপ্ত এখনও ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে কার্য্য করিতেছেন; ইহাদের সাহিত্যপ্রচেষ্টার মধ্যে অশ্বিনীকুমারের কোন পরোক্ষভাব আছে কি না আমরা তাহা অসংকোচে বলিতে পারি না।

অশ্বিনীকুমার সুবক্তা ছিলেন। তাঁহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও বলিবার ভঙ্গী অনুকরণ করিয়া বরিশালে ছোট বড় অনেক বক্তার সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহ মহাশয় ইংরাজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া বরিশাল গমনের অল্পদিন পরেই এক সভায় সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। সেই সভায় বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের বক্তৃতা শুনিয়া তিনি হাসিতে হাসিতে এই মন্তব্য করিয়াছিলেন—"আমি জানিতাম বরিশালের মসূর ডালই উত্তম, কিন্তু এখানে যে, এত অধিক উত্তম বক্তা

আছেন, ইহা আমি জানিতাম না।" অধ্যাপক রজনীকান্ত গুহ মহাশয়ের উক্তি বস্তুতঃ সত্য, অশ্বিনীকুমারের প্রভাবে এক সময়ে বরিশালে অনেকেই সুন্দর বক্তৃতা করিতে পারিতেন।

ছাত্রগণ যাহাতে বক্তৃতা করিবার শক্তি অভ্যাস করিতে পারে তজ্জন্য ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে "তর্ক সমিতি" ছিল। এই সমিতির অধিবেশনে অশ্বিনীকুমার যাহাদিগের বক্তৃতা করিবার শক্তির কিছুমাত্র আভাস পাইতেন তিনি ঐ সকল ছাত্রকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিতেন। কুড়ীগ্রামের উকীল বাবু বসন্তকুমার ঘোষ মহাশয় যখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তখনই সুবক্তা বলিয়া তিনি বরিশালবাসীর নিকট সুপরিচিত হইয়াছিলেন। ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে যে দিন ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচন করা হয় সেই দিন অশ্বিনীকুমারের উপদেশমতে বসন্তবাবু ইংরাজীতে এমন একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, উহা শুনিয়া সভাপতি জজ্ ষ্টেলি সাহেব মহোদয় ও শ্রোতৃমণ্ডলী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়াছিলেন। বসন্তবাবুর বলিবার ভঙ্গী ও উত্তম উচ্চারণের প্রশংসা করিয়া অশ্বিনীকুমার বলিয়াছিলেন— "আমাকে বলিতে হইলে, আমিও ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর বক্তৃতা করিতে পারিতাম না।"

বাগেরহাট বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব হেড্মাষ্টার বাবু তারকনাথ দত্ত গুপ্ত মহাশয় যখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন তখন সুবক্তা বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। "গর্ডনের জীবনী" সম্বন্ধে

তিনি একটি সুললিত বক্তৃতা করিয়া প্রশংসার্হ হইয়াছিলেন। তখন ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও শিক্ষকদিগের মধ্যে অনেকেরই অল্লাধিক বক্তৃতা করিবার শক্তি ছিল। তাঁহাদিগকে শনিবারে ছাত্রদের তর্কসভায় এবং সান্ধ্যসমিতিতে উপদেশ প্রদান করিতে হইত।

সরস বাক্যালাপে অশ্বিনীকুমারের অসাধারণ পটুতা ছিল। বরিশালে তাঁহার গৃহের সেই চিরপরিচিত তক্তপোষের চারিধারে প্রতিদিন বালবৃদ্ধযুবক শত শত লোকের সমাবেশ হইত। সেখানে এমন আসরজমানো আলাপ হইত যে, শ্রোতারা অনেকে স্নানাহারের কথা ভুলিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিতেন। অশ্বিনীকুমারের সহিত অবাধভাবে মিশিতে কেহই সঙ্কোচ বোধ করিত না। তিনি যেন সকলের সমবয়সী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলিতে হইলে বলা যায়—'তিনি ছিলেন সকল দলের শতদল পদ্ম"।

যিনি যথার্থ রসিক অন্যের বাক্যের প্রকৃত রসগ্রহণের ক্ষমতা তাঁহার যেমন থাকে, অরসিকের তেমন থাকে না। একদা ব্রজমোহন কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহাশয় বি,এ পরীক্ষার্থীদের বাছনি পরীক্ষায় স্বরচিত একটি চতুর্দ্দশপদী ইংরাজী কবিতা ব্যাখ্যা করিতে দিয়াছিলেন। উহাতে লিখিত হইয়াছিল, অশ্বিনীকুমার যদি বরিশাল সহরে "Little Brothers of the Poor" দল গঠন না করিয়া "Big Brothers of the Rich" দল গঠন করিতেন তাহা হইলে চির-অমরতা লাভ করিতে পারিতেন।

এক সহৃদয় বৃদ্ধ শিক্ষক ইহার প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিষয়টি অভিযোগের আকারে অশ্বিনীকুমারের নিকট উপস্থিত করেন। অশ্বিনীকুমার উহা শুনিয়া হাসিয়া অধীর হইলেন। তিনি বলিলেন—"ঠিক লিখিয়াছে—a master-piece of humour, অতি উৎকৃষ্ট রসিকতা।"

শ্লেষাত্মক বাক্যকথনে অশ্বিনীকুমারের ক্ষমতা অসাধারণ ছিল। তাঁহার রচিত "ভারত-গীতির" গানেও তিনি বাঙ্গালী চরিত্রের দুর্ব্বলতাগুলি শ্লেষ করিয়া লিখিয়াছেন—

আহা রে, বাঙ্গালী বাবু যাই বলিহারি
কতরূপ ধর তুমি অপরূপধারী।
শিবের ছিল অষ্টমূর্ত্তি, তোমার হ'ল শত মূর্ত্তি,
রসনায় তব গুণ কি বর্ণিতে পারি।
ব্রহ্মারূপে সৃজন কর, বিষ্ণুরূপে কলম ধর,
শিবরূপে কত ঢাল, ব্রাণ্ডি, স্যাম্পেন্, সেরি।
(কভু) সাহেবী মেজাজে চল, কভু শিবদুর্গা বল,
কত রকম ভাব তোমার, কিছু বুঝ্‌তে নারি;
(কভু) মুরগীর ঝোল খাও, কভু গয়ায় পিণ্ড দাও,
বিদেশে পরম ব্রাহ্ম, হিন্দু গেলে বাড়ী।
নানাস্থানে ভাব নানা, কিছু যে বোঝা যায় না,
অন্ত নাহি পেলাম তোমার, সদা ভেবে মরি;
সত্য ভিন্ন মুক্তি নাই, খাঁটি হয়ে রওরে ভাই,
বহুরূপী হইও নারে, কপট আচারী।

নাহিরে তোর ধর্ম্মাধর্ম্ম, কর পশুর মত কর্ম্ম,
যদি দেখ শ্বেতচর্ম্ম অমনি গোলাম তারি,
সদা করযোড়ে রও, মস্তকে পাদুকা বও,
বাড়ী এসে গোঁফে তাও, বাবুগিরি ভারি।
দিনে একশ' আটবার কর ভারত উদ্ধার,
ভারতের তরে তোমার কত জাঁক জারি,
মুখেতে মালসাট মার, এয়সা কর তেয়সা কর,
কাজের বেলা ল্যাজ গুটিয়ে মার টেনে পাড়ি।

কৌতুকী অশ্বিনীকুমারের কৌতুকের অন্ত ছিল না। একবার তাঁহার গায়ে কতগুলি চুল্‌কানি হইয়াছিল, নিজে চুল্‌কাইতেন, ভৃত্যেরা চুল্‌কাইত তবু চুল্‌কানির নিবৃত্তি হইত না। তিনি এই সময়ে কৌতুক করিয়া গাহিতেন—

চুল্‌কানির জ্বালায় মইলাম সজনি
চাকর চুল্‌কায় বাকর চুল্‌কায় চুল্‌কায় রাজার রাজরাণী।

অশ্বিনীকুমার বলিতেন, স্বয়ং ভগবান্ কৌতুকী, সেই জন্যই তিনি নানা রূপে, রসে, গন্ধে তাঁহার সৃষ্টি এমন মধুর, এমন বিচিত্র করিয়াছেন। মানুষ মুখভার করিয়া বসিয়া থাকিবে, ইহা অশ্বিনীকুমারের পক্ষে অসহ্য ছিল। তিনি গাহিয়াছেন—

"যারা মুখ ফুলিয়ে থাকে ভবে, তাদের বহুত দেরী হবে;
সবার সঙ্গে নাচা গাওয়া ভিন্ন পন্থা নাই।"

মানুষ হাসিয়া গাহিয়া নাচিয়া বিশুদ্ধ আনন্দের প্রাচুর্য্যে তাহার

জীবনটা সর্ব্বপ্রকারে সম্ভোগ করিবে ইহাই অশ্বিনীকুমারের উপদেশ। তিনি ছিলেন চিরব্রহ্মচারী, আনন্দরসের প্রাচুর্য্যে তিনি যেন অহর্নিশ মাতোয়ারা হইয়া থাকিতেন। তাঁহার জীবন প্রদীপ যখন ধীরে ধীরে নিবিয়া আসিতেছিল তখনও তাহার আনন্দের অবধি ছিল না। ব্যাধির খরশরে তাহার দেহের বল, কর্ম্মের শক্তি যখন নিঃশেষপ্রায় হইয়াছিল তখনও তাঁহার সদাপ্রসন্ন মুখের হাসি, চিত্তের স্ফূর্ত্তি ও বাক্যের সরসতা নষ্ট হইতে পারে নাই। মৃত্যুকালেও যেন তিনি অফুরন্ত হাসির মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন।

এইরূপ অসুস্থতার মধ্যে তিনি একখানি আশীর্ব্বাদ পত্রে আমাকে লিখিয়াছিলেন—

স্নেহাস্পদেষু

শরৎ, তোমার বিজয়াসম্ভাষণ অনেক দিন হইল পাইয়াছি। কিন্তু প্রাপ্তি স্বীকার করিতে যে টুকু পরিশ্রমের প্রয়োজন তাহা করে কে? এখন বড়ই দুর্ব্বল। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী * যথাসময়ে পাইয়াছিলাম কিন্তু এখনও পড়ি নাই। আজ কাল 'আছি' এই মাত্র। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভাষায় দেহ "অস্তীতি বস্"। আশীর্ব্বাদ করি সর্ব্বদা মনে রাখিও—

তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং
তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবং।

* গ্রন্থকার প্রণীত 'বঙ্গগৌরব স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়'।

তদেব শোকার্ণব-শোষণং নৃণাং
যদুত্তমশ্লোকযশোঽনুগীয়তে ॥

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীঅঃ

অশ্বিনীকুমারের আনন্দ, হাস্যকৌতুক ও বালসুলভ চটুলতা মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমভাবেই বিদ্যমান ছিল। বাহিরে তিনি পলিতকেশ বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু অন্তরে ছিলেন চির-নবীন। তাঁহার এই চির-বালকত্ব, চির-সরসতা তদীয় জীবনব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন ও ধর্ম্মসাধনারই ফল। অশ্বিনীকুমার তাঁহার প্রাণের ঠাকুরকে লক্ষ্য করিয়া যাহা গাহিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধেও উহা সত্য বলা যাইতে পারে। তিনি স্বরচিত সঙ্গীতে গাহিয়াছেন—

কোন দিন কি ফুরাবে না পনর বছর তোর ?
কখন না বুড়ো হ'বি, রহিবি কিশোর ?
তোর ঐ রূপরাশি,
ললিত মোহন মধুর হাসি,
কেমন প্রাণ করে উদাসী,
জানিস্ মনচোর ?
থাক্ থাক্ এমনি থাক্
চিরদিন মজিয়ে রাখ
প্রাণ থাক্ হয়ে অবাক্
ঐ রূপেতে ভোর !

সুরসিক অশ্বিনীকুমারের রসের উৎস ছিল কোথায় এই সঙ্গীতে তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার অফুরন্ত হাসি, সরস বাক্য ও রঙ্গপরিহাস সকলের মন হরণ করিত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি সরস বাক্যালাপে মানুষকে মাতাইয়া রাখিতে পারিতেন। এমন সুরসিক আসর-জমানো মজার মানুষ আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

অষ্টম অধ্যায়

ব্রাহ্মসমাজ ও অশ্বিনীকুমার

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতে ভক্তির এক উদার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মহাপ্রভু চৈতন্য দেব, ভক্ত তুকারাম, ভক্ত তুলসীদাস, রামানুজ, রামানন্দ, কবীর, নানক প্রভৃতি ভারতীয় সাধকগণের জীবনে ভক্তির অপূর্ব্ব লীলা প্রকটিত হইয়াছে। উক্ত মহাসাধকগণের সাধনা ভারতবর্ষকে ভক্তির বিচিত্র রসে অভিষিক্ত করিয়াছে। ভক্তের হৃদয়বিহারী ভগবান্ রস-স্বরূপ। তিনি পরমরসিক। তাঁহার সৃষ্টি যেমন নানা ছন্দে, নানা গন্ধে, নানা বর্ণে, নানা রসে বিচিত্র তাঁহার ভক্তি লীলাও তেমনি শান্ত-দাস্য-বাৎসল্য-সখ্য-মধুর প্রভৃতি নানা রসে বিচিত্র। রস-স্বরূপের যে রাগিণী এই নিখিল বিশ্বে ধ্বনিত হইতেছে তাহা একতারার একঘেয়ে সুর নহে, তাহা সহস্রতার বীণার ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী।

ভারতের এই চিরন্তন ভক্তি-ধর্ম্মই শাস্ত্রজ্ঞ, রসজ্ঞ অশ্বিনী-কুমারের ধর্ম্ম। 'ভক্তিযোগে' তিনি এই ধর্ম্মেরই ধারাবাহিক আলোচনা করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের ঘটনাবহুল জীবনের সকল অবস্থায় ভক্তের আরাধ্য রস-স্বরূপ দেবতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি ন্যস্ত ছিল। আমরা জানি, শৈশবে কাগজের ঢোলক



মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী

৩০২ পৃঃ

বাজাইয়া হরিতলায় তিনি কীর্ত্তন করিতেন। ভক্তির বীজ তখনই তাঁহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মভূমি ভারতে নানা যুগের সাধুভক্তদের সাধনার যে সঞ্চিত ভাণ্ডার রহিয়াছে আমরা প্রত্যেকেই সেই সম্পদের উত্তরাধিকারী ইহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু এই সম্পদ্ সম্ভোগের অধিকার অতি অল্প ব্যক্তির ভাগ্যেই ঘটে। সাধনার যে চাবি-কাটি দিয়া এই ভাণ্ডার-গৃহে প্রবেশ করিতে হয় উহা যাঁহার আছে তিনি এই চিরন্তন অধ্যাত্ম সম্পদ্ ভোগ করিতে পারেন। ভাগ্যবান্ অশ্বিনীকুমারের এই সাধনা ছিল। ধর্ম্মানুরাগ, শাস্ত্রানুরাগ তাঁহার চরিত্রের স্বাভাবিক অলঙ্কার বলিয়া উক্ত হইতে পারে। সুপণ্ডিত পিতা ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়ের সহিত বাল্যকালেই তিনি শাস্ত্রালোচনা করিতেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের সকল ভক্তের বাণী তিনি আগ্রহসহকারে অধ্যয়ন ও মনন করিতেন। তাঁহার এই সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মানুরক্তি 'ভক্তিযোগে' সুস্পষ্ট-রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

অশ্বিনীকুমার যখন বিদ্যার্থী যুবক তখন বঙ্গদেশ নানা আন্দোলনের প্লাবনে প্লাবিত হইতেছিল। কি ধর্ম্ম, কি রাজনীতি, কি শিক্ষা, কি সমাজ-সংস্কার, সকল দিকেই তখন যেন নবজীবনের নব বসন্তের সঞ্চার হইয়াছিল। তখন মহাপুরুষ রাজা রামমোহন রায়ের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধর্ম্মান্দোলনের বহ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। তখন কলিকাতার উপকণ্ঠে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সর্ব্বধর্ম্মের

সমন্বয়ের ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায় উক্ত আন্দোলনে মাতিয়া উঠিয়া দেশকে জ্ঞানে, ধর্ম্মে উন্নত করিবার জন্য উদ্যোগী হইতেছিলেন। বিদ্যাসাগর, সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন কালীচরণ বন্দোপাধ্যায়, শিবনাথ, বিজয়কৃষ্ণ, প্রতাপচন্দ্র, অঘোরনাথ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মহাত্মাদের হৃদয় উক্ত আন্দোলন-বহ্নিতে প্রজ্বলিত হইয়াছিল। ইঁহারা দেশের পরাধীনতার গ্লানি, অজ্ঞানতার অন্ধকার, কুসংস্কারের মোহ, ধর্ম্মহীনতার কলঙ্ক দূর করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। তখন দেশ যেন সহসা মোহ-নিদ্রা হইতে জাগরিত হইয়া নবজীবনের অরুণোদয় দর্শনে চমকিত হইয়াছিল।

এই আন্দোলনের আব্‌হাওয়ার মধ্যে অশ্বিনীকুমার মানুষ হইয়া উঠিতেছিলেন। তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র ও রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গ, সদুপদেশ ও স্নেহ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহার স্বভাবসুলভ আস্তিক্যবুদ্ধি ও শ্রদ্ধাবনত চিত্ত লইয়া এই সকল সাধুমহাত্মাদের সঙ্গ করিতেন। যে চিত্ত সংসারের তাবৎ শ্রেয়কে বরণ করিবার জন্য উৎসুক অশ্বিনীকুমারের সদাচেতন চিত্ত ছিল তেমনি। তিনি যাহা কিছু দেখিতেন, যাহা কিছু শুনিতেন, সেই সকলের কিছুই তাঁহার পক্ষে ব্যর্থ হইত না। তাঁহার হৃদয়ফলকে সেই সকলের ছবি যেন চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইত। তিনি বহুকাল পূর্ব্বের ঘটনার এমন জ্বলন্ত বর্ণনা প্রদান করিতেন যে, তাহা শুনিয়া

মনে হইত যেন এখনও তাঁহার মন সেই স্থানকালঘটনার মধ্যে বিহার করিতেছে।

এমনই মন লইয়া তিনি বঙ্গের নব অভ্যুদয়ের স্বর্ণযুগে সোণার মানুষ রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি মহাত্মাদের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে মিশিবার এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, কেশবচন্দ্র সেন, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সাধু-ভক্ত ও মনীষীগণের জীবনপ্রদ সদুপদেশ শুনিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। নবযুগের নবীন ভাবরাজি তাঁহার চিত্ত মাতাইয়া দিল। তিনি নূতনকে সমগ্র হৃদয় দিয়া বরণ করিলেন। ব্রাহ্ম-সমাজ তাঁহাকে মনের অধ্যাত্ম ক্ষুধা মিটাইবার অন্ন দিয়া নব-জীবন প্রদান করিল। ব্রাহ্মসমাজের সার্ব্বভৌম উদার শিক্ষা তাঁহার জীবনের উপর অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিল। জাতিকুলের অভিমান তিনি ভুলিয়া গেলেন। ধর্ম্মক্ষেত্রে বিশ্বমানবের সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। আমরা জানি, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'যশোহর সাধারণ ধর্ম্মসভায়' তিনি হিন্দুমুসলমানখৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মযাজকদিগকে বক্তৃতা করিতে আহ্বান করিতেন। বরিশালে তাঁহার গৃহে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন ও কর্ম্মচ্যুত অসহায় হাওয়ার্ড্ সাহেবের দীর্ঘকাল আতিথ্যগ্রহণে কোন অসুবিধা হয় নাই। তিনি আমরণ আজীজ্ পাগ্‌লার দোস্ত ও নমঃশূদ্র ভেগাই হালদারের "চেগাই" ছিলেন।

কলিকাতা ও কৃষ্ণনগরে অতি উদার সুশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া,

নব্যবঙ্গের ব্রাহ্মধর্ম্ম আন্দোলনের মহাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি যখন তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র বরিশালে আইসেন তখন ঋষিকল্প গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য। ব্রাহ্মসমাজের বাহিরে অতি অল্পলোকেই এই নীরব সাধক, নীরব কর্ম্মী, মহানুভব, আদর্শ পুরুষের খোঁজ রাখেন। ইঁহার সঙ্গ, সদুপদেশ ও মহৎ জীবন অশ্বিনীকুমারের ভাবগ্রাহী তরুণ চিত্ত অভিভূত করিত। তাঁহার পরলোকগমনের পরে এক পত্রে অশ্বিনীকুমার লিখিয়াছিলেন—"পূজ্যপাদ গিরিশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের পরলোক-প্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া মনে হইল, বঙ্গদেশ একটি রত্ন হারাইল। এরূপ ঋষিকল্প লোক আর তো বড় দেখিতে পাই না। তাঁহার চরণপ্রান্তে দুই মিনিটের তরে বসিলেও যে শান্তি পাইতাম তাহা আর কোথায় পাইব ? এই অষ্টমী, কি নবমীপূজার দিন তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীর চরণধূলি লইতে গিয়াছিলাম, কত স্নেহে কত কথা বলিলেন। তখন স্বপ্নেও ভাবি নাই, তিনি এত শীঘ্র চলিয়া যাইবেন। তাঁহার স্মৃতি চিত্তকে উন্নত করে। আর যে ইহলোকে তাঁহার চরণতলে বসিতে পারিব না, ইহা মনে হইলে কষ্ট হয়। বরিশাল তো তাঁহার স্মৃতি-জড়িত। তিনি, স্বর্গীয় সর্ব্বানন্দ দাস মহাশয় ও শ্রীযুক্ত কালীমোহন দাস বরিশালে যে কি অমৃত ঢালিয়াছেন তাহা বরিশাল ভুলিতে পারিবে না। আমি ও আমার ন্যায় অনেকে তাঁহার ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী দেবীর নিকট যে কত ঋণী তাহা বাক্যে প্রকাশ করিতে পারি না। সেই দীনরঞ্জনের মৃত্যুদিনে যে তাঁহার বাড়ীতে কি অপূর্ব্ব



স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র মজুমদার

১৬ পৃঃ

দিব্য ব্যাপার দেখিয়াছিলাম তাহা জন্মান্তরেও ভুলিব না। তাঁহার দেবপ্রতিম মূর্ত্তি দর্শনমাত্রেই প্রাণে যে কি আরাম পাইয়াছি তাহা প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই। তাঁহার নিকট বসিলে স্বর্গ নিকটতর বোধ হইত। প্রাণে সত্যই সুধা সিঞ্চিত হইত। সেই যে রবিবাবুর কবিতা—

"এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এস কেহ,
পরিপূর্ণ একটি জীবন,
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ
থেমে যাবে সহস্র বচন।"

তাঁহার জীবনে এই কবিতাটির সার্থকতা উপলব্ধি করিয়াছি। সত্যই তাঁহাকে দেখিলে তাঁহার সম্প্রদায়দ্বেষিগণের সহস্র বচন থামিয়া যাইত। এমন লোকের স্মরণেও আমরা ধন্য হইতেছি।"

১৮৮২ অব্দে অশ্বিনীকুমার যখন বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের সভ্য নিযুক্ত হন তখন বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের গৌরবময় যুগ। পূর্ব্ব হইতেই তথাকার ব্রাহ্মগণের কর্ম্মোদ্যম, উৎসাহ, সত্যনিষ্ঠা, ধর্ম্মভাব সমগ্র বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। ১৮৮৩অব্দের মাঘোৎসবে আচার্য্য গিরিশচন্দ্রের পত্নী শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী বরিশাল ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে আসন গ্রহণ করিয়া লোকসাধারণের সমক্ষে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। কেবল বঙ্গদেশে নহে, তখন নিখিল ভারতে ইহা অভিনব ব্যাপার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। ইতঃপূর্ব্বে

সুপ্রসিদ্ধ দুর্গামোহন দাস মহাশয় অকুতোভয়ে তাঁহার বিধবা বিমাতার বিবাহ দিয়া দেশবাসীর মনে বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছিলেন। তখন কি সমাজসংস্কার, কি ধর্ম্মসাধনা সকল দিকেই বরিশালের ব্রাহ্মগণ অগ্রণী বলিয়া বিবেচিত হইতেন।

পিতা ও আত্মীয় স্বজনের বিরাগভাজন হইয়াও অশ্বিনী-কুমার বরিশালের ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মগণের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্মা-লোচনা করিতেন। তাঁহার বাগ্মিতা, তাঁহার পাণ্ডিত্য, তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ সমস্ত নিয়োগ করিয়া, তিনি ব্রাহ্মসমাজের সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার বক্তৃতা ও শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণের জন্য সমাজগৃহ লোকে লোকারণ্য হইত। অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্মসমাজের সহিত আপনাকে এমনভাবে সংযুক্ত করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার পরলোকগত পিতা ও স্বজনবর্গের উৎকণ্ঠার বিষয় হইয়াছিলেন। এমন কি ব্রজমোহন দত্ত মহাশয়, কখন কখন অশ্বিনীকুমারকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন,—"তোকে আমি ত্যজ্যপুত্র করিব।" পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন—"অশ্বিনী-কুমার তখন ষোলআনা ব্রাহ্মসমাজের ভাবে ও আদর্শে অনু-প্রাণিত। তিনি তখন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যের কার্য্য ব্যতীত অপর সকল কার্য্যের অন্যতম নেতা। অশ্বিনীকুমার তখন জ্ঞান, ভক্তি ও নৈতিক আদর্শে সকলের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও মধ্যবিন্দু।" মাঘোৎসব আসিলেই তাঁহার আত্মীয়স্বজনগণ শঙ্কিত মনে ভাবিতেন—"এবারই হয়তো অশ্বিনীকুমার দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইবেন।" বস্তুতঃ অশ্বিনীকুমার তখন

ব্রাহ্মধর্ম্মে যেমন অনুরাগী ছিলেন তাহাতে আত্মীয়দের উক্তরূপ আশঙ্কা অমূলক ছিল ইহা বলা যায় না। একাদিক্রমে কয়েক বৎসর তিনি মাঘোৎসব উপলক্ষে ইংরাজী ভাষায় এক একটি বক্তৃতা করিতেন। "Rejoicings in the Brahmo Samaj" এই প্রসিদ্ধ বক্তৃতাটি দ্বারা তিনি বঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচত হইয়াছিলেন। এই সময়ে অশ্বিনীকুমার ধর্ম্ম ও সুনীতির পবিত্র বহ্নি জ্বালাইয়া শত শত লোককে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিতেছিলেন। তিনি ছিলেন বরিশালের কেশবচন্দ্র সেন। পরলোকগত মনীষী মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক সভায় বলিয়াছিলেন—"What Keshab Ch, Sen was in Calcutta Asvini Kumar Datta is at Barisal." অর্থাৎ "কলিকাতায় ব্রহ্মানন্দ কেশব যাহা ছিলেন বরিশালে অশ্বিনীকুমার দত্ত তাহাই।"

অশ্বিনীকুমার পিতার রোষ বা আত্মীয়স্বজনদের বিরাগে ভীত হইবার পাত্র ছিলেন না। যাহা শ্রেয়ঃ তাহা তিনি অকুতোভয়ে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আপনার আত্মার তাগিদেই তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিযুক্ত হইতে হইল। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহার বুদ্ধির খোরাক জোটাইতে পারিত, কিন্তু হৃদয়ের দাবী মিটাইতে পারিত না।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন—"অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্ম ভাবাপন্ন হইলেও বহু বিষয়ে রক্ষণশীল ও প্রাচীন রীতিনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন হিন্দু

সমাজে থাকিয়া ব্রাহ্মভাবে সমাজ সংস্কার করিতে হইবে।” এইজন্য তিনি স্বয়ং দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিরাট্ হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার প্রয়োজনীয়তা তিনি স্বীকার করিতেন না। কোন কোন দীক্ষার্থী যুবকের নিকট তিনি তাঁহার এই মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আচরণে কতিপয় ব্রাহ্ম রুষ্ট হইয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন—“তখন বাবু মনোরঞ্জন গুহ, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, রাজকুমার ঘোষ, চণ্ডীচরণ গুহ প্রভৃতি একদল ব্রাহ্মযুবক ইহার প্রতিবাদ করিলে অশ্বিনীকুমারের ব্রাহ্মমন্দিরে বক্তৃতা প্রদান বন্ধ হয়।” যাহা হউক ব্রাহ্মসমাজের পুণ্যপ্রভায় মণ্ডিত হইয়া, ব্রাহ্মসমাজের সার্ব্বভৌম নীতি বরণ করিয়া ধীরে ধীরে অশ্বিনীকুমার একদিন উক্ত সমাজের বাহিরে বৃহত্তর সমাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রিয়দর্শন বাগ্মী অশ্বিনীকুমারের বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিবার জন্য বরিশাল সহরের বালবৃদ্ধ নরনারী, বিশেষতঃ বিদ্যার্থী যুবকগণ, দলে দলে ব্রাহ্মসমাজে গমন করিতেন। এমন সুপণ্ডিত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে হারাইয়া ব্রাহ্মসমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হইল। শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মবন্ধুগণের সহিত অশ্বিনীকুমারের বন্ধুত্ব পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ রহিল, কিন্তু সমাজের সহিত তাঁহার যোগ ছিন্ন হইল। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে হারাইয়া যতখানি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, বরিশালের ‘ধর্ম্মরক্ষিণী সভা’ ততখানি সবল হইল। অশ্বিনী-

কুমারের সুমধুর ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য এতদিন যাহারা ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন এখন তাহাদের অনেকেই 'ধর্ম্মরক্ষিণী সভায়' আসিতেন।

অশ্বিনীকুমারের সহিত যাহাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়াছে তাহারা তাঁহার ধর্ম্মমতের মধ্যে কোন বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পারিবেন ইহা আমরা মনে করি না। ভারতের চিরন্তন ভক্তিধর্ম্মের যে বীজ শৈশবাবধি তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিত নানা পরিবেষ্টনের মধ্যে উহারই ক্রমবিকাশ ঘটিয়াছে। যিনি রস-স্বরূপ, যিনি আনন্দ-স্বরূপ শৈশব হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত জীবনের সকল অবস্থায় তিনি সেই দেবতারই পূজা করিয়াছেন।

অশ্বিনীকুমার মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহা অনেকের নিকট বিস্ময়কর বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ভক্তির সাধনায় বিজয়কৃষ্ণ অশ্বিনীকুমারের অগ্রজ ছিলেন। ভক্তের সহিত ভক্তের মিলন একান্ত স্বাভাবিক। ভক্তির যে রসধারা সম্ভোগের জন্য অশ্বিনীকুমারের চিত্ত ব্যাকুল ছিল, মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণের হৃদয় ছিল সেই ভক্তিরসের প্রস্রবণ। বাঙ্গলা ১২৯৩ সালের বৈশাখ মাসে অশ্বিনীকুমার এই মহাত্মার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অশ্বিনীকুমার ঐ মন্ত্র শ্রদ্ধাপূর্ব্বক জপ করিয়াছেন।

মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তিনি তাঁহার হৃদয়ের প্রত্যেক বিন্দু শোণিত ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের

জন্য পাত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তাঁহার আন্তরিকতা-পূর্ণ কার্য্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বারংবার বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছিলেন। একবার বিজয়কৃষ্ণ যখন তাঁহার হৃদয়োন্মাদিনী বক্তৃতায় পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে মাতাইতেছিলেন তখন কলিকাতা হইতে কেশবচন্দ্র এক পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—

"জয় জয় বিজয়ের জয়। তুমি যে জয়পতাকা ধারণ করিয়া রহিয়াছ তাহা এখান হইতেই দেখিতেছি। তোমার হৃদয়ে ঈশ্বর যে জ্বলন্ত অগ্নি রাখিয়াছেন তদ্দ্বারা তুমি যে ভ্রম ও কুসংস্কার একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আবার বলি জয় জয়। ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা এতদিন সত্যপরায়ণ প্রচারকের অভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল। এখন সেই মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে।" যাহা হউক ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতে করিতে এই মহাত্মাও একদিন সমাজ-প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

ভক্তির সাধক বিজয়কৃষ্ণ শান্তিপুরের গোস্বামী বংশোদ্ভূত অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশধর। তাঁহার তুল্য তেজস্বী ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি দুর্ল্লভ। তিনি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন প্রাণপাত করিয়াও তাহা পালন করিতেন। তিনি যেমন সরল ও ব্যাকুল অন্তরে ধর্ম্ম সাধনা করিতেন এমন ধর্ম্মানুরাগীর সংখ্যা সকল সমাজেই অতি অল্প। একদা প্রতাপচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বলিয়াছিলেন—"আমার মনে হয় ধর্ম্মের জন্য একেবারে ক্ষ্যাপা হইয়াছে ব্রাহ্মসমাজে এরূপ লোকের অভাব হইয়াছে। এরূপ

একটি লোকও দেখি না। একটি লোক দেখিয়াছিলাম, তিনি সাধু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। আমি তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মের জন্য ব্যাকুলাত্মা আর দেখি নাই।" অশ্বিনীকুমার এই ব্যাকুলাত্মা ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির শিষ্য হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মরাজ্যের রহস্য যাঁহার কাছে উদ্ঘাটিত হয় তিনিই অন্যকে সেই রাজ্যের পথ দেখাইয়া দিতে পারেন। অশ্বিনী-কুমারের গুরু বিজয়কৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ঈশ্বর কৃপায় গয়া তীর্থে আকাশগঙ্গা নামক পর্ব্বতে এক নানকপন্থী মহাত্মা কৃপা করিয়া আমাকে যোগধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সেই অবধি আমার জীবনের এক অপূর্ব্ব অবস্থা খুলিয়া গিয়াছে। অবশ্য আমি দেবতা হইয়া গিয়াছি বলিতে পারিনা, কিন্তু এটুকু না বলিলে মিথ্যা বলা হয় ও অকৃতজ্ঞতা হয় যে, আমার অভাব মোচন হইয়াছে এবং আমি এক অনন্ত রাজ্যের দ্বারে আসি-য়াছি। কি যে সম্মুখে দেখিতেছি ভাষায় তাহা প্রকাশ করিতে পারি না।"

ধর্ম্মজীবনে যিনি এমন কথা বলিতে পারেন যে, "আমার অভাব মোচন হইয়াছে" তিনিই যথার্থ গুরুস্থানীয়, এমন লোকেরই কাছে আশা ও আনন্দের কথা শুনিবার জন্য নরনারী আগ্রহান্বিত হইয়া থাকে। অশ্বিনীকুমার এমন এক মহাত্মার কাছে ধর্ম্মজীবনের রহস্য জানিবার জন্য শিষ্যরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভক্তির যে বিচিত্র রস আস্বাদনের জন্য তিনি ব্যাকুল ছিলেন ভক্তপ্রবর বিজয়কৃষ্ণ সেই ভক্তিধর্ম্মের

আশ্চর্য্য বক্তা ছিলেন। ভক্ত বিজয়কৃষ্ণ এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন—

"ভক্তি ধর্ম্মের প্রাণ, ভক্তি ধর্ম্মের জীবন, জীবের শান্তি, ভক্তি পাপীর গতি, ভক্তিশূন্য ধর্ম্ম জীবনে স্থান পায় না। সাধনা ভিন্ন মুখের কথায় ভক্তি লাভ হয় না। * *

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং সখ্যং দাস্যমাত্মনিবেদনং॥

এই নবাঙ্গ সাধন ভক্তিলাভের উপায়।"

ভক্ত অশ্বিনীকুমারের প্রণীত "ভক্তিযোগ" গ্রন্থে এই ভক্তির ধারাবাহিক সাধনপ্রণালী অতি বিচক্ষণতার সহিত আলোচিত হইয়াছে। সাধু বিজয়কৃষ্ণের মন্ত্র-শিষ্যগণ খাদ্য ও উচ্ছিষ্ট সম্বন্ধে যেমন আচারনিষ্ঠ, অশ্বিনীকুমার তেমন ছিলেন না। তাঁহার মুখে ভাস্করানন্দ, পরমহংসদেব, কেশবচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ মহাত্মাদের সম্বন্ধে বহু সময়ে বহু কথা শুনিয়াছি। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে কেবল একটি উল্লেখযোগ্য আখ্যান শুনিয়াছি।

সাধু বিজয়কৃষ্ণ যখন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ লাহোরে গিয়াছিলেন তখন একদা ব্রাহ্মসমাজে "পবিত্রতা" সম্বন্ধে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের পরে রজনীকালে মানসিক বিকার উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার মনে ভয়ঙ্কর অনুতাপ জন্মে। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন—"আমি প্রচারক,

ধর্ম্মোপদেষ্টা আমার মন এমন পাপ চিন্তার অধীন, হায়, আমার জীবনে আর কিছুই হইল না।”

তাঁহার অশান্ত মন কিছুতেই শান্ত হইল না। তীব্র যাতনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া তিনি পরিধেয় বস্ত্রদ্বারা গলদেশে প্রস্তর বাঁধিয়া রাবি নদীতে প্রাণত্যাগ করিবার জন্য গমন করেন। এমন সময়ে নিকটবর্ত্তী বনভূমি হইতে সহসা এক সাধু আসিয়া তাঁহাকে এই দুষ্কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিলেন। সাধুজীর উপদেশে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। সাধুজী বিজয়কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—“বৎস, পরমেশ্বরের নাম কর, তাহাতেই পবিত্র হইতে পারিবে। তুমি কত সুন্দর তাহা এখন দেখিতে পাইতেছ না। সাধনার দর্পণদ্বারা যখন তুমি নিজেকে দেখিতে পাইবে, তখন তোমার নিজের সৌন্দর্য্যে নিজে মোহিত হইবে।”

এই সময়ে মনের আবেগে তিনি তাঁহার প্রসিদ্ধ সঙ্গীত—

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায় ?
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায় ?
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম—
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায় ?

রচনা করিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার এই সাধু মহাত্মার ধর্ম্মজীবনের প্রভাব স্বীয় জীবনে কতখানি অনুভব করিয়াছিলেন আমরা তাহা জানি না। হয়তো যাঁহার কথা তিনি লোকের কাছে তেমন করিয়া বলেন নাই

তাঁহার ধর্ম্মজীবনের পবিত্র বহ্নিই অশ্বিনীকুমার অন্তরে ধর্ম্মের অনির্ব্বাণ অগ্নি জ্বালাইয়া দিয়াছিল। পতিপ্রাণা সতী যেমন তাঁহার আরাধ্যতম স্বামীর কথা লোকের কাছে বলেন না, অশ্বিনীকুমার হয়তো সেইরূপ তাঁহার গুরুর কথা ইচ্ছা করিয়াই আলোচনা করিতেন না। যিনি অন্তরতম অন্তরঙ্গ তাঁহার সম্বন্ধে অনেকেই লোকের সহিত বাক্যালাপে কুণ্ঠা বোধ করিয়া থাকেন।

অশ্বিনীকুমারের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ও শিষ্যদের কেহ কেহ মনে করেন যে, গোস্বামী মহাশয়ের ধর্ম্মজীবন তাঁহার চরিত্রের উপর তেমন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। আমরা ইহা যুক্তি-পূর্ব্বক স্বীকার করিতে পারি না। অশ্বিনীকুমারের সহধর্ম্মিণীর মুখে শুনিয়াছি, মৃত্যুর প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমারের যখন মাঝে মাঝে স্মৃতিভ্রম হইত ঐসময়ে একদিন গুরুমন্ত্র বিস্মৃত হইয়া তিনি পত্নীকে উহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পত্নী উক্ত মন্ত্র বলিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন দেখিয়া অশ্বিনী-কুমার নিজের বুকের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন —"আসল যাহা সেই নামরূপের অতীত বস্তু এই বুকের ভিতরই আছে, এখন মন্ত্র জপ করি বা না করি উহাতে আমার কিছু আসে যায় না।" গুরুদত্ত মন্ত্রের অর্থ ও শক্তি সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন বলিয়াই উহা জপ করিতে করিতে ভক্ত অশ্বিনীকুমারের চিত্তে ভগবৎ স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল তদ্‌বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।



তমাল তরু তলে ভক্ত অশ্বিনীকুমার

৩১৭ পৃঃ

নবম অধ্যায়

ভক্ত অশ্বিনীকুমার

ভক্তির কথা শুনিলে অশ্বিনীকুমারের হৃদয় নাচিয়া উঠিত। ভক্তচরিতকথা কীর্ত্তনে তিনি যেন সহস্রজিহ্ব হইতেন। তিনি যখন ভক্তিতত্ত্ব আলোচনা করিতেন তখন ভাবের প্রাবল্যে তাঁহার মুখের শুচিশোভা শতগুণ বর্দ্ধিত হইত এবং নয়নদ্বয় জ্বল্ জ্বল্ করিত। সভাস্থলে অশ্বিনীকুমার যখন ভাবাবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন তখন বিস্মিত শ্রোতৃমণ্ডলী অনন্যমনা হইয়া তাঁহার বচনসুধা পান করিত। তাঁহার প্রাণস্পর্শী বাক্যে শত শত বালবৃদ্ধ-যুবকের হৃদয়ে যথার্থ ধর্ম্মভাব জাগরিত হইত। অনেকের জীবনগতি পুণ্যলোকের অভিমুখে প্রধাবিত হইত।

ভক্তির সুবিমল আলোকে বাল্যাবধি অশ্বিনীকুমারের হৃদয় আলোকিত ছিল, তাঁহার হৃদয়ে স্বভাবতঃই অহৈতুকী ভক্তির * অঙ্কুর ছিল। এই হিসাবে তাঁহাকে পরমেশ্বরের অনুগৃহীত কিংবা পরম ভাগ্যবান্ বলা যায়। পঠদ্দশায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সংশ্রবে তাঁহার স্বাভাবিক ধর্ম্মানুরক্তি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

পৃথিবীতে অধিকাংশ ব্যক্তির জীবনে ধর্ম্মজিজ্ঞাসা দেখা যায় না। ভগবত্তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত আন্তরিক ব্যাকুলতা

হাজার হাজার লোকের মধ্যে একজনেরও আছে কি না সন্দেহ। এই আশ্চর্য্যসুন্দর জগৎ কে সৃষ্টি করিয়াছেন? তাঁহার স্বরূপ কি? তাঁহার সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? তাঁহাকে লাভ করিবার উপায় কি? এইরূপ প্রশ্ন আমরা পরস্পরকে কদাচিৎ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা হইলে আমরা সাধারণতঃ জিজ্ঞাসা করি—"আপনি কেমন আছেন? আপনার পরিবার কেমন আছেন? কাজকর্ম্ম, ব্যবসায়বাণিজ্য কেমন চলিতেছে?" ইত্যাদি। বস্তুতঃ একটু চিন্তা করিলেই আমরা ইহা দেখিতে পাই যে, আমাদের মন আহারবিহার, আলুপটল, টাকাকড়ি এই সমস্ত ছোট ছোট সাংসারিকতার মধ্যে জড়িত হইয়াই প্রায় সর্ব্বদা থাকে। মন অতি অল্প সময়েই এই সকলের উপর উঠিয়া থাকে।

অশ্বিনীকুমার সংসারী ছিলেন। জমাজমি, টাকাকড়ি, দেনাপাওনা, খাওয়াপরা এই সকল কথা তাঁহাকে ভাবিতে হইত। ব্যক্তিগত জীবনে ক্ষুদ্র বিষয়েও তিনি উদাসীন ছিলেন না। তাঁহার পোষাক সাধারণ ও সরল ছিল, কিন্তু তাহা চিরদিন পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটী ছিল। পরিধেয় বস্ত্র সম্বন্ধে তিনি কখনও অসাবধান ছিলেন না। তিনি পাহাড়ে পাহাড়ে,বনে জঙ্গলে দ্রুত পদব্রজে যাতায়াত করিয়াছেন, কিন্তু হাঁটিবার সময়ে কদাচ তাঁহার পদস্খলন হইত না। তিনি কত লিখিতেন, কিন্তু সমস্ত জীবনে একটিবারও তাঁহার কলমের কালি ঘরের মেজেতে,

দেওয়ালে,বিছানায় বা কাপড়ে ফেলেন নাই। তাঁহার সহধর্ম্মিণী একদা অসতর্কভাবে তাঁহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন—স্নানের পরে গামছা ছড়াইয়া না রাখিলে নূতন গামছায় "তিল" পড়ে। অতঃপর আর কোনদিন গামছা ছড়াইয়া রাখিতে অশ্বিনীকুমারের ভুল হয় নাই। সংসারের ছোট ছোট বহু বিষয়েই তাঁহার মন এমনই সদা সতর্ক ছিল। কিন্তু তিনি এমন বড় মন লইয়া এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন যে, এই সকল বিষয় তাঁহার মনকে একেবারে গিলিয়া ফেলিতে পারিত না। তিনি বৈষয়িক মামলা মোকদ্দমার নথিপত্র দেখিতেন বলিয়া তাঁহার কোন দিন ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে ও ধর্ম্মালোচনায় অবসরের অভাব হইত না। তাঁহার ধর্ম্মপিপাসু মন প্রত্যহই সাংসারিকতার উর্দ্ধে উঠিয়া সত্যস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের অমৃতরস পান করিত। যিনি রসস্বরূপ তাঁহার সহিত অশ্বিনীকুমারের নিত্যবিহার হইত বলিয়া তিনি আমরণ সদাপ্রসন্ন, সুরসিক ও শিশুস্বভাব ছিলেন।

অশ্বিনীকুমার সংসারী ছিলেন। সংসার ও ধর্ম্মের সমন্বয় তাঁহার জীবনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। তিনি বলিয়াছেন—"সংসারী কেন ভক্ত হইতে পারিবে না, এ সংসার কি ভগবানের সৃষ্ট নয়? ইহা কি সয়তানের রাজ্য? ভগবান্ যখন মাতাপিতা দিয়াছেন, গৃহপরিবার দিয়াছেন, তখন তাঁহার চরণে প্রাণ অর্পণ করিয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। সংসারের সমস্ত কার্য্য তাঁহার কার্য্য করিতেছি বলিয়া করিলে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে

না। প্রাণও সর্ব্বদা অমৃতপূর্ণ থাকিবে। যতই কেন সংসারের কার্য্য না করি, প্রাণের টান সর্ব্বদা তাঁহার দিকে থাকা চাই। যেমন নটী সঙ্গীত, বাদ্য ও কত প্রকার তানলয়ের বশবর্ত্তী হইয়া কত ভাবভঙ্গীতে নৃত্য করিবার সময়েও মস্তকস্থিত কুম্ভকে স্থিরভাবে রক্ষা ক'রে, তেমনি যে ব্যক্তি ধীর, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিষয় উপভোগ করিলেও মুকুন্দ-পদারবিন্দ ত্যাগ করিবেন না, সর্ব্বদা সেই চরণে তাঁহার মতি স্থির থাকে।

পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয়ানুপসেবমানো
ধীরোন মুঞ্চতি মুকুন্দপদারবিন্দম্।
সঙ্গীতবাদ্যকতিতানবংশগতাপি
মৌলিস্থকুম্ভ পরিরক্ষণধীর্নটীব॥

অশ্বিনীকুমার সংসারী হইয়াও ভক্তের মত শ্রীভগবানে মতি স্থির রাখিয়াছিলেন, তিনি সংসারের সমস্ত কার্য্য পরমেশ্বরকে লইয়া করিতেন। এইজন্য তিনি জীবনে কদাচ "হা হতোঽস্মি" করেন নাই। তিনি রসস্বরূপ দেবতার ভক্ত ছিলেন বলিয়া বহুবৎসরব্যাপী রোগ ভোগ করিয়াও আমরণ চিত্তের প্রসন্নতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। আনন্দময় মধুর হাস্য তাঁহার স্বভাবসুন্দর মুখের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিত। তাঁহার সেই হাসিমাখা মুখ মনে পড়িলে কবির কণ্ঠে বলিতে ইচ্ছা হয়—

"অমনি সোণার মুখ আমি বড় ভালবাসি।
মলিনতা লেশ নাই কথায় কথায় হাসি ॥"

ঈশ্বরপ্রেমিক অশ্বিনীকুমার পরম কৌতুকী ছিলেন। বন্ধুবান্ধববেষ্টিত হইয়া অশ্বিনীকুমার যে স্থানে বিরাজ করিতেন,ঠাট্টাতামাসা ও হাসির লহরে সেই স্থান মুখরিত হইয়া উঠিত। তাঁহার চরিত্র ছিল সমুদ্রের মত গম্ভীর, তাঁহার বক্ষে নিরন্তর আনন্দের ঢেউ খেলিত। তিনি বলিয়াছেন—"ভগবান্ বড় কৌতুকী, তাহা না হইলে বনে এত ফুল ফোটে, সাঁঝের বেলা আকাশে এত রং ফলে, এমন মধুর দক্ষিণে হাওয়া বয় ?" যথার্থ প্রেমের প্রকৃতি বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন— "প্রেমের ভিতরে হাসি আছে, আমোদ আছে, ঠাট্টা আছে, কিন্তু তরলতা নাই। ফুলের বাহিরে পাপ্‌ড়িগুলি কেমন ঢুলিয়া ঢুলিয়া হাসে কিন্তু ভিতরে অন্তঃস্থলে একটি সুন্দর কালো দাগ। তেমনি প্রেমিকের বাহিরে কৌতুক খেলা, কিন্তু সেই কৌতুকের কেন্দ্রভূমি গাম্ভীর্য্য।" প্রেমিক অশ্বিনীকুমার এই প্রেমগিরিকন্দরে যোগী হইয়া নিরন্তর আনন্দনির্ঝরধারা পান করিতেন। তিনি গাহিয়াছেন—

প্রেমগিরিকন্দরে যোগী হয়ে রহিব।
আনন্দনির্ঝরপাশে যোগধ্যানে বসিব।
সে আনন্দপ্রস্রবণে, পুণ্যচন্দ্রমাকিরণে,
মোহন মাধুরী খেলা প্রাণভরে হেরিব।

মিটাতে বিরহ-তৃষা, কূপজলে আর যাব না,
হৃদয়করঙ্গ পূরি, শান্তিবারি তুলিব।
তত্ত্বফল আহরিয়ে, জ্ঞানক্ষুধা নিবারিয়ে,
বৈরাগ্য বনকুসুমে শ্রীপাদপদ্ম পূজিব।
(কভু) বসি ভাবশৃঙ্গ'পরে পদামৃত পান ক'রে,
হাসিব কাঁদিব আবার নাচিব আর গাইব।

প্রেমযোগী অশ্বিনীকুমার তাঁহার উপলব্ধ এই আনন্দানুভূতি নিম্নলিখিতরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—"যিনি নির্জ্জনে একটু স্থির হইতে শিখিয়াছেন, তিনিই জানেন, সে সময়ে আমরা আমাদিগের স্বীয় শরীর ও চতুষ্পার্শস্থ জগৎ একেবারে ভুলিয়া যাইতে পারি। কিঞ্চিৎ কাল স্থির হইয়া বসিলে প্রথমে বাহ্য জগৎ, পরে আপনার হস্ত, পদ, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ দূর হইতে থাকে, তৎপরে ধীরে ধীরে চিন্তাপ্রবাহ পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ হয়, দ্বৈত চলিয়া যায়, আত্মপর থাকে না। সমস্ত ভুলিয়া গেলে একটি অনির্ব্বচনীয় ভাবের আগমন হয়। যিনি এইরূপ ভাবে আবিষ্ট হইয়াছেন তিনি যদি তখন বিদেহ না হইয়া আপনার ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন তাহা হইলে আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বলিতেন—এ জগৎ কোথায় গেল, কে সরাইয়া নিল, কোথায় লয়প্রাপ্ত হইল? আমি ত এইমাত্র দেখিতেছিলাম। এখন ত আর নাই। কি মহাশ্চর্য্য ব্যাপার।"

অশ্বিনীকুমার তাঁহার এই অত্যাশ্চর্য্য আনন্দানুভূতির কথা

অন্যত্র এইরূপ বলিয়াছেন—“আনন্দে সব একাকার হইয়াছে। বাস্তবিকই এইরূপ ভাবাবেশের সময়ে আনন্দপ্লাবনে শরীর, মন, বুদ্ধি, চরাচর বিশ্ব সমস্ত ডুবিয়া যায়, তাহার তুলনা এ জগতে কোথায়? আবার যখন শরীরের, মনের অস্তিত্ব জ্ঞান হইতে থাকে তখন কষ্ট হয়, হাতখানি, পা'খানি নাড়িতে ইচ্ছা হয় না। পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গ মুক্তাকাশে বিচরণ করিয়া যেমন পুনরায় পিঞ্জরে প্রবেশ করিতে কষ্ট বোধ করে তেমনি কষ্ট বোধ হয়।”

যিনি ‘রসোবৈ সঃ’ তিনি আনন্দরূপে, অমৃতরূপে এই বিশ্বভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। এই কথা হাজার হাজার লোক শুনিয়াছেন, শত শত লোক ধর্ম্মগ্রন্থে ইহা পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু হাজারের মধ্যে এক ব্যক্তিরও এই তত্ত্ব জীবনে আয়ত্ত হয় কি না সন্দেহ। যাঁহারা ঋষি, যাঁহারা ভক্ত তাঁহারাই বিশ্বের সকল পাত্র হইতে আনন্দমদিরাধারা পান করিতে পারেন। এই বিশ্বসংসারের আনন্দযজ্ঞে যোগদান্ করিবার নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছেন কেবল ভক্ত ও ঋষিগণ। ভক্ত অশ্বিনীকুমার আনন্দময় পরমদেবতার ‘সনদ’ লইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন বলিয়া, হাসিয়া খেলিয়া বিশ্বের আনন্দধারা পান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছেন—

আমি তোর মুখফুলানো ভগবানের ধার ধারি না ভাই,
আমার ঠাকুর হাসিখুসি, খেলাধূলোয় পাগল দেখ্‌তে পাই।

যেমন হাসি উঠ্‌ল ফুটে,
চৌদ্দ ভুবন এল ছুটে,
সৃষ্টি হ'ল, সারা প'ল, সবাই ধর্‌লে তাই।
তাই তাই তাই চল্‌ল ভেসে,
ঠাকুর খুন হেসে হেসে,
হাসির তরঙ্গ কত বলিহারি যাই।
প্রেমে সৃষ্টি গরগর,
কাঁপে ভাবে থরথর,
তান ধর্‌লো ঠাকুর আমার, নাচিল সবাই।
(আবার) যাই ফুরালো বাইরের খেলা,
ভেঙ্গে গেল মহামেলা,
ঐ হাসিতে ডুবে গেল সারাশব্দ নাই।
এই মজা ভাই দেখে দেখে,
আমিও ভাই থেকে থেকে,
সবার সঙ্গে মিলে মিশে, হাসি নাচি গাই।
(যখন) আস্‌বে সময় যাবে বেলা,
ফুরাবে এই ভবের খেলা,
ডুবে যাব হাসির মাঝে ধিন্ ধিন্ ধিন্ তাই তাই।
(যারা) মুখ ফুলিয়ে থাকে ভবে,
তাদের বহুৎ দেরী হবে,
সবার সঙ্গে নাচা গাওয়া ভিন্ন পন্থা নাই।

আনন্দের উপাসক অশ্বিনীকুমার তাঁহার ধর্ম্মজীবনের অতি

মনোহর ছবি উক্ত সরল সঙ্গীতে ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি তাঁহার অন্যতম প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস মহাশয়কে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"বইএর কথা না লিখিয়া আমার অনুভূতির কথা লিখিতে অনুরোধ করিয়াছ। আমার কি তেমন কপাল যে তাহা লিখিতে পারি, তবে কখনও কদাচিৎ যে কিছু অনুভব না করিয়াছি, তাহাই বা বলি কি প্রকারে? একদিন জেলে যখন ছিলাম আনন্দ পাইয়া পাগলের মত যাহা লিখিয়াছিলাম তাহা তোমাকে পাঠাইতে আমার সঙ্কোচ নাই। উহাতে রস, মাধুর্য্য, লালিত্য কিছুই নাই; তবে মোদ্দা কথাটা আছে, সভ্যসমাজে উহা উপস্থিত করিও না, তুমি দেখিও। আমাকে ভালবাস বলিয়া তোমার কাছে মন্দ লাগিবে না। একটি গান লিখিয়াছিলাম, সে গানটি এই—

পিলু—যৎ

ইনি যখন দয়া করেন, কি যে তখন হয়ে যাই।
কারে কব সে সব কথা, শুন্‌লে পাগল বল্‌বে ভাই॥
• চাঁদ এসে কোলে পড়ে,
প্রাণে মধুনিঝর ঝরে,
হীরামাণিক থরে থরে,
হৃদয়মাঝে দেখ্‌তে পাই।
যারে দেখি সেই মিষ্টি,
সবাই করে সুধাবৃষ্টি,

ঘুচে যায় সব ইষ্টিরিষ্টি,
শত্তুর মিত্তির ভেদ নাই।
কি যেন পিয়ে পিয়ে
ভাবে হয় বিভোল হিয়ে,
ধূলো মুঠা হাতে নিয়ে
শত শত চুমো খাই।

বাস্তবিকই বড় সুখ হয়, বড় সুখ হয়। খুব স্ফূর্ত্তিতে থাক্‌বে, আছই তো। আবার আমি তা তোমাকে বলে দেব ?

আশীর্ব্বাদ করি দেবভোগ্য আয়ু লাভ করিয়া আয়ুষ্মান হও ও চিরদিন মধুমাসরসাক্রান্ত বৃক্ষবন্মুদিতো ভব। আশীর্ব্বাদ করি—

জপোজল্পঃ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনম্
গতি প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনছ্যাহুতিবিধিঃ।
প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মর্পণদশা
সপর্য্যায়স্তস্যভবতু যজ্ঞো বিলসিতম্॥

তোমার সমস্ত জল্পনা তাঁহার জপ হউক, যত গঠনাদি ক্রিয়া পূজার সময়ের মুদ্রাবিরচনরূপে প্রতিভাত হউক, তোমার গমনভ্রমণ মাত্রেই তাঁহার প্রদক্ষিণরূপে পরিণত হউক, আহারাদি তাঁহাকে আহুতি দেওয়া হইতেছে এই জ্ঞান হউক, শয়ন যেন তাঁহার চরণে প্রণাম বলিয়া গণ্য হয়, তাঁহাতে আত্মনিবেদন যেন তোমার সকল সুখ এবং তোমার

যাহা কিছু ক্রীড়া, চেষ্টা সকলই যেন তাঁহার পূজার ক্রম বলিয়া গৃহীত হয়।”

ভক্ত অশ্বিনীকুমার কি প্রকারে তাঁহার প্রিয়তম দেবতাকে অহর্নিশ সকল কার্য্যের মধ্যে অনুভব করিতেন উক্ত পত্রে তাঁহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। অশ্বিনীকুমার লক্ষ্ণৌ সেণ্ট্রাল জেল হইতে ইংরাজি ভাষায় আর একখানি পত্রে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস মহাশয়কে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই—গতকল্য আমি তোমার পত্রে মাঘোৎসবের শ্রদ্ধাপূর্ণ সাদর অভিবাদন পাইয়াছি। তুমি আমার আন্তরিক স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। এখানে আমি আমার স্নেহশীল বন্ধুদের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া আছি সত্য, কিন্তু যিনি মাঘোৎসবের রাজা তিনি এখানেও আছেন, আমি তাঁহার সঙ্গে আনন্দ সম্ভোগ করিতেছি।

তুমি জান শ্রীমদ্ভাগবত আমার পরম আনন্দের সামগ্রী। ঐ পুস্তক আমার অছে। তদ্‌ভিন্ন তুলসীদাসের রামায়ণ এবং কোরাণের অনুবাদ পুস্তকও পাইয়াছি। তুলসীদাসের রামায়ণ হইতে একটি উত্তম শ্লোক তোমাকে উপহার দিতেছি:—

কাঁমিহিঁ নারী পিয়ারি জিমি
লোভিহিঁ প্রিয় জিমি দাম
তিনি রঘুনাথ নিরন্তর
প্রিয় লাগহু মোহিঁ রাম।

যেমন কামীর (প্রেমিকের) নিকট (প্রেমাস্পদ) নারী প্রিয়, লোভীর নিকট যেমন টাকা পয়সা, তেমনি রাম রঘুনাথ নিরন্তর আমার নিকট প্রিয় হন।

ভক্ত অশ্বিনীকুমার উক্ত পত্রে লিখিয়াছেন—কারাগারে আনন্দময় দেবতার সঙ্গসুখ হইতে তিনি বঞ্চিত নহেন, যে শ্রীমদ্ভাগবত তাঁহার প্রাণপ্রিয় গ্রন্থ কারাগারে উক্ত গ্রন্থ তাঁহাকে আনন্দ দান করিত, ভক্ত তুলসীদাসের রামায়ণ তাঁহার নিকট আনন্দের প্রস্রবণ ছিল। বস্তুতঃ 'ভক্তিযোগ' বক্তা অশ্বিনীকুমারের জীবন আলোচনা করিলে ইহাই দেখা যাইতে পারে যে, তাঁহার জীবন জীবন্ত ভক্তিগ্রন্থ ছিল। প্রকৃত ভক্তের যাহা লক্ষণ সমস্তই তাঁহার জীবনে প্রকটিত হইয়াছিল।

যাহারা ভগবচ্চিন্তাবিমুখ সাধুরা কখনও এমন ব্যক্তিদের সঙ্গ করিতে ভালবাসেন না। ভক্ত অশ্বিনীকুমার কাহাদের সঙ্গ করিতে ভালবাসিতেন ? যাহারা অশ্বিনীকুমারের বরিশাল নগরস্থ বাসভবন দেখিয়াছেন তাহারা জানেন যে, তাঁহার বাসগৃহ সাধুসজ্জনের মিলনভূমি ছিল। সে গৃহ দিবারাত্রির অধিকাংশ সময় পুণ্যপ্রসঙ্গে ও নামগানে মুখরিত থাকিত। নানা দিগ্দেশ হইতে যত সাধু বরিশাল নগরে আগমন করিতেন তাহাদের আশ্রয় ছিল অশ্বিনীকুমারের গৃহ। ভক্ত অশ্বিনীকুমারকে দর্শন করিয়া তাঁহারা কৃতার্থ হইতেন। অশ্বিনীকুমারও তাঁহাদের সহিত ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন।

সূর্য্যরশ্মির মত সৎসঙ্গ মানুষের হৃদয়ের তাবৎ অন্ধকার দূর করিয়া থাকে। এইজন্য যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা প্রকৃত ভক্ত ও সাধু সজ্জনের সঙ্গ করিবার জন্য আন্তরিক ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া থাকেন।

অশ্বিনীকুমার তাঁহার জীবদ্দশায় কত সাধুমহাজনের সঙ্গ করিয়াছেন তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। তিনি ভারতবর্ষের সকল অঞ্চল ভ্রমণ করিয়াছেন এবং যেখানে গিয়াছেন সেখানে বা তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যে-কোন সাধুসন্ন্যাসী থাকিতেন তাঁহাকে তিনি দর্শন না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। সাধুসন্ন্যাসীদর্শন ও তাঁহাদের সহিত আলাপ করা তাঁহার নেশার মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার বলিতেন—"যিনি প্রাণের সহিত ভগবৎকথা বলেন, আমাদিগের তাঁহারই চরণধূলি গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইলেই ফল পাইব। সঙ্গগুণে রং ধরিবে নিশ্চয়।"

ভক্ত অশ্বিনীকুমার কাশীর ত্রৈলঙ্গ স্বামী ও ভাস্করানন্দস্বামী, বৃন্দাবনের রামদাস কাঠিয়া বাবা, নবদ্বীপের চৈতন্যদাস বাবাজী, রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব, বিবেকানন্দ, প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, রামতনু লাহিড়ী প্রভৃতি সাধুমহাত্মাদের পুণ্যসঙ্গ লাভ করিয়াছেন। অশ্বিনীকুমারের মহত্ত্বব্যঞ্জক মূর্ত্তির শুচি শোভা-দর্শনে কাশীর ভাস্করানন্দস্বামী এমন মোহিত হইয়াছিলেন যে,

প্রথম সাক্ষাৎকারকালেই তিনি এই ভক্তকে অন্তরের স্নেহ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সাধুদর্শনলোভী অশ্বিনীকুমার এই স্বনামপ্রসিদ্ধ সাধুকে দেখিতে যাইয়া তাঁহার সম্মুখে কিয়দ্দূরে বসিয়াছিলেন। সাধুজী তাঁহাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। তিনি সঙ্কোচের সহিত একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। সাধুজী বারংবার বলিতে লাগিলেন—"আউর থোরা ইধার আও, আউর থোরা ইধার আও।" অবশেষে যখন সাধুজীর হাঁটুর সহিত অশ্বিনীকুমারের অঙ্গের স্পর্শ হইল তখন তিনি বলিলেন—"আভি তো প্রেমকা স্রুরু হুয়া, ইস্‌কো দৃঢ় করনে হোগা।" অশ্বিনীকুমার এই সকল সাধুমহাত্মাদের কাঁহারও কাঁহারও বিশেষ অনুগৃহীত ছিলেন। রূপকথার রাজপুত্রেরা যেমন সোণারূপার কাঠি ছোঁয়াইয়া মৃতা রাজকুমারীর দেহে জীবনসঞ্চার করেন, যথার্থ ভাগবত ব্যক্তিগণ সেইরূপ তাঁহাদের পুণ্যস্পর্শে জিজ্ঞাসু ধর্ম্মার্থীদের প্রাণে ধর্ম্মভাবের সঞ্চার করিতে পারেন। সাধুসজ্জনদের পবিত্র সংসর্গে অশ্বিনীকুমারের অন্তরস্থ স্বাভাবিক ধর্ম্মপিপাসা শতধা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। ভাগবত ভাবই তাঁহার জীবনকে মধুময় ও পরম আকর্ষণের সামগ্রী করিয়াছিল। ইহারই আকর্ষণে শত শত শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করিতেন। অশ্বিনীকুমার একবার দেওঘরে মহাত্মা রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে দেখিবার জন্য গিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারকে দেখিবামাত্র বসু মহাশয়

বলিয়া উঠিয়াছিলেন—'কে অশ্বিনী? উঃ কি আনন্দ!' এই বলিতে বলিতে তিনি ভক্তিমান্ অশ্বিনীকুমারকে জড়াইয়া ধরিলেন।

অশ্বিনীকুমারের পরম স্নেহাস্পদ সুযোগ্য ছাত্র শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন মহাশয় তাঁহার স্মৃতিসভায় বলিয়াছেন— "একদিন দেখিলাম নগ্নদেহ, নগ্নপদ, রুক্ষকেশ, মলিনবসন, জরাজীর্ণ এক বৃদ্ধ তাঁর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল। কোনরূপ অভিবাদনাদি না করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তোমার নাম অশ্বিনী দত্ত," তিনি বলিলেন, "হু"। বৃদ্ধ বলিল—'তুমি বসিয়া থাক আমি একটু দেখি,' বলিয়াই টস্ টস্ করিয়া চোখের জল ছাড়িয়া দিল, আমরা হাসিলাম। বৃদ্ধ অনেক দুঃখে বলিল— বাবুরা আমাকে 'ইতিহাস' (পরিহাস) করে। অশ্বিনীকুমার অমনি উঠিয়া সেই কৃষিজীবী নমঃশূদ্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাঁহার তক্তপোষের একপার্শ্বে বসাইলেন।" বরিশালের শত শত বালবৃদ্ধযুবক অশ্বিনীকুমারকে দেখিবার জন্য আন্তরিক আকর্ষণ অনুভব করিত। তাহারা তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজের মধ্যে অবসর করিয়া একটিবার এই সদাপ্রসন্ন ভক্তের হাস্যসুন্দর মুখখানি দেখিয়া যাইত। এমন কি তথাকার বৃদ্ধ ব্যবহারাজীব প্রভৃত বিষয়সম্পত্তির অধিকারী প্যারীলাল রায় ও দীনবন্ধু সেন মহাশয় তিন চারি দিন অশ্বিনীকুমারকে দেখিতে না পাইলে ছুটিয়া আসিতেন, আর কৈফিয়ত চাহিতেন—"কেন এতদিন দেখি নাই?"

কেহ কেহ মনে করেন—এই যুগে সাধুভক্তের একান্ত অভাব। এখন ঘোর কলি, লোকের মন হইতে ধর্ম্মভাব চলিয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ একথা শ্রদ্ধেয় নহে। অশ্বিনীকুমার বলিতেন—"আমার কিন্তু মনে হয় যে জীবনে উচ্চভাব দেখাইয়াছেন, এরূপ মহাত্মা একটু অন্বেষণ করিলেই এখনও পাওয়া যায়। সাধুর যে বিশেষ অভাব আছে আমি তাহা মনে করি না, তবে আমাদিগের তাঁহাদের চরণদর্শনের ইচ্ছার বিশেষ অভাব আছে, স্বীকার করি। সাধুগণ প্রায় সর্ব্বত্রই আগমন করিয়া থাকেন। যিনি তাঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা করেন তিনিই দেখিতে পান।"

সাধুদর্শনের আকাঙ্ক্ষা অশ্বিনীকুমারের অন্তরে কি প্রবল ছিল ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। যে সকল সুপ্রসিদ্ধ সাধুভক্তের সঙ্গ তিনি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের কয়েকজনের নাম আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অশ্বিনীকুমার প্রেমের অঞ্জন পরিয়া এই বিশ্বসংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন বলিয়া তাঁহার চক্ষে বহু অখ্যাত ব্যক্তির ভাগবত ভাব উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইত। তিনি তাঁহার এক প্রতিবেশীর ভাগবত ভাবের যে চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

"আমাদের গ্রামে রামকৃষ্ণ নামে এক রজকবিপ্র ছিলেন। তিনি তাঁহার বাড়ীতে স্থাপিত রাজরাজেশ্বর নামে এক কৃষ্ণমূর্ত্তির সেবা করিতেন। ইঁহারই সেবা করিতে করিতে ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। একদিন পূর্ব্বাহ্ণ দশ কি এগার

ঘটিকার সময়ে রামকৃষ্ণের বাড়ীতে বড়ই জঁাকাল সংকীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। মনে করিলাম, আজ রামকৃষ্ণের বাড়ী বিশেষ কোন উৎসব আছে। বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। সেখানে যাহা দেখিলাম তাহা কখনও ভুলিব না। গিয়া দেখি রামকৃষ্ণের অল্পবয়স্ক এক পৌত্রী রাজরাজেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখে মৃত্তিকায় শয়ান, তাহাকে ঘিরিয়া এবং রাজরাজেশ্বরের মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া কতগুলি লোক প্রাণ ঢালিয়া উচ্চরবে কীর্ত্তন করিতেছে। রামকৃষ্ণের দুই চক্ষে অবিরলধারে অশ্রু ঝরিতেছে, তিনি এক একবার কীর্ত্তন করিতেছেন, এক একবার মেয়েটিকে রাজরাজেশ্বরের প্রসাদ খাওয়াইতেছেন ও এক একবার অনিমেষ নয়নে রাজরাজেশ্বরের দিকে তাকাইয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিতেছেন, দোহাই রাজরাজেশ্বরের, নিতে হয় এখনই নেও, এখন এস্থল বৃন্দাবন, এখন তোমার নাম কীর্ত্তন হইতেছে, এখনত এস্থল বৃন্দাবন, নিতে হয় এই কীর্ত্তন থামিবার পূর্ব্বে নেও, আর না নিতে হয় রেখে যাও। তোমার যেমন ইচ্ছা, কিন্তু নিতে হইলে, দোহাই তোমার, এসময়ে নেও, বৃন্দাবন থাকিতে থাকিতে নেও।” মেয়েটি কলেরা রোগাক্রান্ত। তাহাকে রাজরাজেশ্বরের সম্মুখে শোয়াইয়া প্রসাদ খাওয়াই-তেছেন এবং রাজরাজেশ্বরের দোহাই দিতেছেন দেখিয়া আমি অবাক্ হইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ কীর্ত্তনের পরে কন্যাটিকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। অপরাহ্ণে রামকৃষ্ণ আমাদের

বাড়ী আসিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে শুনিলাম, মেয়েটি আরোগ্য লাভ করিয়াছে।”

আমরা অন্যের গুণ দেখিয়া আনন্দিত না হই এমন নহে, কিন্তু সাধারণতঃ অন্যের দোষগুলিই বেশী করিয়া আমাদের চক্ষে পড়ে। ভক্ত অশ্বিনীকুমার এমন প্রকৃতির ছিলেন যে, তাঁহার চক্ষে অন্যের দোষ অপেক্ষা গুণই বেশী করিয়া পড়িত। অশ্বিনীকুমারের এক ছাত্র ব্রজমোহন কলেজে অধ্যয়নকালে পরলোক গমন করেন। সেই ছাত্রটির নাম হেরম্বচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। ইহাঁর জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে ভাগবত ভাব প্রকটিত হইয়াছিল অশ্বিনীকুমারের মুখে তাহা শুনিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছিলাম। ধর্ম্মপ্রাণ হেরম্বচন্দ্রের জীবনীর ভূমিকায় অশ্বিনীকুমার লিখিয়াছেন—“হেরম্বের জীবন ও মৃত্যু আলোচনা করিলে মনে হয় তিনি যেন দিব্যধামের যাত্রীদিগকে কি কি সম্বল লইয়া চলিতে হইবে, বহুল পরিমাণে তাহাই দেখাইতে আসিয়াছিলেন। এই যুবকের জীবনে কোনও ক্ষুদ্র ত্রুটি ছিল না, বলিতেছি না। কিন্তু তাঁহার বিনয়মণ্ডিত নিঃসঙ্কোচ তেজ, সরলা সান্দ্রাভক্তি, প্রাণঢালা নরসেবা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আত্মপর্য্যবেক্ষণ সকলই আমাদের অনুকরণীয়।……এমন তেজ কোথায় পাই যে তেজ ভগবানকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারে—“আমি অপবিত্র, পাপ করিয়াছি, প্রায়শ্চিত্ত কি, জ্বলন্ত আগুন? আচ্ছা, তুমি আগুনের অপর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ডাক, আমি ঝাঁপ দিব। উত্তাল তরঙ্গায়িত সমুদ্র?

ডাক, ডুবিব!"······এমন ভক্তি কোথায় পাই যে ভক্তি শারদীয়া জ্যোৎস্নাসম্ভোগে উচ্ছ্বসিত হইয়া গাহিল—

হাসি হাসি কেবল হাসি,
যে মুখ থেকে আস্‌ছে ভাসি,
তারই তরে প্রাণ উদাসী,
বার হয়েছি দেখ্‌ব বলে।

যে ভক্তি ভগবান্‌কে প্রাণারাম নামে সম্বোধন করিয়া বলিল—"তুমি আমাকে এমন করিয়া ফেলিয়াছ যে তোমাকে ছাড়িয়া আর থাকিতে পারি না।' হেরম্ব তাঁহার মর্ত্ত্যলোকস্থ অল্পপরিসর জীবনের মধ্যেই "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্ নাল্পে সুখমস্তি" উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাদ্বারা তাঁহার এমন একটি আকর্ষণী শক্তি জন্মিয়াছিল যে, তাঁহার পরিচিত বালক, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধ সকলেই তাঁহার কথা, গান, আচার ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেন। অনেক বালক ও যুবকের চরিত্রে তাঁহার 'সঙ্গগুণে রং' ধরিয়াছিল! তিনি যে মণ্ডলীর মধ্যে বাস করিতেন তাহা যেন দিব্য সৌরভে পূর্ণ করিয়া লইতেন। তাঁহার জীবনে যেরূপ, মৃত্যুতেও তেমনি ভাগবত ভাব উদ্ভাসিত হইয়াছিল! যাহা জীবনে অভ্যস্থ হয় তাহাই মৃত্যুতে প্রকাশ পায়। জীবনব্যাপী ভক্তিচর্চ্চার ফলে মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যেও হেরম্বচন্দ্র হরিনাম-রসপূর্ণ সঙ্গীত রচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। মৃত্যুর অব্যবহিত পর্ব্বে তিনি আমাকে ভগবানের নাম শুনাইতে

অনুরোধ করিয়াছিলেন। পরে নিজেই বারংবার 'দুর্গানাম' এবং "ওঁ তৎসৎ" উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অন্তিমকালে তাঁহার প্রাণপক্ষী "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" গাহিতে গাহিতে ত্রিদিবাভিমুখে উড্ডীন্ হইল। এমন মৃত্যু কয়জনের ভাগ্যে ঘটে?" ভক্ত অশ্বিনীকুমার তাঁহার ভক্তিমান্ ছাত্রের এই যে ভাগবত ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন ইহা পাঠ করিলে হৃদয় পুলকিত হয় এবং ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে,—তিনি সেই অধ্যাত্ম-দৃষ্টি-সম্পন্ন ছিলেন যে-দৃষ্টি সর্ব্বদা এই বিশ্বভুবনে পরমেশ্বরের অনন্তলীলা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। এই দৃষ্টি যাঁহার থাকে তিনিই সীমার মধ্যে অসীমকে, ক্ষুদ্রের মধ্যে মহৎকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

ভক্তিযোগ-ব্যাখ্যাতা অশ্বিনীকুমার তাঁহার ব্রজমোহন বিদ্যালয়ের বালকদের নিকট ভক্তিতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে বাল্যেই ভগবত ভাব প্রকটিত হইয়াছিল। ভক্তি সাধনের পক্ষে বাল্যকালই তিনি উপযুক্ত সময় মনে করিতেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের উক্তি অনুসরণ করিয়া তিনি বলিতেন—"ভক্তির বীজ বপন করিবে ত হৃদয় কোমল থাকিতে থাকিতে কর। বাল্য বয়সে হৃদয় মাটীর মত কোমল থাকিতে থাকিতে ভক্তি বীজ বপন করা কর্ত্তব্য, পরে সংসারে পুড়িয়া সে মাটী ঝামা হইয়া গেলে ঝামায় কখন গাছ গজায় না।" অশ্বিনীকুমার বলিয়াছেন—"বিদ্যা

উপার্জ্জন, ধন উপার্জ্জন সমস্তই ভগবানকে লইয়া করিতে হইবে। ধর্ম্ম ভিন্ন বিদ্যা অকর্ম্মণ্য, ধর্ম্মে মতি না থাকিলে বিদ্যা ও ধন ধূর্ত্ততা ও শঠতার পরিপোষক হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহার এই উক্তি তিনি স্বীয় জীবনে কার্য্যের দ্বারা আচরণ করিয়া দেখাইয়াছেন। শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি যে-কোন ক্ষেত্রে তিনি কার্য্য করিয়াছেন তাঁহার সেই সমস্ত কার্য্যের মূলে ছিল ধর্ম্মবুদ্ধি। এক কথায় বলা যায়, ভগবানকে লইয়াই তিনি সমস্ত কার্য্য করিতেন।

অশ্বিনীকুমারের মুখে যাহারা শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা, উপনিষদ্ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থের ভাবরসাত্মক বাক্য ও শ্লোকের ব্যাখ্যান শুনিয়াছেন তাহারা জানেন যে, যথার্থ প্রেমিকের মুখে এই সকল বাণী কি মধুর ও অর্থযুক্ত হইয়া থাকে। তাঁহার উচ্চারণের বিশুদ্ধতা, কণ্ঠের লালিত্য, ভাবের প্রাচুর্য্য শাস্ত্র-বাণীর সরসতা শতগুণে বাড়াইয়া দিত। ভক্ত অশ্বিনীকুমার দেশী ও বিদেশী ধর্ম্মশাস্ত্র ও ভক্তরচিত গ্রন্থ পরম আগ্রহ-সহকারে চিরজীবন পাঠ করিতেন। ধর্ম্মগ্রন্থের যে অংশ বা যে শ্লোক তাঁহার নিকট সুমধুর বিবেচিত হইত তিনি সেই সকল অংশ ও শ্লোক তাঁহার ছাত্র ও বন্ধুদিগকে পড়িয়া শুনাইতেন। যাহাদের সহিত তাঁহার পত্রব্যবহার ছিল তাহারা প্রায় প্রত্যেক পত্রেই এইরূপ উৎকৃষ্ট বাণী বা শ্লোক উপহার পাইতেন। সাধুভক্তদের ভাবমূলক বাণীসমূহ তিনি পাঠ, আলোচনা ও মনন করিতেন। তাঁহার ভক্তি-পিপাসু

মন এইরূপে ভাবরাজ্যে বিহার করিয়া আনন্দ সম্ভোগ করিত।

অশ্বিনীকুমার কোন সুনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া আরাধনা করিয়াছেন কিনা এই প্রশ্নের উত্তর দিবার সাধ্য আমাদের নাই। এই মাত্র বলা যায়, ছোট শিশু যেমন মাকে 'মা' বলিবা ডাকে তিনি তেমনি করিয়া পরমেশ্বরের নাম করিতেন। মাতৃস্তন্যপানরত শিশুর মত তিনি যেন জগজ্জননীর বক্ষ জড়াইয়া নিরন্তর আনন্দমধু পান করিতেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি হরিনামে পাগল ছিলেন। তিনি নাম জপ করিয়া আনন্দলাভ করিতেন, ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে অসামান্য প্রেমের সঞ্চার হইত। তখন তাঁহার বুক কাঁপিত, পা টলিত, চক্ষে ধারা বহিত, তিনি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিতেন না। কীর্ত্তনসভায় তিনি কখন কখন সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া যাইতেন।

ভক্ত অশ্বিনীকুমার বলেন, "বন্ধুবান্ধবের সহিত একত্র হইয়া প্রতিদিন কোন সময়ে নাম সংকীর্ত্তন করার ন্যায় আনন্দের ব্যাপার আর নাই। সত্য সত্যই তখন আনন্দসাগর উথলিয়া উঠে, প্রাণে শান্তি পাওয়া যায়, বিষয়-বাসনা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য তিরোহিত হয়। ক্রমাগত নাম কীর্ত্তন করিলে অবশ্যই মানুষ পরমপদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।" নামমধুপানে যে সকল ভাগ্যবান্ সাধক মাতিয়া যান তাঁহারা নাম

গান করিতে করিতে কখন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করেন, কখন ব্যাকুল চিত্তে চীৎকার করেন, কখন বা উন্মাদের মত নৃত্য করেন।

ভাবমূলক গান শুনিয়া ভক্ত অশ্বিনীকুমার কি আনন্দ সম্ভোগ করিতেন তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। ভক্তসমাগমে তাঁহার গৃহ নামগুণগানে টল্‌মল্‌ করিত। তাঁহার গৃহে একবার রামনিধি নামক এক অখ্যাত যথার্থ ভক্ত বাউলের সমাগম হইয়াছিল। তখন রামনিধির বয়স সত্তর বৎসরের অধিক। কিন্তু তাঁহার দীপ্তিপূর্ণ বৃহৎ চক্ষু, লাবণ্যময় মুখমণ্ডল, বলিষ্ঠ, বিশাল বপু দেখিয়া যে কোন যুবককে লজ্জায় অধোবদন হইতে হইত। এই ভক্ত বাউল তাঁহার স্বরচিত ভাবসঙ্গীতে অশ্বিনীকুমারকে পাগল করিয়া দিয়াছিলেন। সেই নিরক্ষর নমঃশূদ্র বাউল গাহিয়াছিলেন---

প্রেমের গাছে রসের ঘটী পাতে যে জনা
(ও তা'য়) নিত্যনতুন বেরয় গো রস খাইলে পর আর ফুরায়না।

বাউলের রচিত ভাবসঙ্গীত শুনিয়া ভক্ত অশ্বিনীকুমার পূর্ণানন্দের আস্বাদন করিতে করিতে আনন্দসাগরে ডুবিয়া যাইতেন ; তাঁহার চারিদিকে যেন রসস্বরূপের প্রকাশ হইত।

যে সকল ভক্তসঙ্গে অশ্বিনীকুমার কীর্ত্তনানন্দে মাতিতেন তাঁহাদের মধ্যে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখ করা যায়। গোস্বামী মহাশয় মধ্যে মধ্যে বরিশাল সহরে যাইতেন। তখন তাঁহার সঙ্গলালসায় যথার্থ

ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিতেন। ঐ সময় লাখুটিয়ার জমিদার স্বর্গীয় রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী, পরলোকগত হরকান্ত সেন, উপাধ্যায় গিরিশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের ভবনে বরিশাল সহরের ভক্তমণ্ডলীর কীর্ত্তনানন্দ চলিত। রাখালবাবুর বাটীর যে গৃহে কীর্ত্তন হইত উহার নাম ছিল "মুক্তি-মণ্ডপ"। অশ্বিনীকুমার এইখানে ভক্তসঙ্গে মনের আনন্দে কত নৃত্য করিয়াছেন, ভাবাবেশে কত দশায় পড়িয়াছেন! বাবু গোরাচাঁদ দাস, দ্বারকানাথ গুপ্ত, গোবিন্দচন্দ্র সেন, কালীমোহন দাস, চন্দ্রনাথ দাস,কামিনীকান্ত গুপ্ত, খোসালচন্দ্র রায়, রাজকুমার ঘোষ, মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, বরদাপ্রসন্ন রায়, মনোরঞ্জন গুহ, জগদীশ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ সেন, রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী, হরকান্ত সেন, দীনবন্ধু সেন, প্রভৃতি ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিদের সহিত অশ্বিনীকুমার কীর্ত্তনানন্দ সম্ভোগ করিতেন। যাঁহারা অশ্বিনীকুমারকে ব্যঙ্গ করিয়া সুখানুভব করিতেন তাঁহাদের মধ্যে এই সময়ে এইরূপ একটি বাক্য প্রচলিত ছিল—

"খোসাল, ধর আমার চশ্‌মা জুড়ি,
আমি একবার দশায় পড়ি।"

অশ্বিনীকুমার স্বরচিত সঙ্গীতে গাহিয়াছেন—"লুকান মাণিক তুল্‌বি যদি ডুব্ দে প্রেমসাগরের জলে!" "প্রেমসিন্ধুনীরে আজ ডুবিব অতল সলিলে।" ভক্ত অশ্বিনীকুমারের জীবন ছিল ভগবচ্চরণে নিবেদিত। তিনি তাঁহার শরীর, বাক্য,

মন, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, চিত্তদ্বারা যাহা করিতেন সমস্তই প্রেমময় দেবতার চরণে নিবেদন করিতেন। প্রেমানন্দেই তিনি অহর্নিশ ডুবিয়া থাকিতেন। ভক্তিযোগে এই প্রেমের চরম পরিণতি বর্ণনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন—এই প্রেমময় দেবতা—

মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোঃ
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং।
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং॥

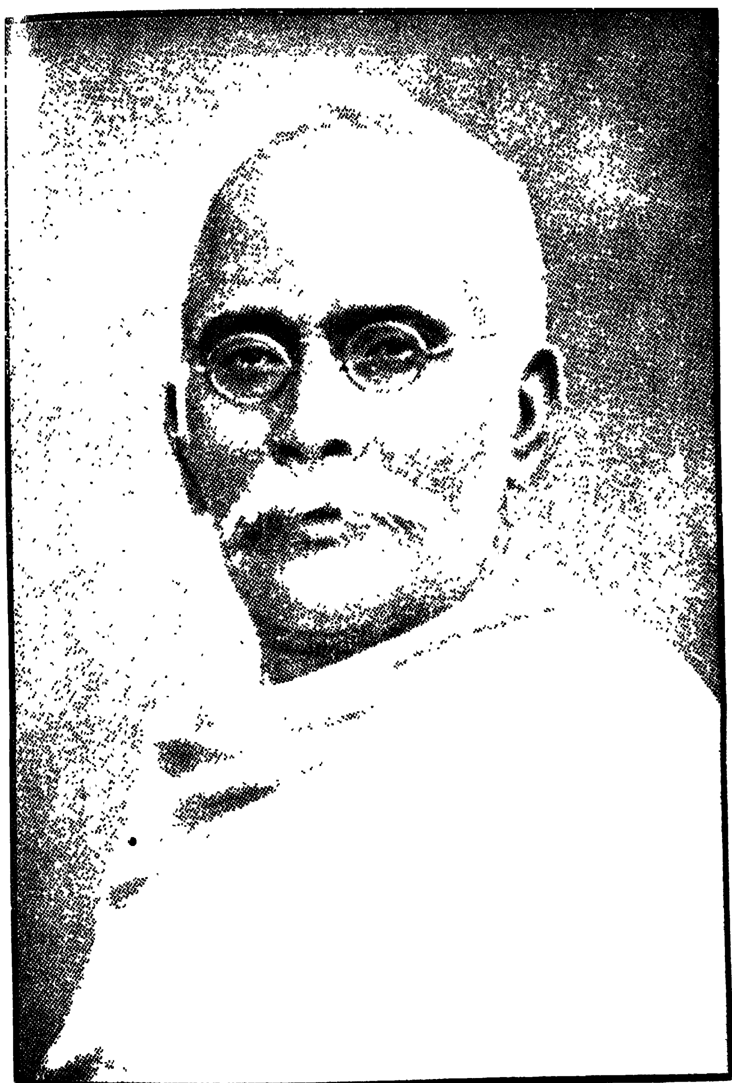
এই বিভুর শরীর মধুর, মুখখানি মধুর মধুর মধুর, অহো, ইঁহার মৃদু হাসিটি মধুগন্ধি, মধুর মধুর মধুর মধুর !

দশম অধ্যায়

অন্তিম জীবন

১৯১০ অব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারী অশ্বিনীকুমার নির্ব্বাসদণ্ড হইতে মুক্তিলাভ করেন, ১৯২৩ অব্দের ৭ই নবেম্বর তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে, তাঁহার জীবনের এই কিঞ্চিদধিক তের বৎসরকাল প্রধানতঃ ব্যাধির সহিত সংগ্রাম ও দেশপর্য্যটনে অতিবাহিত হইয়াছে।

স্বদেশীর সময়ে বঙ্গের যে সকল নেতা নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেরই স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হইয়াছিল। কিন্তু নির্ব্বাসন অশ্বিনীকুমারের শরীর ও মনের স্বাস্থ্য নষ্ট করিতে পারে নাই। যে 'প্রাণের ঠাকুর' তাঁহার মনের শান্তি ও আত্মার আনন্দ ছিলেন অশ্বিনীকুমার নির্জ্জন কারাকক্ষে সেই প্রেমময় 'ঠাকুরের' সঙ্গসুখ অনুভব করিতেন, এইজন্য নির্জ্জনতার দুঃখ এই ভক্তকে কোনদিন অভিভূত করিতে পারে নাই। ভক্তিগ্রন্থ অধ্যয়নে ও ভক্তসখা ভগবানের সঙ্গসুখে তাঁহার নির্ব্বাসন সময় আনন্দেই কাটিয়া গিয়াছিল। কারাগারে রচিত সঙ্গীতগুলিই উহার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রদান করে। নির্ব্বাসনান্তে তিনি এমন সুস্থবলিষ্ঠ দেহে বরিশালে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন যে, কেহ কেহ তাঁহাকে তামাসা করিয়া



বৃদ্ধ অশ্বিনীকুমার

বলিতেন—"একি, আপনার নবযৌবন যেন আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।"

ব্রজমোহন বিদ্যালয়

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নির্ব্বাসন হইতে ফিরিয়া আসিয়া অশ্বিনীকুমার অনন্যোপায় হইয়া অনিচ্ছায় তাঁহার প্রাণপ্রিয় কলেজটিকে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে পরিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সরকারের সহিত এই ব্যবস্থা করিবার সময়ে অশ্বিনীকুমারকে অতি ক্লেশের সহিত কলেজের অধ্যক্ষ রজনীকান্ত,অধ্যাপক সতীশচন্দ্র এবং স্কুলের তিনজন শিক্ষককে বিদায় দিতে হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন লিখিয়াছেন—"মাতার মৃত্যুতে অশ্বিনীকুমার অশ্রুমোচন করেন নাই, কিন্তু ইহাঁদিগকে বিদায় করিতে অশ্বিনীকুমার বালকের ন্যায় ক্রন্দন করিয়াছিলেন। তাঁহার Round Table এতদিনে সত্যসত্যই ভাঙ্গিয়া গেল।" যে বিদ্যালয়টিকে মনের মত গড়িবার জন্য অশ্বিনীকুমার তাঁহার যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের প্রচুর শক্তি ব্যয় করিয়াছিলেন, সেই বিদ্যালয়টি এই সময়ে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিল।

ভীষণ ব্যাধি

অতঃপর অশ্বিনীকুমার ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইলেন,তাঁহার উদরমধ্যে কিরূপ একটা উৎকট বেদনা হইয়াছিল। চিকিৎসকগণ কোনপ্রকারেই রোগ আরোগ্য করিতে না পারিয়া

একরূপ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে ছয়দিন ছয়রাত্রি অবস্থা এমন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল যে, যে-কোন সময়ে তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া যাইতে পারে বলিয়া চিকিৎসকেরা নিঃশব্দে পাহারা দিতেছিলেন। অতঃপর আস্তে আস্তে রোগের প্রকোপ প্রশমিত হইল।

আশ্বিনের মাঝামাঝি তিনি অসুস্থদেহে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য ধানবাদের নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুরে গমন করেন। আমরা স্থানান্তরে বলিয়াছি, এখানে তাঁহার অনুরাগী বন্ধু জগদীশ, গুণদাচরণ ও নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। অশ্বিনীকুমার এইখানে তাঁহার পত্নীকে গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক্ রোড্ দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"যখন রেল জাহাজ প্রভৃতি ছিল না, তখন এই পথ দিয়া কত সাধুমহাত্মা গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থে গমন করিতেন, তাঁহাদের কেহ কেহ বা দস্যুহস্তে পথিমধ্যে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, সেই সকল সাধুর দেহাবশেষ ও পদরেণু এই পথকে পুণ্যপবিত্রতায় মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে।" প্রত্যেক জিনিষের মধ্যে যে গৌরব নিহিত আছে সকলে উহা দেখিতে পায় না।

বন্ধুবৎসল অশ্বিনীকুমার এই সময়ে সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার প্রাণাধিক বন্ধু জগদীশের মাতা কাশীতে কঠিন রোগে শয্যাশায়িনী অছেন। সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য তিনি কাশীতে গমন করেন। সেখান হইতে বরিশালে প্রত্যাবৃত্ত হন। কিন্তু বরিশালে অশ্বিনীকুমারের স্বাস্থ্য আর কিছুতেই

ভাল থাকিত না। এতদিনে তাঁহার দেহ সত্যসত্যই ব্যাধির মন্দির হইল। স্বাস্থ্যোন্নতির মানসে এই সময়ে তিনি চিত্রকূট যাত্রা করেন। রামসীতার পদরেণুপূত এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়া ভক্ত অশ্বিনীকুমারের চিত্ত নন্দিত হইয়া উঠিল। চিত্রকূট পাহাড়ের উপর অনেক সাধু বাস করেন। সাধুরাই এই ভক্তকে তাঁহাদের আশ্রমের পার্শ্বে একটি কুঠরী বাসার্থ প্রদান করিয়াছিলেন। প্রায় দুইমাসকাল অশ্বিনীকুমার এই পুণ্যতীর্থে পরমানন্দে বাস করেন। তিনি জিজ্ঞাসু ভক্তের মত ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায় রামসীতা অবস্থান করিতেন, কোথায় ভ্রাতৃবৎসল ভরতের সহিত জটাচীরধারী রামের মিলন হইয়াছিল, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই সকল স্থান দর্শন করিতেন।

ধনী, বিলাসী, শিক্ষার্থী, ধর্ম্মার্থী নানাশ্রেণীর লোকই দেশ পর্য্যটন করিয়া থাকেন, কিন্তু কোথায় কি জানিবার, দেখিবার আছে অনেকেই সে খোঁজ রাখেন না। ভক্ত অশ্বিনীকুমার প্রেমের অঞ্জন পরিয়া দেশ ভ্রমণ করিতেন বলিয়া তাঁহার চক্ষে সকল স্থানের সকল তথ্য দিব্যমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইত। মনে পড়ে, আমরা যখন ছাত্র তখন তিনি আল্‌মোড়া বেড়াইয়া অনেকগুলি গান রচনা করিয়া বরিশালে ফিরিয়াছিলেন। পর্ব্বতে দেবদারুকুঞ্জের শোভা দেখিয়া অশ্বিনীকুমার লিখিয়াছিলেন—

"উঁকি মেরে দেখ্‌রে শোভা দারু কাননে
রূপের ডালি খুলে কে বসেছে আপন মনে।"

ভগবান্ এই সংসারে নানা রূপরসের সৃষ্টি করিয়া ভক্তের সঙ্গে উহা সম্ভোগ করেন, দেবদারুকুঞ্জের আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া অশ্বিনীকুমারের উহাই মনে পড়িয়াছিল। তিনি ঐ সঙ্গীতে গাহিয়াছিলেন—

"রূপের মালা গেঁথে ঠাকুর
খোঁজেন কোথায় আছেন রাই।"

এইরূপ প্রেমদৃষ্টিদ্বারা অশ্বিনীকুমার ভারতের প্রায় সকল প্রধান তীর্থ ও সকল নগর দর্শন করিয়াছিলেন।

দেশ ভ্রমণ করিয়া এই আশ্চর্য্য-সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার লীলা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অশ্বিনীকুমারের হৃদয়ে এক অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিরন্তর জাগরিত হইয়া থাকিত। বাহির হইতে কোন্ অজানার বীণা যেন সর্ব্বদা তাঁহাকে ডাকিত, তিনি বাহির হইবার জন্য নিরন্তর ব্যাকুলতা অনুভব করিতেন এবং যখনই সুযোগ পাইতেন, তখনই নদ, নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত ও তীর্থস্থান দর্শন করিবার জন্য ভ্রমণযাত্রায় বাহির হইতেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৮৮৫ ও ৮৬ অব্দে দুইবার অশ্বিনীকুমারের সহিত দেশভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তিনি বলেন—"এই দুইবারের দীর্ঘ ভ্রমণের ভিতরে সর্ব্বদাই লক্ষ্য করা যাইত, অশ্বিনীকুমারের ভ্রমণপিপাসা আর যেন ফুরাইত না।" ১৮৮৫ অব্দের মে মাসে অশ্বিনীকুমার বৈদ্যনাথ, কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর, গাজিপুর, সাহারণপুর, হরিদ্বার, আগ্রা, দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, অমৃতসর, লাহোর,

রাওলপিণ্ডি, মরীপর্ব্বত, কাঙ্গ্‌রা, নুরপার, আম্বালা, জ্বালামুখী এবং পর বৎসর মধ্যপ্রদেশের বহু স্থান, কাশী, এলাহাবাদ, পাঁচমরী, জব্বলপুর, ভেড়াঘাট প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। দ্বিতীয়বারে অশ্বিনীকুমারের সহধর্ম্মিণীও ভ্রমণযাত্রায় স্বামীর সঙ্গিনী ছিলেন।

ঢাকার বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতি

১৯১৩ অব্দে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সমিতির ঢাকা নগরীর অধিবেশনে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। চিত্রকূট হইতে তিনি ঢাকা নগরে গমন করিয়া সভায় যোগদান করেন। তাঁহার সারগর্ভ উপাদেয় বক্তৃতায় তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সালিসী ও স্বদেশী সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই বক্তৃতা "The Indian Nation Builder" গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। এই বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন—(১) লোকশিক্ষার দ্বারা আমাদিগকে এমনভাবে জনমতের সৃষ্টি করিতে হইবে যে, গভর্ণমেণ্ট যেন আমাদের কোন দাবীকে মুষ্টিমেয় শিক্ষিতদের দাবী বলিয়া উপেক্ষা করিতে না পারেন। (২) এই দেশের জনমণ্ডলীর সামাজিক ও নৈতিক আদর্শ এমনভাবে উন্নত করিতে হইবে যে, গভর্ণমেণ্ট যেন জনসাধারণের প্রার্থিত কোন শাসনসংস্কারের দাবী অগ্রাহ্য করিতে সাহসী না হন। সমগ্র পৃথিবী যেন এই কথাই বলিয়া উঠে, 'ইহারা যাহা দাবী করিতেছে, ইহারা সর্ব্বতোভাবে উহার যোগ্য।'

এযাবৎ বঙ্গব্যবচ্ছেদ আন্দোলন ব্যতীত অন্য কোন আন্দোলনই জনসাধারণের চিত্তস্পর্শ করিতে পারে নাই। কংগ্রেস্ ও কন্‌ফারেন্সে যে সকল প্রস্তাব আলোচিত হয়, জনসাধারণ ঐ সকলের কোন সংবাদই রাখেনা। ইহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু ইহার কোন প্রতিকারবিধানে আমরা এতদিন একান্ত উদাসীন হইয়া রহিয়াছি। উপযুক্ত ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে গ্রামে গ্রামে প্রচারক প্রেরিত হইতে পারে।

অশ্বিনীকুমার তখনকার অবিমৃষ্য খানাতল্লাসীর নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন—একটি মাত্র পুলিশের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া কোন ভদ্রলোকের বাড়ী খানাতল্লাস করা উচিত নয়। এইরূপ খানাতল্লাস করিবার পূর্ব্বে গভর্ণমেণ্ট যেন অগত্যা ঐ বিষয়ে একজন প্রবীণ ভারতীয় ডেপুটীম্যাজিষ্ট্রেটের অভিমত গ্রহণ করেন। কিন্তু যাহারা স্বদেশের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী তাহাদের প্রত্যেকেরই নরহন্তা দস্যুদিগকে দণ্ডদান করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টকে যথাসম্ভব সহায়তা করা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে লোকসাধারণের মনে বোধের সঞ্চার করা আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা সকলের স্মরণ রাখা উচিত।

ধর্ম্ম অধর্ম্মকর্ত্তৃক শেলবিদ্ধ হইয়া সমাজের সমীপে সুবিচার পাইবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। সমাজ যদি ইহার প্রতিকার না করেন, তাহা হইলে অর্দ্ধেক পাপের জন্য সমাজপতি দায়ী হইবেন; যাহারা নিন্দার্হ পাপকারীকে নিন্দা করেন না, চতুর্থাংশ

পাপ তাহাদের হইবে, পাপী কেবল অবশিষ্ট চারিভাগের এক ভাগের ফল ভোগ করিবে। কিন্তু বিচারে পাপী যদি দণ্ডিত ও নিন্দিত হয়, তবে সমস্ত পাপের জন্য সে-ই তখন দায়ী হইবে।

গ্রামের লোক চোর-ডাকাতের সন্ধান জানিলেও পুলিশের প্রতি তাহাদের বিশ্বাস নাই বলিয়া, উহাদের নামধাম তাহা-দিগকে জানায় না। ভয় এই যে, পাছে পুলিশ তাহাদিগকেও ঐ মামলায় জড়িত করে। দ্বিতীয়তঃ গ্রামবাসীরা নিরস্ত্র, তাহাদের আত্মরক্ষার কোন উপায় নাই, এইজন্য পুলিশের কাছে চোরডাকাতের নাম বলিতে তাহাদের সাহস হয় না, পাছে চোরডাকাতেরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদেরই সর্ব্বনাশ করে।

এই বক্তৃতামধ্যে অশ্বিনীকুমার বলিয়াছেন—মহারাষ্ট্র দেশের 'পয়সাভাণ্ডার' অতি চমৎকার কার্য্য সাধন করিয়াছে। বঙ্গদেশে কেন এইরূপ ভাণ্ডার স্থাপিত হইবে না তাহা আমি বুঝিতেছি না। এইরূপ ভাণ্ডারের সংশ্রবে প্রত্যেক জিলার সদরে একটি সমিতি স্থাপিত হউক। সমিতি রেজিষ্ট্রীকৃত হইবে। সমিতির একদল পরিচালক থাকিবেন। তাঁহাদের মতানুসারে এইরূপ ভাণ্ডারের অর্থ নানাপ্রকার লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইবে। সমস্ত জিলায় সমিতিগুলি ঠিক এক প্রকারের হইবে এমন বিধান না হওয়াই ভাল। প্রত্যেক জিলায় তথাকার প্রয়োজন অনুসারে সমিতি নূতন নূতন রকমের হইতে পারিবে। প্রত্যেক সমিতি গ্রামে গ্রামে শাখাসমিতি স্থাপন করিয়া কার্য্য করিবেন।

প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে প্রত্যেক জিলাসমিতির রিপোর্ট পঠিত হইবে।”

উক্তরূপে সমগ্র প্রদেশকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য অশ্বিনী-কুমার তাঁহার বক্তৃতায় বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

রোগ ও দেশভ্রমণ

ভগ্নদেহ অশ্বিনীকুমার প্রাদেশিক সমিতির কার্য্য সমাপ্ত করিয়া বরিশালে আগমন করেন। ইহার পরে আশ্বিন মাসে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য জববলপুরের নিকটবর্ত্তী সিওনিতে গমন করেন। পথিমধ্যে তিনি পত্নীর সহিত নর্ম্মদার জলপ্রপাত দর্শন ও তথায় স্নান করিয়া আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় পাঁচ মাসকাল তথায় বিশ্রাম সুখ সম্ভোগ করিয়া পত্নীর সহিত ভ্রমণযাত্রায় বাহির হইলেন। বৌদ্ধশিল্পের শ্রেষ্ঠ পীঠস্থান, প্রাচীনকালের বৌদ্ধ সাধুদের নির্ব্বাণসাধনার শোভন ক্ষেত্র অজন্তা দেখিবার নিমিত্ত অশ্বিনীকুমার জলগাঁও ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। এখান হইতে গো-যানে ত্রিশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া অজন্তায় আগমন করেন। অজন্তা গুহা হাইদরাবাদের নিজাম রাজ্যের অন্তর্গত। অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি পর্ব্বতে ঊনত্রিশটি গুহা খোদিত হইয়াছে। এই গুহাগুলিতে এমন আশ্চর্য্য কারুকার্য্যময় চিত্র রহিয়াছে যে, কোন ভাবরসজ্ঞ ব্যক্তি এখানে গমন করিলে তাঁহার মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, তিনি যেন এক স্বপ্নময় লোকে উপস্থিত হইয়াছেন। ভাবুক অশ্বিনীকুমার এখানে গুহায় গুহায় মনের আবেগে ভ্রমণ করিয়া অজন্তার অর্থপূর্ণ

আলঙ্কারিক চিত্র, গাছপালার নিখুঁত ছবি এবং ভগবান্ বুদ্ধের গৃহত্যাগ ও মারবিজয় প্রভৃতি চিত্র দর্শন করিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। অজন্তা ভ্রমণের পরে নাসিকে গমন করিয়া অশ্বিনীকুমার এক পত্রে এই গ্রন্থকারকে অজন্তা গুহার ভিখারী-বেশধারী ভগবান্ বুদ্ধের সম্মুখে সপুত্র জননীর খোদিত মূর্ত্তির কথা লিখিয়াছিলেন। জননীর বদনমণ্ডলে আত্মনিবেদন, পুত্রের মুখে অসামান্য সরলতা এবং ভগবান্ বুদ্ধের মুখে যে অনন্ত করুণা প্রকটিত হইয়াছে খোদিত মূর্ত্তির এই অপূর্ব্বভাবরাজি অশ্বিনীকুমারের ভাবপ্রবণ চিত্ত অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

অজন্তায় যাতায়াতে অশ্বিনীকুমারের তিন দিন লাগিয়াছিল। জলগাঁও ষ্টেশনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি সস্ত্রীক নাসিকে আগমন করেন। এখানে পুণ্য-সলিলা গোদাবরী নদীতে স্নান করিয়া অশ্বিনীকুমার পরম প্রীতি লাভ করিতেন। নাসিকে বেদ ও অপর বিবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে তিনি এমন বিভোর হইয়া থাকিতেন যে, অনেক সময়ে স্নানাহারের কথাও মনে থাকিত না। এই ভাবে আট মাসকাল নাসিকে তিনি অধ্যয়নসুখে অতিবাহিত করিয়াছেন।

নাসিক হইতে অশ্বিনীকুমার চারিদিনের নিমিত্ত বোম্বাই নগর গমন করেন। সেখানে তাঁহার পত্নীকে লইয়া এলিফেণ্টা গুহার শিল্পশোভা দর্শন করেন। এই সময়ে গোপালচাঁদ ও মাঞ্চুভাই নামক দুই সহোদর ভক্তের মত অশ্বিনীকুমারের সেবা করিতেন। তাঁহার যখন যেখানে যাইবার ইচ্ছা হইত উহারা

তখনই তাহাদের মোটরে করিয়া অশ্বিনীকুমারকে সেইখানে লইয়া যাইতেন।

এখান হইতে তিনি পরলোকগত মহামতি তিলককে দেখিবার জন্য পুণানগরে গমন করেন। সেখানে তিলক মহারাজ, গোখ্‌লে ও কেল্‌কারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল।

পুণা হইতে বোম্বাই নগরে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি সমুদ্র-পথে প্রভাসে যাত্রা করেন। প্রভাস হিন্দুদের অন্যতম পুণ্যতীর্থ। মহাবীর অর্জ্জুন এখানে যদুবংশীয়দের শ্রাদ্ধ-তর্পণ করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমারও এই তীর্থক্ষেত্রে তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিলেন। প্রভাস হইতে অশ্বিনীকুমার জুনাগড়ে আগমন করেন। এখানে রৈবতক (আধুনিক গীর্ণার) পর্ব্বত। এইস্থানে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহাদের স্মৃতি এই পর্ব্বতটিকে হিন্দুদের নিকট তীর্থ করিয়া রাখিয়াছে।

রৈবতকে দুই দিন দুই রাত্রি বাস করিয়া অশ্বিনীকুমার প্রভাসে প্রত্যাবৃত্ত হন। সেখান হইতে সমুদ্রপথে দ্বারকায় গমন করেন। দ্বারকা ও বেট্ (দ্বীপ) দ্বারকায় তিনি দশ দিন বাস করেন। দ্বীপমধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যস্মৃতি এই স্থানকে মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছে। এখানে বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা মীরাবাঈএর মন্দির আছে। কথিত আছে এখানে মীরাবাঈ

তাঁহার ধ্যেয় দেবতা গিরিধারীলালের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন। মন্দিরে এখনও প্রত্যহ ভক্তিমতী মীরাবাঈ-রচিত সঙ্গীত গীত হইয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই লীলাক্ষেত্রে উক্ত ভক্তিমতী নারীর অন্তর্ধানস্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে।

দ্বারকা হইতে সমুদ্রপথে করাচী আসিবার সময়ে পথিমধ্যে পোরবন্দর। উহাই কৃষ্ণসখা মহাভক্ত সুদামের পুরী। অসুস্থতাপ্রযুক্ত অশ্বিনীকুমার এখানে অবতরণ করেন নাই। করাচীতে আসিয়া তিনি এক ধর্ম্মশালায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। সিন্ধুনদ দর্শনের জন্য তিনি হাইদরাবাদের অদূরবর্ত্তী কট্রী ষ্টেশনে গমন করেন। তখন প্লেগের প্রকোপে হাইদরাবাদ প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল, এইজন্য সেখানে তাঁহাকে নামিতে দেওয়া হয় নাই। কট্রীতে নামিয়া তিনি সিন্ধুনদের পুণ্যসলিলে স্নান করিয়া বিমল সুখ লাভ করিলেন।

অতঃপর অশ্বিনীকুমার জয়সিংহের পুরী জয়পুরে আগমন করিয়া তথাকার সমস্ত দর্শনীয় স্থান দেখিলেন। নগর হইতে ছয় মাইল দূরে যশোহরেশ্বরীর মন্দির রহিয়াছে। অশ্বিনীকুমার তাঁহার পত্নীকে সেখানে লইয়া যান নাই। বাঙ্গালীরা তাহাদের দেবীকে স্বস্থানে রক্ষা করিতে পারেন নাই, জয়পুরের যশোহরেশ্বরীর মন্দিরের সহিত বাঙ্গালীর পরাভবকলঙ্কের এই স্মৃতি রহিয়াছে।

জয়পুর হইতে অশ্বিনীকুমার মথুরা নগরে আগমন করিয়া তথাকার ধর্ম্মশালায় সাত দিন অবস্থান করেন। মথুরায় এক

চিত্রশালিকায় ভূ-গর্ভে প্রাপ্ত প্রাচীনকালের নানাদ্রব্য রক্ষা করা হইয়াছে। অশ্বিনীকুমার শ্রদ্ধাসহকারে ঐ সকল দর্শনীয় বস্তু দেখিয়াছিলেন। মথুরায় থাকিয়াই তিনি রাধাকুণ্ড ও গোকুল দর্শন করিয়াছিলেন। বৃন্দাবনের আধুনিক ও প্রাচীন মন্দির এবং অপর যাবতীয় কীর্ত্তিরাজি সন্দর্শনের জন্য অশ্বিনী-কুমার এই প্রসিদ্ধ তীর্থে ছয় দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। এখানে যমুনায় স্নান করা তাঁহার প্রাত্যহিক আনন্দের ব্যাপার ছিল।

বৃন্দাবন হইতে অশ্বিনীকুমার আগ্রায় আগমন করিয়া তথায় দুই দিন অবস্থান করেন। তিনি তাঁহার পত্নীকে সম্রাট্ সাহজাহানের মহিষী মমতাজের স্মৃতিসৌধ বিশ্ববিশ্রুত তাজ-মহল ও অপর দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখাইয়া মুসলমান গৌরবের সমাধিভূমি দিল্লীনগরে গমন করেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিল্লীনগরে হিন্দু ও মুসলমানদের বহু কীর্ত্তিচিহ্ন অদ্যাপি দেখা যাইয়া থাকে। এই সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিতে অশ্বিনীকুমারের পাঁচ দিন লাগিয়াছিল। এখান হইতে তিনি হিন্দুদের পরমতীর্থ কুরুক্ষেত্রে গমন করিয়া পিতৃপিতামহের শ্রাদ্ধতর্পণ করিলেন। এই ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া হিন্দু-জনসাধারণের নিকট পুণ্যতীর্থ হইয়া রহিয়াছে। ইহার অদূরে থানেশ্বর হিন্দুদের সপ্ত পুণ্যনদীর অন্যতম সরস্বতী এখন বিশুষ্ক ও লুপ্তপ্রায় হইয়া বিরাজ করিতেছে। এখানে এখন আর অবগাহন স্নান করিবার সাধ্য নাই, বালু খুঁড়িয়া

অঞ্জলি পূরিয়া মাথায় জল দিয়া অশ্বিনীকুমার শুচিত্ব লাভ করিলেন। অতঃপর দিল্লী হইতে কাশী ও কলিকাতা হইয়া তিনি বরিশালে প্রত্যাগমন করেন।

এই সময়ে অশ্বিনীকুমার মহাভারত ও বৌদ্ধধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া বৌদ্ধতীর্থ রাজগৃহের সকল তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। ভগবান্ বুদ্ধ কোন্ পাহাড়ে, কোন্ বনে, কোন্ উপবনে, কোন্ জনপদে অবস্থান ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে লিখিয়া লইয়া অশ্বিনীকুমার দুইবার রাজগীরে গমন করিয়াছিলেন। প্রথমবারে তিনি এক সদাশয় মুসলমান দারগার বাড়ীতে সতর দিন, দ্বিতীয়বারে তথাকার ডাকবাঙ্গলায় আঠাশ দিন অবস্থান করেন। অশ্বিনীকুমার সৌখীন ভ্রমণকারী ছিলেন না, তিনি তাঁহার পঠিত ও লিখিত তথ্যের সহিত মিলাইয়া মহাসাধকের পদরেণুপূত স্থানগুলি দেখিবার জন্য উন্মত্তবৎ বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়াইতেন।

রাজগৃহ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি সুদীর্ঘ কাল বরিশালে ছিলেন।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনী সমিতি

কর্ম্মী অশ্বিনীকুমারের পক্ষে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকা অসম্ভব ছিল। বৃদ্ধ বয়সে তিনি বরিশালজিলাবাসীর সেবার জন্য 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনী সমিতি' স্থাপন করেন। তিনি এই

সমিতির সভাপতি বৃত হইয়াছিলেন। এই সমিতির ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অশ্বিনীকুমার তাঁহার মাতার নামে বার্ষিক তিনশত টাকা দান করিয়াছেন। এই সমিতির প্রচেষ্টায় গ্রামে গ্রামে পাঠশালা স্থাপিত হইয়া থাকে। সমিতির প্রচারকগণ গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া লোকসাধারণকে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন। এই সমিতির জন্য অশ্বিনীকুমার তাঁহার ভগ্ন দেহ লইয়া অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। স্বাস্থ্যহীনতার জন্য তাঁহাকে অনেক সময়ে বরিশাল হইতে বহুদূরে স্বাস্থ্যকর স্থানে থাকিতে হইত। সুতরাং সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধাশীল যুবক কর্ম্মীদের উপর নির্ভর করিতে হইত।

এই সমিতির সংশ্রবে তিনি ১৩২৪, ১১ই ভাদ্র, কাশীধামের রাণামহল হইতে ব্রজমোহন কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন—

তোমার দিকে না তাকাইয়া, বাবা, কাহার দিকে তাকাইব? বাস্তবিকই তোমাকে ভরসা করিয়া আছি। খাটিতেছ, আরও খাটিতে হইবে। 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনী'র জন্য তুমি প্রাণপণ না খাটিলে হইবে না। বরিশাল হইতে কেবল নিরাশার ধ্বনি আসিতেছে। অমন জিনিষ মাটি হইতে দিও না। ভেগাইর প্রাপ্য সকল টাকা কি দেওয়া হইয়াছে? তোমার বাড়ী বাড়ী যাইয়া টাকা আদায় করিতে হইবে। চাঁদার হার কমাইয়া ১২৲ টাকা করিয়া, চাঁদাদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সুবিধা হইলে

তাহা কর, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু জাঁকাইয়া তোলো। ললিত তার মজুরিতে নেহাৎ. ব্যস্ত, সময় পায় না। বাবা, তোমাকেই বিশেষভাবে লাগিতে হইবে। বুড়া যেন কাঁদিতে কাঁদিতে না মরে, এদিকে দৃষ্টি রাখিও। আর কি লিখিব? কর্ত্তা তোমাদের বল ও স্ফূর্ত্তি দিন।

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীঅঃ

১৩২৪, ৬ই আশ্বিন, কাশীধাম হইতে আর এক পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন ঃ—

রমেশ, তোমার পত্র পাইয়াছি। তুমি যে "শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনী"র কার্য্যে মন দিয়াছ তাহাতে বড়ই প্রীত হইয়াছি। তুমি চেষ্টা করিলে যথেষ্ট চাঁদা সংগ্রহ করিতে পারিবে। তোমার প্রতি লোকের ভক্তি আছে। কত তুলিতে পারিয়াছ জানাইবে। ললিত এক দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছেন। শরীরটা আজকাল বেজায় মন্দ বলিয়া উত্তর লিখিতে ইচ্ছা হয় না। আশাকরি, শীঘ্রই লিখিব! যাহা ভাল বোধ কর তোমরাই করিবে। বাবাজী, অমন ভাল কাজ আর নাই। আমার টাকা জানুয়ারীর মাঝামাঝি পাইবে। ও টাকাটা পুকুরাদির সাহায্যের জন্য রাখাই ভাল মনে হয়।

এবার পূজায় কোন্‌দিকে যাইবে? গ্রামে গ্রামে 'শিক্ষা ও স্বাস্থ্যবিধায়িনী'র জন্য ঘুরিলে ভাল হয় না? ইহাতে তোমাদের

প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আসিবে। ললিতেরও বাহির হওয়া উচিত।

আছ ত ভাল? অপর অধ্যাপকবন্ধুগণ ভাল আছেন ত?

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীঅঃ

কাশীধামে অশ্বিনীকুমার

ভগ্নস্বাস্থ্য অশ্বিনীকুমার স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত প্রায় দুইবৎসরকাল কাশীধামে বাস করিয়াছিলেন। গঙ্গার উপরে রাণামহলে একখানি বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন। নদীর জল যখন বাড়িত তখন বাটির নিম্নভাগ জলে ডুবিয়া যাইত। অশ্বিনীকুমার নিজের ঘরে বসিয়াই গঙ্গার পবিত্র শোভা দেখিয়া মোহিত হইতেন। গঙ্গায় কত কত মৃত দেহ ভাসিয়া যাইত। তরঙ্গের তালে তালে মৃতদেহগুলি যখন হেলিয়া দুলিয়া ভাসিয়া যাইত,তখন প্রেমিক অশ্বিনীকুমার নাচিতে নাচিতে সহধর্ম্মিণীকে বলিতেন, "আমি মরিলে আমাকেও এমন করিয়া গঙ্গায় ভাসাইয়া দিও, আমিও ঢেউয়ের তালে তালে নাচিতে নাচিতে ভাসিয়া যাইব।" একদা শীতকালের প্রভাত সময়ে 'অশ্বিনী-কুমার রৌদ্রে বসিয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন; তখন সহসা "জয় সীতারাম" ধ্বনি গঙ্গাগর্ভ আলোড়িত করিয়া তুলিল। এক দল হিন্দুস্থানী নৌকায় "জয় সীতারাম" কীর্ত্তন করিতে করিতে গঙ্গা প্রদক্ষিণ করিতেছিল। অশ্বিনীকুমারের সহধর্ম্মিণী এই দৃশ্য দেখিয়া স্বামীকে বলিলেন,—"দেখ, দেখ, গঙ্গায় কি

কাণ্ড হইতেছে!" অশ্বিনীকুমার জানালার পার্শ্বে যাইয়া এই মহোৎসবে যোগদান করিলেন। হিন্দুস্থানীদের প্রাণমাতানো "জয় সীতারাম" কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে অশ্বিনীকুমার নিশ্চল নিস্পন্দ হইলেন, ভাবাবেশে তাঁহার দুই চক্ষু দিয়া দরবিগলিত ধারে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল।

মহাভারতের সূচী

কাশীধামে অবস্থানকালে অশ্বিনীকুমার বেদ ও মহাভারত বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি মহাভারতের একখানি চমৎকার সূচী প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহাভারতে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি নানাবিষয়ক বহু শ্লোক রহিয়াছে। কোন্ অধ্যায়ের কত-সংখ্যক শ্লোকে কোন্ বিষয়ের কি কথা রহিয়াছে অশ্বিনীকুমার অধ্যবসায়সহকারে সেই সকল তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। যাঁহারা বিশেষ কোন বিষয়ের আলোচনা করেন তাঁহারা সেই সূচীপত্র হইতে অনায়াসে কোথায় কোথায় তাঁহাদের জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে তাহা জানিতে পারিবেন, এই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। অশ্বিনীকুমার একখানা খাতায় পেন্সিল দ্বারা এই সমস্ত লিখিয়াছিলেন। পেন্সিলের লেখা অল্পদিন পরে অস্পষ্ট হইয়া যাইবে ভাবিয়া তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত সেবক গণেশকে উহার উপর কালীর দাগ দিতে আদেশ করিয়াছিলেন। গণেশ দুই এক পৃষ্ঠা কালীর দ্বারা লিখিয়াছিল। পরে এক যুবক স্বেচ্ছায় উহা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া দিবার জন্য লইয়া যান। যুবকটি সন্ন্যাসী

হইয়াছেন। অশ্বিনীকুমার তাঁহার জীবদ্দশায় এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্বামীর মৃত্যুর পরে বহু চেষ্টা করিয়াও ঐ খাতাখানি উদ্ধার করিতে পারেন নাই।

কাশী অতি প্রাচীনকাল হইতে মহাতীর্থ বলিয়া সুবিখ্যাত। এই নগরই যাবতীয় ধর্ম্মান্দোলনের মহাকেন্দ্র ছিল। কাশী ও উহার উপকণ্ঠে বহু স্থান ভগবান্ বুদ্ধ, শঙ্কর, কবীর, তুলসীদাস, ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ প্রভৃতি সাধু মহাত্মাদের সাধনার স্মৃতির সহিত বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। যথার্থ জিজ্ঞাসু ভক্তের মত অশ্বিনীকুমার খুঁজিয়া খুঁজিয়া ঐ সকল স্থান দেখিতেন। নগর হইতে দূরে দুর্গম অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি মহাত্মা কবীরের জন্মস্থান দেখিয়াছিলেন। কোথায় কোন্ ভক্ত বাস করিতেন, সাধনা করিতেন তাহা জানিবার জন্য অশ্বিনীকুমারের অসামান্য উৎসাহ ছিল এবং উহার জন্য তিনি ভগ্নদেহেও সকল প্রকার ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কাশীধামের এক বৃদ্ধা অশ্বিনীকুমারের এই উৎসাহ ও শ্রদ্ধা দেখিয়া বিস্মিতা হইয়া বলিয়াছিলেন—"বাবা, এখানে কত লোক আসে, কিন্তু তুমি যেমন খুঁজে খুঁজে তন্ন তন্ন করে সব দেখ্তে, সব জান্তে চাও, এমন আর দ্বিতীয় লোক তো আমার চোখে পড়েনি।"

কাশীধামবাসিনী উক্ত বৃদ্ধার উক্তির যাথার্থ্যে আমাদের মনে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃই অশ্বিনীকুমারের তুল্য অনুসন্ধিৎসু ভ্রমণকারী দুর্ল্লভ। দেশ-ভ্রমণের জন্য কোন ক্লেশ

স্বীকারে তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। যৌবন ও বার্দ্ধক্যে তিনি যতবার জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশনে যোগদান করিতে যাইতেন,ততবারই তিনি সেখান হইতে সেই সেই অঞ্চলের সকল তীর্থ ও দর্শনীয় দৃশ্য দেখিতে গিয়াছেন। মাদ্রাজ কংগ্রেসে যোগদান করিয়া তিনি একবার রামেশ্বর সেতুবন্ধ দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন ঐ অঞ্চলে রেলপথ স্থাপিত হয় নাই। সুতরাং অশ্বিনীকুমারকে কখন গো-শকটে কখন পদব্রজে যাইতে হইয়াছে। একদিন রাত্রিকালে এক গো-যানবাহক গাড়ী হইতে বলদ দুইটি খুলিয়া লইয়া বলিল, আমি এই দুইটিকে বদ্‌লাইয়া অন্য দুইটি লইয়া আসি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া গেল, সে লোক আর ফিরিল না। তখন সেই অরণ্যময় নির্জ্জন স্থানে রাত্রিবাস অসম্ভব বিবেচিত হইল। অশ্বিনীকুমার অনন্যোপায় হইয়া সঙ্গের সমস্ত দ্রব্যের কিয়দংশ স্বয়ং স্কন্ধে করিলেন, বাকী তাঁহার ভৃত্য কুঞ্জ লইল। এমন করিয়া জলকর্দ্দমময় পথ অতিক্রমপূর্ব্বক এক বাটীতে গমন করিয়া একখানি চালাঘরে অনাহারে রাত্রিযাপন করিয়াছিলেন। অশ্বিনীকুমার এইরূপ পথ চলিয়া সেতুবন্ধ রামেশ্বর দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি যখন চিদম্বরের মন্দির দেখিতে গিয়াছিলেন তখন পাণ্ডা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া প্রকাণ্ড মন্দিরের গায়ে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দেখাইতে লাগিল; তিনিও তাহার সঙ্গে ঐ সকল মূর্ত্তির শিল্পনৈপুণ্য দেখিতেছিলেন। দেখা শেষ হইলে তিনি বলিলেন —'ইহা ত দেখিলাম, কিন্তু চিদম্বরম্ কোথায়?' পাণ্ডা উত্তর

করিল—'এই ত চিদম্বরম্।' তিনি বলিলেন—'কখনই না।' প্রধান পাণ্ডা এই বাগ্‌বিতণ্ডা শুনিয়া আসিয়া বলিলেন,—'ক্যা, চিদম্বরম্ দেখোগে ? আও।' মন্দিরের প্রাচীরের গাত্রে একস্থানে একটি পর্দ্দা ছিল, প্রধান পাণ্ডা তাহা সরাইয়া দিলেন, তাহার আড়ালে যে দরজা ছিল, তাহা খুলিয়া দিলেন, দরজার পশ্চাতে একটি ছোট প্রকোষ্ঠ— তাহার দেওয়ালে কালী মাখান, উপরে ছাদ নাই, মুক্ত আকাশ দেখা যাইতেছে, সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—'এহি চিদম্বরম্। আভি দেখা হো ?' তিনি বলিলেন— 'দেখা হুঁ।'

বোম্বাইর সভা

অশ্বিনীকুমার যখন কাশীধামে ছিলেন তখন কলিকাতা হইতে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় তার ও দীর্ঘ পত্রদ্বারা অশ্বিনীকুমারকে বোম্বাই নগরে নিখিলভারতের রাজনীতিজ্ঞদের এক বিশেষ মন্ত্রণাসভায় আহ্বান করেন। অশ্বিনীকুমার তখন অসুস্থ, এইজন্য তাঁহার সহধর্ম্মিণী তাঁহাকে বোম্বাই গমনে বারংবার নিষেধ করিলেন, কিন্তু শরীর অসুস্থ হইলেও অশ্বিনীকুমার দেশের আহ্বান অগ্রাহ্য করা অসঙ্গত মনে করিলেন। তিনি বোম্বাই যাত্রা করিলেন। সেখানে তাঁহাকে কোন কোন দিন রাত্রি দেড় ঘটিকা পর্য্যন্ত পরামর্শ-সভায় থাকিতে হইত। তখন রাত্রে ঘুম হইত না, আহারেও রুচি ছিল না।

রেলওয়ে সংঘর্ষ

বোম্বাই হইতে অশ্বিনীকুমার ট্রেণের এক দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে কাশী আসিতেছিলেন। গাড়ীখানিতে তিনজন যাত্রী ছিলেন। গাড়ীখানি এঞ্জিনের ঠিক পিছনে ছিল। এলাহাবাদে যখন গাড়ীগুলি খুলিয়া পুনরায় সাজান হইয়াছিল তখন অশ্বিনী-কুমারের গাড়ী পিছনের দিকে গার্ডের গাড়ীর কাছে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এই ট্রেণ যখন রাত্রিকালে এলাহাবাদ ছাড়াইয়া কিয়দ্দূরে গমন করে তখন অন্য এক ট্রেণের সহিত সংঘর্ষ হওয়ায় এই ট্রেণের এঞ্জিন ও সম্মুখস্থ কয়েকখানি বগি গাড়ী ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। সেই সংঘর্ষে বহু লোক প্রাণ হারাইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার যে গদির উপর শুইয়াছিলেন উহা স্থানান্তরিত হইয়াছিল কিন্তু তিনি কোনরূপ আঘাত পান নাই, তাঁহার গাড়ীর অন্য দুই যাত্রী সামান্যরূপে আহত হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় ভগবৎ প্রসাদে অশ্বিনীকুমার সম্ভাবিত অপমৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়াছিলেন।

কাশীধামে এই দীর্ঘ দুই বৎসর অবস্থানের মধ্যে অশ্বিনী-কুমার একবার গ্রীষ্মকালে তিনমাসের জন্য হরিদ্বারে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি স্বয়ংজ্যোতিঃ মহারাজ নামক এক সাধুকে বারংবার দেখিতে যাইতেন। এখানে পঞ্জাবের জনসাধারণের ব্যয়ে সাধুদের জন্য কতগুলি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার সময়ে সাধুরা এখানে আসিয়া বাস করেন। স্বয়ংজ্যোতিঃ মহারাজ এই সাধুনিবাসের একটি ঘরে

থাকিতেন। তিনি স্বল্পভাষী। আগন্তুকদের সহিত প্রায়ই কোন কথা বলেন না। সৌম্যমূর্ত্তি ভক্ত অশ্বিনীকুমারকে দেখিয়া সাধুর হৃদয়ে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি অশ্বিনীকুমারকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"আপকো সাথ য্যাছা মহব্বতি লাগ্‌গিয়া য়্যাসা কভি নেহি ভায়া—"

দুইবৎসর কাশীবাসের পরে অশ্বিনীকুমার বরিশালে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রায় তিন বৎসর কাল বরিশালে ছিলেন। ইহার কিছু পূর্ব্ব হইতে তাঁহার অনুরাগী সেবক গণেশ এবং এই সময় হইতে বিশ্বস্ত পাচক অর্জ্জুন পাণ্ডা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাকে শ্রদ্ধাসহকারে সেবা করিয়াছিল।

দরিদ্রনারায়ণের সেবা

১৯১৯ অব্দে প্রবল ঝটিকায় বরিশাল জিলাবাসী সহস্র সহস্র নরনারী অকস্মাৎ গৃহহীন ও নিরন্ন হইয়া পড়ে। যে মুহূর্ত্তে এই সেবার আহ্বান উপস্থিত হইল তৎক্ষণাৎ ভগ্নদেহ বৃদ্ধ অশ্বিনীকুমার দরিদ্রনারায়ণের সেবার নিমিত্ত ভিক্ষাপাত্র হস্তে বাহির হইলেন। তিনি তাঁহার অনুরাগী শিষ্যদের দ্বারা আবশ্যক মত কেন্দ্র স্থাপন করিয়া সাহায্য বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহ্বানে পঞ্জাব, বোম্বাই, আহম্মদাবাদ প্রভৃতি নানাস্থল হইতে বহু অর্থ ও বস্ত্রাদি আসিয়াছিল।

অসহযোগ আন্দোলন

অশ্বিনীকুমারের মনে স্বদেশের গৌরবময় ভবিষ্যৎ সর্ব্বদা

জ্বল্ জ্বল্ করিত। আদর্শের অনুসরণে পশ্চাৎপদ হইয়া তিনি কদাচ নিন্দিত হন নাই। ১৯২০ অব্দে যখন কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির বিশেষ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধির পরিকল্পিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন অনেকেই ঐ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। অশ্বিনীকুমারের বলিষ্ঠ মন সেই প্রস্তাবে আনন্দিত হইয়াছিল। তখন অশ্বিনীকুমারের কার্য্য করিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু তিনি অসহযোগ আন্দোলন সর্ব্বতোভাবে অনুমোদন করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়ে বরিশালজিলাবাসী এই আন্দোলনে সাড়া দিয়াছিল।

এই সময়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশপ্রসঙ্গ লইয়া বঙ্গে নেতৃবর্গের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ ঘটিয়াছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিশেষ কংগ্রেসের পরিগৃহীত প্রস্তাব লঙ্ঘন করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের অভিলাষী হইয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের ভবনে নেতৃবর্গের এক সভা হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই সভায় রোগশয্যাশায়ী অশ্বিনীকুমারকে কোনরূপে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। নেতাদের সকলেই তাঁহার অভিমত জানিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অশ্বিনীকুমার দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—"জাতীয় মহাসমিতিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে আপনাদিগকে সেই প্রস্তাব মানিতেই হইবে।" তাঁহার এই অভিমত বঙ্গীয় নেতৃবর্গ মানিয়া লইলেন। এইজন্য সেই বৎসর বঙ্গের স্বরাজ্যদল ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের কোনরূপ চেষ্টা

করেন নাই। এই প্রসঙ্গে আমরা পাঠকদিগকে ইহা জানাইতে চাই যে, রাজনীতিক্ষেত্রে অশ্বিনীকুমার চিরদিন জাতীয় মহাসমিতিকে মানিয়া চলিয়াছেন। তিনি কংগ্রেস্‌কে 'তিনদিনের তামাসা' বলিয়া বর্ণনা করিলেও ইহা জানিতেন যে, ভাল হউক, মন্দ হউক, জাতীয় মহাসমিতিই নিখিল ভারতবাসীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য স্বদেশী প্রতিষ্ঠান।

বরিশালে প্রাদেশিক সমিতি

১৯০৬ অব্দে যখন নিখিল বঙ্গ স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গে আন্দোলিত হইয়াছিল তখন বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে যে অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়াছিল আমরা পূর্ব্বেই তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছি। ১৯২১ অব্দে যখন চারিদিকে অসহযোগ আন্দোলনের জয়ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছিল সেই উত্তেজনার মধ্যে ইষ্টারের ছুটীতে বরিশালে আবার প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হয়। এবারও ভগ্নদেহ অশ্বিনীকুমারকে অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি করা হইল। কিন্তু তাঁহার অবস্থা কি? তিনি প্রায় তিনমাস পূর্ব্বে স্বাস্থ্যোন্নতির নিমিত্ত পুরীধামে গমন করিয়াছিলেন। তিনি যখন সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহাকেই অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি করা হইয়াছে তখন স্বীয় ভগ্নস্বাস্থ্যের বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া বরিশালে কর্ম্মকর্ত্তাদিগকে জানাইলেন—"তোমরা যদি আমাকে বাদ দিয়া কাজ চালাইতে পার তাহা হইলে আমি কিছুকাল ভুবনেশ্বরে বাস করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতে পারিব বলিয়া আশা করি।" কিন্তু

নিষ্কৃতি পাওয়া গেলনা। বরিশালের নেতৃবর্গ জানাইলেন—"আপনাকে বরিশালে আসিতেই হইবে।" অগত্যা অশ্বিনীকুমার তাঁহার ভগ্নদেহটা কোনরূপে বহন করিয়া বরিশালে লইয়া আসিলেন। অভিভাষণ লিখিলেন, কিন্তু সভাস্থলে উহা পাঠ করিবার মত শক্তি তাঁহার ছিল না। তাঁহার পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল উহা পাঠ করেন। এই সভায় অত্যুগ্র মতবিরোধ ও মহা উত্তেজনা দৃষ্ট হইয়াছিল।

মনীষী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই সমিতির সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি তখনকার সাময়িক উত্তেজনার ঊর্দ্ধে উঠিয়া সারগর্ভ বক্তৃতায় স্বীয় দূরদর্শন ও রাজনীতিক অভিজ্ঞতার অমোঘ পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্রজমোহন বিদ্যালয়

এই সময়ে অশ্বিনীকুমার বরিশালবাসী জনসাধারণের অনুরোধে ব্রজমোহন স্কুল জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করেন।

ষ্টীমার কোম্পানীর ধর্ম্মঘট

চা-বাগানের কুলীদের প্রতি অত্যাচার হেতু পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম রেলওয়ে ও ষ্টীমারে ধর্ম্মঘট এই সময়ে হয়। বরিশালের ধর্ম্মঘটকারীরা অশ্বিনীকুমারকে তাহাদের পরামর্শসভার সভাপতি বরণ করেন। কিন্তু অশ্বিনীকুমার এমন অসুস্থ

ছিলেন যে, আত্মশক্তিতে তিনি দুই প'াও চলিতে পারিতেন না। তথাপি ধর্ম্মঘটকারীরা তাঁহার গৃহের সম্মুখে সমবেত হইতেন। তখন দুইজনে ধরিয়া অশ্বিনীকুমারকে বারাণ্ডায় লইয়া আসিত। তিনি ঐ দুইজনকে অবলম্বন করিয়া কোনরূপে দণ্ডায়মান হইয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে ধর্ম্মঘটকারীদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

কঠিন রোগ

অকস্মাৎ ভগ্নদেহ অশ্বিনীকুমারের রোগের প্রকোপ আবার বর্দ্ধিত হইল। যাহা আহার করিতেন তাহা তৎক্ষণাৎ বমন হইত। বুকে পিঠে এমন একটা বেদনা হইল যে, শ্বাসত্যাগে ক্লেশ বোধ করিতেন। বিছানায় গা দিতে পারিতেন না। চারিদিকে বালিশ সাজাইয়া বসিয়া থাকিতেন। এই ভাবে চারিমাস কাল তিনি দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। ডাক্তার তারিণীকুমার গুপ্ত প্রমুখ বরিশালের সুবিজ্ঞ চিকিৎসকগণ শত চেষ্টা করিয়াও রোগ উপশম করিতে পারিতেছিলেন না। সরকারী ডাক্তার বিপিনবাবুর চেষ্টায় রোগের উগ্রতা একটু হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু সকলেই মনে করিতেছিলেন, 'এ যাত্রা আর অশ্বিনীকুমারকে বাঁচান যাইবেনা।' তখন কলিকাতায় ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ রায়কে তারযোগে সংবাদ দেওয়া হয়। তিনি আট দিন বরিশালে থাকিয়া অহোরাত্র পরিশ্রমের ফলে অশ্বিনীকুমারকে অনেকটা সুস্থ করিয়াছিলেন। এই সময়ে মহাত্মা গান্ধি বরিশালে গমন

করিয়াছিলেন। তিনি রোগশয্যাশায়ী অশ্বিনীকুমারের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

স্ত্রীশিক্ষা

মৃত্যুর কবল হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া অশ্বিনীকুমার যখন একটু সুস্থ হইলেন তখন তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সুকুমার দত্তের পত্নী শ্রীমতী সাবিত্রীকে প্রত্যহ সন্ধ্যাবেলা শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটি করিয়া শ্লোক পড়াইতেন। এই অধ্যাপনা ভক্ত অশ্বিনীকুমারের আনন্দের ব্যাপার ছিল। ছাত্রীকে পড়াইবার জন্য অশ্বিনীকুমার এমন উৎকণ্ঠিত হইতেন যে, যথাসময়ে ছাত্রী পড়িতে না আসিলে অশ্বিনীকুমার অস্থির হইয়া উঠিতেন। এইভাবে পূজার পূর্ব্বে কিছুদিন এবং পরে কিছুদিন অধ্যাপনা চলিয়াছিল। পূজার সময়ে কিছুদিন তিনি বাটাজোড়ে ছিলেন।

ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিয়া যাহাতে নারীদের ধর্ম্মবোধ উজ্জ্বল হয় অশ্বিনীকুমার সর্ব্বান্তঃকরণে তাহা ইচ্ছা করিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া শিক্ষিতা নারীরা পরিবারে পরিবারে অন্তঃপুরিকাদের সমীপে ধর্ম্মপ্রচার করেন, অশ্বিনীকুমারের ইহা আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই নিমিত্ত তিনি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, ভ্রাতুষ্পুত্রের পত্নী ও এক ভাগিনেয়ীকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন।

কলিকাতায় আগমন

মৃত্যুর একবৎসর তিনমাস পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমারকে চিকিৎসার্থ কলিকাতা নগরে আনয়ন করা হয়। আসিবার দিন পূর্ব্বাহ্নে

অশ্বিনীকুমার অসুস্থ দেহে তাঁহার সেবক গণেশকে লইয়া গাড়ী করিয়া বাহির হইয়াছিলেন। বরিশাল হইতে চিরবিদায়ের দিন তিনি তাঁহার পিতৃব্য ৺নবীনচন্দ্র রায় মহাশয়ের পত্নী, শ্রদ্ধেয় কালীমোহন দাস এবং রোগশয্যাশায়ী উকীল অমৃতলাল গঙ্গোপাধ্যায় এই তিনজনের সহিত দেখা করিয়া তাঁহাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়া আসিয়াছিলেন।

ষ্টীমারে উঠিবার সময়ে সকলে তাঁহাকে খাটিয়ায় করিয়া উঠান সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া উঠান হইল। উহার ফলে তখন তিনি এমন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, অনেকে আকস্মিক মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। যাহা হউক ধীরে ধীরে তাঁহার অবসাদ কাটিয়া গেল।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি কিছুদিন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে ছিলেন। সেখান হইতে তিনি তাঁহার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীযুত গুণদাচরণ সেন মহাশয়ের বাড়ীতে গমন করিয়া প্রায় তিনমাস-কাল তথায় বাস করেন। এইখানে একদিন পড়িয়া যাইয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত এমনভাবে অসাড় হইয়া যায় যে, ইহার পরে আর তিনি স্পষ্ট করিয়া নিজের নামটি পর্য্যন্ত লিখিতে পারিতেন না। এই সময়ে তাঁহার বাক্যের জড়তা আসিল এবং বিস্মৃতির জন্য কখন কখন কোন কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া উহা শেষ

করিতে পারিতেন না। কৌতুকী অশ্বিনীকুমার নিজের ভ্রমে নিজেই কৌতুক বোধ করিতেন। তিনি বলিতেন, "আমার ভক্তিযোগ গেছে, কর্ম্মযোগও সারা, এখন হচ্ছে গোলযোগের পালা।"

মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পূর্ব্বে অশ্বিনীকুমার ভবানীপুরের ৫৯ সংখ্যক চক্রবেড়ে রোড্ বাড়ীতে আসিলেন। আত্মীয়-স্বজন ও অভ্যাগত বন্ধুদের সমাগমে এই ভবন ধর্ম্মশালায় পরিণত হইয়াছিল। রোগশয্যাশায়ী অশ্বিনীকুমারকে দেখিবার জন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যর প্রভাসচন্দ্র মিত্র,স্যর আশুতোষ চৌধুরী, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, বারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত প্যাটেল, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও হাকিম আজমল খাঁ প্রমুখ বহু দেশহিতৈষী ব্যক্তি তাঁহার ভবনে আগমন করিয়াছিলেন। ধূপ যেমন আপনাকে দহন করিয়া গন্ধ বিতরণ করে অশ্বিনীকুমার তেমনি একটু একটু করিয়া আপনাকে সর্ব্বতোভাবে দেশের কাজে দান করিয়াছেন। অবশেষে ১৯২৩ অব্দের ৭ই নবেম্বর ৬৮ বৎসর বয়সে ভক্ত ও কর্ম্মী অশ্বিনীকুমারের জীবন-প্রদীপ চিরনির্ব্বাপিত হইল।

এই ভগবদ্‌ভক্ত যেমন জীবনে তেমন তাঁহার মৃত্যুতেও কিরূপ ভাগবত লীলা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সুকুমার দত্ত ভক্ত অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর বিবরণ নিম্নলিখিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

"আনন্দ ছিল তাঁহার জীবনের মূলসূত্র। মৃত্যুশয্যায় ও শ্মশানযাত্রায় সেই সূত্রই চলিয়াছিল। ২১এ কার্ত্তিক, বুধবার, কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। শনিবার দ্বিপ্রহরে একা শুইয়া অনবরত হাততালি দিতেছিলেন। আমার দিদি কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি হাততালি দিতেছেন কেন ?" তিনি অস্ফুটস্বরে উত্তর করিলেন—'কি জানি কেন আমার বড়ই স্ফূর্ত্তি লাগিতেছে। তুই আমাকে একটু দাঁড় করাইয়া দিতে পারিস্? আমি একটু নাচি, আমার বড়ই স্ফূর্ত্তি বোধ হইতেছে।' তাঁহার তখন বসিবার শক্তিও ছিল না। বারংবার তিনি আনন্দের আবেগে দাঁড়াইয়া নাচিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। দিদি তাঁহাকে একবার চটিজুতা পায় পরাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া আবার খুলিয়া রাখিলেন। তখন দুই পা ভয়ানক ফুলা, জুতা পায় লাগিল না। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—"জানিস্, দুপুর দু'টা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত কে যেন আমার বুকের উপর ক্রমাগত নাচিতে থাকে, আমার বুকটা ক্রমাগত তালে তালে নাচে, আমি নাচিতে চাই পারি না।" এই তাঁহার শেষ কথা। পিসিমার মুখে শুনিয়াছি সোমবার দিনও নাকি দুপুর বেলা ঐ রকম হাততালি দিতেছিলেন এবং একটু একটু হাসিতেছিলেন। মঙ্গলবার দিন রাত্রে একবার হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন—"এবার আর বাঁচা গেল না।" বুধবার অপরাহ্ন তিনটা বাজিবার পাঁচ মিনিট থাকিতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগের মিনিট পাঁচেক পূর্ব্বে ডান দিকে পাশ

ফিরিয়া পূর্ব্বমুখী হইয়া পাশ বালিশ কোলে লইয়া খুব আরামে যেন শয়ন করিলেন। একবার সমস্ত চক্ষু দুইটি মেলিয়া পূব আকাশের দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া নয়ন মুদ্রিত করিলেন। আর চক্ষু খুলেন নাই, সেই ভাবেই প্রাণবায়ু নির্গত হইল।

তাঁহার কোষ্ঠিতে গঙ্গাতীরে শেষ অবস্থান লেখা ছিল। তিনি মাঝে মাঝে ঐ কথা বলিতেন। একবৎসর পূর্ব্বে তিনি কাশী যাইবার জন্য অস্থির হইয়াছিলেন। 'ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় উপদেশ দিলে কাশী লইয়া যাইব' এই আশ্বাস দিয়া গত বৎসর (১৩২৯) তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসি। ডাক্তার সরকার তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় রাখিয়া দিলেন। মাঝে মাঝে কিছু সুস্থ হইলে কাশী বা পুরী যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। আমি নানা ছলছুতা করিয়া থামাইয়া রাখিতাম। সে যাহা হউক, গঙ্গাতীরেই তাঁহার শেষ অবস্থান হইল। কালীঘাটের কেওড়াতলা মহাশ্মশানের প্রাচীরের বাহিরে আদিগঙ্গার পবিত্র স্রোত-ধারার মাত্র দশ বারো হাত দূরে একটি 'রেইনট্রি' গাছের তলায় তাঁহার দেহের ভস্মাবশেষ রহিয়াছে।

যিনি সারা জীবন 'স্ফূর্ত্তি' মন্ত্রের উপাসক ছিলেন, তাঁহার জীবনের অবসানও ঘটিল বাজি-বাজনা ও দেওয়ালির উৎসব আমোদের মধ্যে। বুধবার দিন রাত্রি বারোটার পরে অমাবস্যা তিথি—কালীপূজা। রাত্রি আট ঘটিকার সময় যখন বিরাট্ শোভাযাত্রা করিয়া তাঁহার ত্যক্ত দেহ বহন করিয়া গঙ্গাতীরের

দিকে লইয়া চলিলাম তখন আলোর মালায় কলিকাতার রাজ-পথগুলি আলোকিত হইয়াছে। চারিদিকে নানা রংএর পতাকা ও পত্রপুষ্পের সজ্জা। কেওড়াতলার শ্মশান পত্র-পুষ্পের পতাকায় সুসজ্জিত। আমরা প্রবেশদ্বারের নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র উপরে নহবৎ বাজিয়া উঠিল, বাজি-বাজনায় সমস্ত শ্মশান-ভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল, উৎসবের সোর-গোল পড়িয়া গেল। মৃত্যুশয্যায় ও শ্মশানে তিনি তাঁহার গানের যথার্থতা দেখাইলেন—

যখন আস্‌বে সময় যাবে বেলা,
ফুরাবে এই ভবের খেলা,

ডুবে যাব হাসির মাঝে, ধিন্ ধিন্ ধিন্ তাই তাই।

লীলাময়ের এই বিশ্বময় হাসির মধ্যে "ধিন্ ধিন্ ধিন্ তাই তাই" করিতে করিতে তিনি ডুবিয়া গিয়াছেন। আর যিনি জনসাধারণের প্রাণের প্রাণ ছিলেন, মুচিমেথর-চণ্ডাল জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকে যিনি কোল দিতেন, সেই জনসঙ্ঘের নেতা গণতন্ত্রের সাধক, সকল কথার সার কথা, তাঁহার প্রাণের কথা বলিয়া গিয়াছেন—

সবার সঙ্গে নাচা গাওয়া ভিন্ন পন্থা নাই।"

অশ্বিনীকুমারের দেহ তাঁহার প্রিয় কর্ম্মভূমি বরিশালে লইয়া যাওয়ার অভিপ্রায় কোন কোন বন্ধু ব্যক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাহা হয় নাই। অশ্বিনীকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র

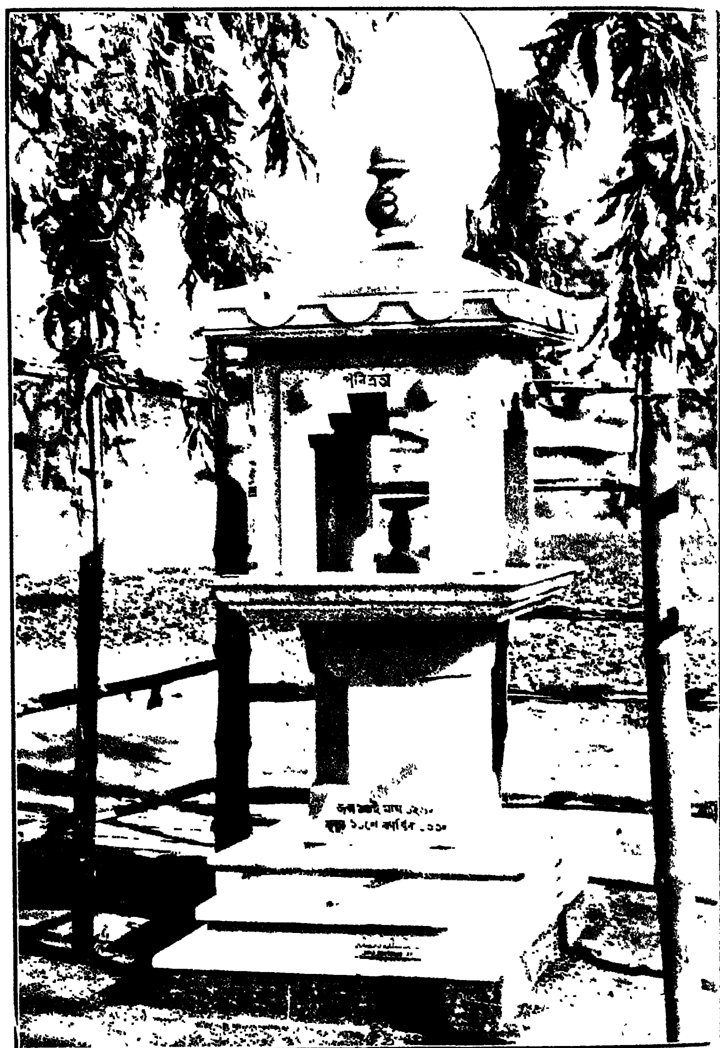
শ্রীমান্ সরলকুমার এই সময়ে এক পত্রে বরিশালে কোন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন—

"জ্যেঠামহাশয় গঙ্গাতীরে তাঁহার দেহ রক্ষা করিতে বলিতেন। বড় মারও (অশ্বিনীকুমারের পত্নী) সেই ইচ্ছা। আমি তবুও বরিশাল লইয়া যাওয়ার জন্য 'তাল' করিতেছিলাম। বড় মা এত অস্থির ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, ডাক্তারেরা তাঁহাকে অভুক্ত অবস্থায় বরিশাল লইয়া যাওয়া আশঙ্কাজনক মনে করেন। বাড়ীতে সকলেই পরশু রাত্রিতে খাওয়ার পরে আজ দশটায় খাইয়াছে। গতকল্য সমস্ত দিন ও রাত্রি কেহ জলস্পর্শও করে নাই। রেলে মৃতদেহ লইয়া যাওয়ার অনুমতি যখন আসে তখন রাত্রি আটটা। ৺কালীপূজায় সকল স্থান বন্ধ থাকায় মিস্ত্রী পাওয়া যায় নাই। বাক্স তৈয়ার করা সম্ভব হয় নাই। কাজেই সাড়ে নয়টায় রওনা হইতে কিছুতেই পারা যায় নাই।

বরিশালের জন্য চিতাভস্ম, শবদেহ হইতে ফুল, মাথায় দেওয়া একটা বালিশ লইয়া আসিতেছি। সোমবার আমরা রওয়ানা হইব। মঙ্গলবার পঁহুছিব।"

বরিশালবাসী জনমণ্ডলী তাঁহাদের হৃদয়ের রাজা, নয়নের মণি অশ্বিনীকুমারের মৃতদেহ দর্শন করিবার সৌভাগ্যসুখে বঞ্চিত হইল। তাহারা হৃদয়-গলা অশ্রুর দ্বারা তাঁহার তর্পণ করিল। দেহভস্ম লইয়া শোভাযাত্রা করিয়া বরিশালবাসী জনমণ্ডলী মনের ক্ষোভ নিবারণ করিল। সমগ্র নগর শোকের

গভীর অন্ধকারে নিমজ্জিত হইল। যে কিরীট শিরে ধারণ করিয়া বরিশাল গৌরবান্বিত হইয়াছিল, এতদিনে তাঁহার মস্তক হইতে সেই কিরীট খসিয়া পড়িল। মানুষ চলিয়া যায়, থাকে তাঁর স্মৃতি। অশ্বিনীকুমার চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মহৎ-জীবনের স্মৃতি রহিয়াছে। বরিশাল এই স্মৃতির উজ্জ্বল প্রভায় মণ্ডিত থাকিবে।



কালীঘাটে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে

স্মৃতি-স্তম্ভ

একাদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৯২৩ অব্দের ৭ই নবেম্বর দেশপূজ্য মহাত্মা অশ্বিনীকুমার কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে ৫৯নং চক্রবেড়ে রোডে প্রাণত্যাগ করেন। কলিকাতা নগরের সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই পূতচরিত্র মহাত্মাকে শেষবার দেখিবার জন্য কেওড়াতলার মহাশ্মশানে ছুটিয়া গিয়াছিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ-প্রমুখ বহুবিশিষ্ট ব্যক্তি ও শত শত নরনারী শ্মশানে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের পদস্পর্শ করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করিয়াছিলেন

এই সময়ে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনপূর্ব্বক বিবিধ সংবাদপত্রে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল নিম্নে তন্মধ্যে কয়েকটি লেখা সঙ্কলিত হইল—

Aswini Kumar Dutt whose death we have to chronicle with unspeakable sadness of heart,had no peer in the whole of Bengal in the higher qualities of man. His soul was like a star that shone apart but his heart was so near to man that he won the confidence and the affectiou of all who came into contact with him. It is hardly possible to exaggerate the influence of his teachings and the example of his life on the present generation of his countrymen. In all Bengal his personality was

the centre that radiated far and wide the spirit of service and truth. To him gravitated the yearning and loving hearts of a generation of men, young and old, for light and lead. No name was held in more reverence and none was more associated with all that is great, noble and uplifting. He was not a Sanyasi as ordinarily understood, but no Sanyasi had made self-abnegation the rule of his life to the extent that Aswini Kumar did. He was not a saint, but no saint had ever shed about him a holier light than Aswini Kumar. He was no politician, but none had exercised so potent an influence to spiritualise politics as he did.

He was the very embodiment of truth and sincerity and his religious fervour exercised an influence far beyond the bounds of his province. His immortal book *Bhaktiyoge* (The Path to Devotion) which has passed through many editions and has been translated into English, has moulded the life of countless men and women.

His great organising powers found magnificent expression in the field of social service. The distress of humanity had an irresistible call on his heart. Undeterred by any difficulty he would rush to the rescue.

A recluse by temperament, who shunned publicity like poison, he had never failed to respond to the call of his country when the country required his services for the furtherance of any movement for the assertion of national honour or the battle for national freedom.

Thus the anti-Partition agitation found in him a staunch champion of the people's cause and fearless fighter. He was deported under Regulaton III of 1818 for his activities. Yet again when the Non-co-operation movement was inaugurated, stricken as he was by serious illness, he gave his blessings to it and regretted that he could do no more. We do not know when, if ever, the void caused by his death will ever be filled. But the memory of his great life will ever be the pole-star to the nation to guide it in the path of truth and righteousness.

…(*The Fordard, 8—11—1923.*)

It there was a public man and politician of whom it could be said that he was of "soul sincere—in action faithful, and in houour clear ; who broke no promise, served no private end, who gained no title and who lost no friend", he was Babu Aswini Kumar Dutt of Barisal, whose mortal frame was put on the funeral pyre in Calcutta on Wednesday last. Not many are the names in the more recent history of this province which are more revered than that of Babu Aswini Kumar ; and we atleast know of not many who have equalled him in quiet, unostentatious solid work for the uplift of the people. His name had,for long, been a household-word in his own district ; and it became a household-word in Bengal at the time of the Partition and Swadeshi agitation. Smarting under a grievous wrong, Bengal declared the boycott of British goods in one united voice, and Aswini Kumar threw himself into the work at once. How he carried out the boycott almost

to perfection in his district in the face of tremendous difficulties, and in spite of ill-health, was at that time the one talk of the people of Bengal. He put super-human energies for the accomplishment of the will of Bengal and his efforts were crowned with success. There was a time when it was difficult to find one piece of '*Bilati*' cloth in his district. His achievement made him the observed of all observers, and the most admired of all the admired workers of his province. But Barisal soon became an eye-sore of the Government and this led him to an unknown gaol in 1909, Such is the abnormality of the circumstances under which we live that his very virtues were turned against him. His powers of organisation were looked upon with distrust, and his school, which had extorted the admiration of a host of English officials, was believed to be a breeding ground of sedition. "I do not wish to discourage, far less to abolish, an institution of this kind," wrote Sir Andrew Fraser in 1904 of the Brajamohan Iustitution ; but this was exactly the school for whose very existence Babu Aswini Kumar had to struggle hard with the Government of East Bengal in 1906 and 1907. Sir Bamfylde Fuller said of him that he was "not one of those who render to their country lip-services only" ; and Sir Valentine Chirol, (then Mr.), admitted in the columns of the "Times" that there was no ground for deporting him under Bengal Regulation III of 1818.

…(*The Bengalee*, *8—11 1923.*)

India is distinctly poorer to-day by the death of this selfless patriot. He was a tower of strength to the Indian Nationalists who held him in great esteem and reverence. The secret of Aswini Kumar's wonderful popularity in the country lay in his character. Simple and unostentatious he abhorred all sorts of self-advertisement and self-aggrandisement. All his thoughts and cares were directed towards the uplift of his countrymen. His message to his countrymen was the message of love and service. Piety and devotion to duty were the essence of his character. He had the courage of his convictions and never wavered or faltered in the pursuit of what he regarded as his duty. He devoted all his wealth and learning to the service of humanity.

Babu Aswini Kumar held a unique position among the Nationalists of the country. The people of Barisal, rich or poor, hung on his words ; such indeed was the magic power of his unselfish character. The death of Babu Aswini Kumar Datta is an irreparable loss to the country and to the cause of Indian nationalism and "Swaraj" of which he was justly regarded as a high priest.

...(*The Amrita Bazar Patrika, 8—11—1923.*)

The bitter agitation over the Bengal Partition of 1905 is recalled by news, received by mail, of the death of Mr. Aswini Kumar Dutt of Bengal, one of the leading protagonists in the conflict, at the age of 68.

A leading Congressman, a social organiser, a scholar

and author of several religious works, Mr. Dutt threw all discretion to the winds in his hatred of the separation of Eastern Bengal from the rest of the province and nowhere in the new provincial area did the flames of anger rise higher than at Barisal under his leadership.

Lord Morley, then at the India Office, found it most distasteful to sanction in December 1908 the application to this scholarly man and eight other Bengal leaders of the Regulation of 1818, authorising deportation, without trial for reasons of State······

···(*The Times, London, 27—11—1923.*)

Mr. Aswini Kumar Dutt of Barisal, a distinguished Nationalist leader of Bengal, died at Calcutta at the age of 68. He was a staunch Congressman, President of the Dacca Provincial Conference and Chairman of the Reception Committee at the Barisal Provincial Conference in 1906, when he headed the procession which was dispersed by the police. He took a prominent part in the Bengal Partition and Swadeshi agitation and was deported in 1909 with eight other Bengali leaders. He was a great social organiser, 'a scholar and the author of several religious and philosophical works. His cremation was attended by a large unmber of leading Moderates and Nationalists.

···(*The Times of India, Bombay, 10—11—1923.*)

In the death of Babu Aswini Kumar Dutt Bengal has lost one of its most prominent sons. Though latterly he had been living in retirement, owing chiefly

to ill-health and old age, Babu Aswini Kumar's services to the Province will not easily be forgotten by his countrymen. He took a leading part in the anti-Partition and Swadeshi agitation and he obtained such a hold over Barisal that the Government deported him in 1909 under Reg. III of 1818. His organising powers were wonderful as even the head of the province, was obliged to confess, when the latter visited the district and found that he could not have a coolie to carry his baggage or obtain a grain of salt without the sanction of Aswini Babu. He organised a net-work of "Seva Samitis" or bands of volunteers to render help to the poor and the suffering in the district. He was unassuming in his nature and was the idol of the younger generation. He founded the Brij [aja ?] Mohan College in Barisal in memory of his father. Though living in retirement, he took keen interest in the Non-co-operation movement and when Mahatma Gandhi visited him three years ago he expressed his fullest confidence in the latter and wished him godspeed in his great undertaking. Bengal—all India is poorer for the loss of such a man.

...(*The Bombay Chronicle, 9—11—1923.*)

We deeply regret to learn that Mr. Aswini Kumar Dutta of Barisal, a distinguined Nationalist leader of Bengal. died on Wednesday afternoon in Calcutta at the age of 68. He was a staunch Congressman who presided at a session of the Bengal Provincial Conference and was Chairman of the Reception Committee at

Barisal Provincial Conference in 1905 when he headed the procession which was dispersed by the Police. He took a prominent part in the Bengal Partition and the Swadeshi agitation and was deported in 1909 with eight other Bengali leaders. He was a great educationist, social organiser, a scholar and author of several religious and philosophical works,…

…(*The Tribune, Lahore, 10—11—1923.*)

Babu Aswini Kumar Datta……became an all-India personality owing to his prominent association with the agitation in connection with the Partition of Bengal……His bent of mind was essentially religious and he had devoted himself to social, religious, philanthropic and educational work, but his great patriotic soul could not resist the call of service of his country in the field of politics when Bengal was overtaken with a great crisis in its national history. In Barisal where he lived his saintly and selfless life had won for him profound respect and admiration and when he joined the lists against the Government, the local administration was paralysed.……One of his religious works written in Bengali, 'Bhaktiyoga', is regarded as his great achievement……He was a source of inspiration to many and in him pass away a genuine patriot, a large-hearted philanthrophist and a true. Servant of God.

…(*The Leader, Allahabad, 15—11—1928.*)

……His life was one of many-sided activities and whether we regard him as an author. social worker,

educationist or public worker, his career entitles him to the grateful remembrance of his countrymen.······ Another direction in which Aswini Babu's beneficent activity manifested itself was his share in raising the Braja Mohan School into a College in 1889 with a band of voluntary workers known as the Little Brothers of the Poor. This fraternity corresponded to the Servants of India Society of Poona.······In fact it is no exaggeration to say that the Braja Mohan Collgge under Mr. Dutt's guidance stood for the students population of Bengal as the Fergussan College of poona under the leadership of Mr. Ranade, Mr. Gokhale, Mr. Tilak, Mr. Agarkar, M.r Paranjype and others to the public of Western Presidency.

Mr. Dutt was an ardent Temperance Reformer.······ In Barisal he was easily the foremost citizen and almost an institution by himself. In fact like Narayan Chandavarkar of Bombay, Aswini Babu identified himself with every philanthropic movement for the betterment of his fellow-countrymen. It is interesting to observe that Mr. Dutt was a practical social reformer for he used to mix freely with the Muhammadans of his Province *as well as the Nomasudras*.......

...(*The United India and Indan States, 1—12—1923.*)

The key to Mr. Aswini Kumar Dutt's success and popularity as a public man is to be found in his unquestioned honesty and sincerity of purpose. In Bengal, the public man must make some sacrifice and not play hide and seek with his policy and principles.

Mr. Dutt not only made sacrifices but was always true to himself in its larger sense. Bengal is very fastidious in this respect and Mr. Dutt fully satisfied her and as a result managed to remain the "uncrowned king of Barisal" till the last……He was by instinct an educationist and it was as a teacher of youth that he wielded a tremendous influence over the student population of his own district. Guru-worship is ingrained in the Bengali youth.

…(*The Indian Datly News, 10—11—1923.*)

—………The greatest achievement in Babu Aswini Kumar's life was the elevation of the general moral tone of the younger generation of his district. His one ambition in life was to send out a number of youngmen from his College who were above all that was mean and dishonourable and he achieved wonderful success in this direction. To-day there are thousands of young men in Bengal who ascribe all that is best in their lives to the influence of their beloved teacher Babu Aswini Kumar Dutt.……

…(*The Statesman, 8—11—1923.*)

The late Babu Aswini Kumar Datta has another title to fame besides that which he obtained as a politician. Quite early in his life he realised the value of an education in English to the young Bengalee of the better classes and abandoning what might have been a great career at the bar, he founded the Braja Mohan Institution at Barisal, the purpose of which was chiefly the teaching of good and correct English to the scholars.

The Institution soon became famous and boys educated at Barisal found that their command of English obtained for them situations and appointments denied to the pupils of more expensive colleges in the big centres like Calcutta.······It is not an exaggeration to say that the disappearance of what is known as "Babu English" from Bengal is chiefly due to Aswini Babu's efforts.······

···(*The Statesman, 9—11—1923.*)

১৩২৯, ২৩এ কার্ত্তিক, শুক্রবারের "দৈনিক বসুমতী" লিখিয়াছেন—অশ্বিনীকুমার যে বাঙ্গালীর নমস্য ছিলেন, সে তিনি বিদ্বান্ বলিয়া নহে, সে তিনি বাগ্মী বলিয়া নহে, সে তিনি সাহিত্যিক বলিয়া নহে, সে তিনি বিদ্যাবিতরণকারী বলিয়া নহে, সে তিনি রাজনীতিক বলিয়া নহে, সে তিনি জনসেবক বলিয়াও নহে। তিনি বাঙ্গালীর নমস্য—তাঁহার চরিত্রের জন্য। তাঁহার সেই চরিত্রই সকল কাজের উৎস ছিল—তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের কর্ম্মশক্তির কেন্দ্র ছিল। যাহা কিছু অসত্য, যাহা কিছু অন্যায়, যাহা কিছু অধর্ম্ম, যাহা কিছু জাতীয় জীবনের প্রতিকূল, তাহাই অশ্বিনীকুমার ঘৃণায় পরিত্যাগ করিয়া সত্য ও ধর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইতেন। তিনি লোকসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া দেশসেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—তাই তাঁহার কাছে আত্মপর ভেদ ছিল না। তাঁহার স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে সকলেরই জন্য স্নেহ সঞ্চিত থাকিত এবং তিনি অকাতরে সকলকে সেই স্নেহ দিতেন। আমাদের মত যাঁহারা কোনদিন তাঁহার সে স্নেহের স্বাদ

পাইয়াছেন, তাঁহারা কখনই তাহা ভুলিতে পারিবেন না। রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সম্বন্ধে দীনবন্ধু যাহা লিখিয়াছিলেন, অশ্বিনীকুমারের সম্বন্ধেও তাহাই বলা যায়—

"একদিন তাঁ'র সাথে করিলে যাপন,
দশদিন ভাল থাকে অবিবেকী মন।"

আজ যখন দেশে আন্তরিকতার একান্ত অভাব লক্ষিত হইতেছে, যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের সংঘর্ষে দলাদলির উৎপত্তি হইয়া জাতীয় সম্মানজ্ঞান ভাসিয়া যাইতেছে, যখন মনোবিবাদের সৃষ্টি করিয়া বঙ্গদেশকে অধঃপতনের পথে টানিয়া লইবার চেষ্টা হইতেছে, তখন অশ্বিনীকুমারের মত প্রকৃত জননায়কের—জ্ঞানসম্পদে সমৃদ্ধ, চরিত্রবলে বলী, বঙ্গমাতার সুসন্তানের তিরোভাব যে বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া শ্রদ্ধেয় 'প্রবাসী'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন—"এক অধিবেশনে, কোথায় মনে পড়িতেছে না—তিনি অনেক স্বদেশভক্তকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের 'নন্দলালের' সহিত তুলনা করিয়া যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা এখনও আমার মনে আছে। *কিন্তু* তিনি 'নন্দলাল' জাতীয় স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন না। এইজন্য তিনি নিজেকে বাঁচাইয়া দেশসেবা, জনসেবা করিতেন না। সেই কারণেই তিনি

নির্ব্বাসিত হন। বিধাতার কোন বিধি কিংবা ব্রিটিশ প্রভুদের কোন আইন লঙ্ঘন করায় তাঁহার নির্ব্বাসন হয় নাই। নির্ব্বাসন হইয়াছিল এইজন্য যে, বরিশালে তাঁহার প্রভাব উচ্চতম রাজকর্ম্মচারীর প্রভাব অপেক্ষা অধিক হইয়াছিল এবং এই প্রভাবের বশে বিস্তর ত্যাগী, সাহসী ও প্রেমিক জনসেবকের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই প্রভাবের একমাত্র কারণ তাঁহার অকপট মানবপ্রেম ও অক্লান্ত জনসেবা।”

১৩৩০, ১লা অগ্রহায়ণ, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির উদ্‌যোগে কলিকাতায় মির্জ্জাপুর পার্কে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণের জন্য এক বিরাট্ জনসভার অধিবেশন হয়। এই সভায় প্রায় সাত সহস্র লোক মহাত্মার স্মৃতিপূজার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী মনীষী শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় এই শ্রাদ্ধবাসরে পরলোকগত মহাত্মার গুণকীর্ত্তন করিয়া একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। তিনি বলিয়াছিলেন—“অশ্বিনীকুমার যথার্থ কর্ম্মযোগী ছিলেন। তাঁহার সমস্ত কর্ম্মোদ্যমের মূলে ছিল ভগবৎপ্রীতি। সেই স্বদেশীর যুগে আমি যখন কারাগার হইতে বাহির হইলাম, যখন সমগ্র দেশ আমার জয়গানে মুখরিত, যখন সর্ব্বত্র আমি সাদরে অভিনন্দিত হইতেছিলাম, তখন একমাত্র অশ্বিনীকুমারই আমাকে সাবধান-বাণী শুনাইয়া ছিলেন। তিনি এক পত্রে লিখিয়াছিলেন—“ভাই, সমস্ত কল-কোলাহলের মধ্যে যাঁহার পায়ে মাথা রাখিয়া অগ্রসর হইয়াছ, যাঁর কৃপায় এই সম্মান লাভ করিতেছ, তাঁহাকে

যেন ভুলিও না।" ইহা হইতে বুঝা যায় অশ্বিনীকুমার যথার্থ কর্ম্মযোগী ছিলেন, প্রতিষ্ঠা বা প্রতিপত্তি তিনি চাহেন নাই।

১৩৩০, ২৩এ কার্ত্তিক, শুক্রবারের 'বরিশাল' পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল—অশ্বিনীকুমার বরিশালের কি এবং বরিশাল অশ্বিনীকুমার কি, সেকথা লিখিয়া বুঝাইবার সাধ্য নাই। অশ্বিনীকুমারের সত্যই বরিশালের যুগান্তব্যাপী তপস্যার ফল। বরিশালের মূর্ত্ত শিক্ষা ও সাধনা। বরিশালের শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, অশ্বিনীকুমার বরিশালের রাজা ছিলেন। বরিশালের সহস্র সহস্র লক্ষ লক্ষ হিন্দুমুসলমানের নিকটে তাঁহার বাক্য শাসনবাক্য বলিয়াই মান্য হইত। সে বাক্যের বিরুদ্ধে চলিবার কাহারও প্রবৃত্তিই জন্মিত না। বাঙ্গলায়, ভারতবর্ষে বরিশালকে সকলেই চিনে, শ্রদ্ধা করে, সম্মান করে, বরিশালকে পুণ্যভূমি বলিয়া ধারণা করে, বরিশালকে জাগ্রত শক্তির উৎস বলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া দেখে, কারণ বরিশাল অশ্বিনীকুমারকে জন্ম দিয়াছিল, বরিশাল অশ্বিনীকুমারের কর্ম্মভূমি হইয়াছিল। বরিশালকে অশ্বিনীকুমার চিনিয়াছিলেন, জানিয়াছিলেন, ভালবাসিয়াছিলেন, পূজা করিয়াছিলেন। তাই অশ্বিনীকুমার বলিলে বরিশাল এবং বরিশাল বলিলে অশ্বিনীকুমারকে বুঝায়। অশ্বিনীকুমার বরিশালের সৃষ্টি এবং বরিশাল অশ্বিনীকুমারের সৃষ্টি। অশ্বিনীকুমার ও বরিশাল অভিন্ন। কাঁদ বরিশাল, যাঁহার নামে তোমার নাম, যাঁহার প্রতিষ্ঠায়

তোমার প্রতিষ্ঠা সেই বরণীয় পুরুষের বিয়োগব্যথায় আজ শেষ কাঁদা কাঁদিয়া লও।

বরিশালের আজ অশৌচ, আজ গুরু-দশা। প্রেত-তর্পণ করিতে হইবে। ছাব্বিশ লক্ষ বরিশালবাসীর আজ পিতৃতর্পণ, গুরুতর্পণ করিতে হইবে। পাঁচ কোটি বাঙ্গালীকে আজ জাতীয় জীবনের প্রধান পুরোহিতের অন্তিম তর্পণ করিতে হইবে। পরলোকগত এই মহাত্মার বরণীয় গুণরাজি স্মরণ ও মনন করিয়া বরিশালবাসী, বঙ্গদেশবাসী, ভারতবাসী নরনারী বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের পথে অগ্রসর হউন।

অশ্বিনীকুমারের তিরোধানদিনে

(পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী)

ধরি ভাগবতী তনু দিব্য দূতবেশে
অশ্বিনীকুমার, এলে এ মরত-দেশে।
বহিয়া আনিলে কত সেরাজ্যসন্দেশ,
আবার অদৃশ্য হ'লে, কে জানে উদ্দেশ ?
"সত্য, প্রেম, পবিত্রতা" পতাকা তোমার,
দিয়ে গেলে কত হাতে করিতে প্রচার।
জ্ঞানগুরুরূপে আসি স্থাপি' বিদ্যালয়,
জাগাইলে মনুষ্যত্ব সুপ্ত দেশময় !
গৃহিবেশে ব্রহ্মচারী তেজে মূর্ত্তিমান্,
নির্লিপ্ত বিষয়ী তুমি ওহে ভাগ্যবান্ !
বিক্রমেতে ছিলে সিংহ, পাপে অগ্নিসম,
সুন্দরের উপাসক স্নিগ্ধ, কান্ত, কম।
নহ ক্ষুদ্র, দীপ্ত রুদ্র, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ,
অন্তরে ছিল না জাতিকুলের বন্ধন।
কবি তুমি, বাগ্মী তুমি, প্রতিভা উজ্জ্বল,
বুদ্ধি, বিদ্যা, বিজ্ঞতায় শুভ্র সুনির্ম্মল।
হ'য়ে ভক্ত, অনুরক্ত ছিলে জ্ঞানে তুমি,
সেবা-ধর্ম্মে, দেশকর্ম্মে তব চিত্তভূমি

কি উদার প্রেমযুক্ত ! নিত্য রসধারা
প্রবাহিত হ'ত সেথা,—রচিয়া ফোয়ারা !
ধরার ধূলির ঊর্দ্ধে ছিল তব বাস,
চাও নাই মিটাইতে বিষয়-পিয়াস।
মরতে মরুর দেশে মুক্ত মহাবীর,
রোগে শোকে অচঞ্চল, কর্ত্তব্যে সুধীর।
আনন্দের উৎস যিনি—যিনি আদি কবি
তাহাতেই সদা স্নিগ্ধ ছিল মুখচ্ছবি।
আনন্দ-সাধক ছিলে মুক্ত মহীয়ান্,
রসিকের চূড়ামণি, প্রেমিক প্রধান।
প্রেমালাপে তব সঙ্গে, রঙ্গে ভঙ্গে, যারা
দুদণ্ড করিত বাস, মেতে যেত তারা।
দেশাচারে অবিচারে এ দেশ মলিন,
রাজনীতি আন্দোলনে আনিলে সুদিন,
জীবনমধ্যাহ্নে বরি' দীর্ঘ নির্ব্বাসন,
নীরবে রচিলে সেথা ধ্যানের আসন।
এনেছিলে বরিশালে নব জাগরণ,—
দুর্নীতির অনাচারে নীতির শাসন।
পাপেরে করিয়া ঘৃণা পাপীরে অভয়
দিয়ে তুলে নিতে সদা,—লভিত আশ্রয়।
সাধু, ভক্ত, জ্ঞানী. কর্ম্মী, সংসারী, সন্ন্যাসী,
কবি, শিল্পী, চিত্রকর, সঙ্গীতবিলাসী,

উজির, ফকির, আর সুবিজ্ঞ, পাগল,
ভিখারী, রাখাল কিংবা কৃষকের দল,
সবারে লইয়া মেলা মিলিত তোমার
বালবৃদ্ধযুবা সবে সঙ্গী অনিবার।
প্রেমেতে ধরিয়া গলা দিতে স্নিগ্ধ কোল,
বদনে উঠিত সাথে 'শিব' 'শিব' বোল।
হাফেজ্, বাইবেল, গীতা, পদকল্পতরু,
ভক্তিশাস্ত্র ব্যাখানিতে ছিলে শ্রেষ্ঠ গুরু।
ভক্ত সঙ্গে নানা ছন্দে প্রেম-সঙ্কীর্ত্তনে,
আত্মহারা মাতোয়ারা দেখেছি নয়নে,
মাতিয়াছি, নাচিয়াছি গাহি কত গান,
তোমারে রাখিয়া মাঝে ভকত-প্রধান!
মধুকরী বৃত্তি নিয়ে এসেছিলে ভবে,
না দিয়ে তোমারে কিছু কে ফিরেছে কবে?
ভ্রমি দেশদেশান্তরে তব সঙ্গে কত
হেরিয়াছি লোভনীয় দৃশ্য মনোমত।
উঠেছি আকাশ-চুম্বী শৃঙ্গে পর্ব্বতের
দেখি' তব ধ্যানমগ্ন শোভা জীবনের
ধ'রেছি উদাত্ত কণ্ঠে সপ্তমেতে গান,
ওঙ্কার-ঝঙ্কারে তুমি পূরাইতে তান।
নর্ম্মদা-যমুনা-গঙ্গা-পূত বারি-স্রোতে,
আনন্দে সাঁতার কত খেলিয়াছি সাথে।

প্রাণে ভাসে অতীতের বিচিত্র কাহিনী,
মন্দির প্রাঙ্গণে কত পোহাল যামিনী।
মহাজনসঙ্গ তরে, তীর্থে তীর্থে কত,
তব সঙ্গ নাহি পেলে হইত না তত
পবিত্র মধুর তাহা, ওহে মহাজন,
গুণগ্রাহী গুণধর পুরুষ-রতন!
রচিলে আনন্দ-গীতি গাহিলে সে গান,
কোন্ চিত্ত করে নৃত্য তোমার সমান?
সর্ব্ব যজ্ঞে বরিশালে তুমি ছিলে হোতা,
একাধারে এত গুণ আর পাব কোথা?
আছে সেই বরিশাল তুমি নাই গুণী,
উৎসাহ আশার বাণী কোথাও না শুনি।
তুমি নাই, আছি তব প্রেম-পুষ্ট ভাই,
কর্ম্মক্ষেত্রে কত বাধা পদে পদে পাই!
জীবন-সন্ধ্যায় আসি আজি উপনীত,
মরণে না ডরি কিংবা না হই শঙ্কিত,
(কিন্তু) ক্ষুব্ধ প্রাণ! কত সাধ হ'ল না পূরণ,
বিরলে করিতে হয় অশ্রুবিসর্জ্জন!
দিব্যলোক হ'তে তুমি কর আশীর্ব্বাদ,
ঘুচুক দেশের দৈন্য অবিদ্যা-প্রমাদ।

অশ্বিনীকুমারের স্মৃতিরক্ষাসমিতি

অশ্বিনীকুমার ভারত-বিখ্যাত দেশসেবক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে বঙ্গদেশের সকল নগরে ও বহু গ্রামে শোকসভার অধিবেশন হইয়াছিল। নিখিলভারতের বহু নগরে জনসভায় ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ এই মহাপ্রেমিক দেশভক্তের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন। ১৯২৩ অব্দের ৭ই নবেম্বর অশ্বিনীকুমারের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটে। মৃত্যুর প্রায় একমাস পরে কলিকাতানগরে ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটে এক মহতী স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহোদয় এই সভায় সভাপতি ছিলেন। বঙ্গের সুবিখ্যাত নেতৃবৃন্দ এই সভায় অশ্বিনীকুমারের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপনপূর্ব্বক স্মৃতিরক্ষার্থ এক সমিতি গঠনের প্রস্তাব করেন। আচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে সভাপতি এবং সুকবি পরলোকগত দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়কে সম্পাদক মনোনয়ন করিয়া একটি সমিতি গঠিত হয়। বঙ্গের বহু বিখ্যাত ব্যক্তি এই সমিতির সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন। নিখিল-ভারতে যাঁহারা জননায়ক বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ তাঁহাদের অনেকেই এই সমিতির সভ্য।

স্মৃতিরক্ষা সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক দেবকুমার বাবু অশ্বিনীকুমারের সোদরপ্রতিম সুহৃদ্ পরলোকগত রাখালচন্দ্র

রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র। অশ্বিনীকুমার তাঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। এই স্মৃতিরক্ষা সমিতির চাঁদা সংগ্রহ এবং অপর সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই দেবকুমার বাবু আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এবং সিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র ঘোষ এই দুইজনের সহকারিতায় দেবকুমার বাবুই সমিতির সংগৃহীত অর্থের অধিকাংশ আদায় করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী, গুণদাচরণ সেন, জিতেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত এই সমিতির কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী।

সমিতির কার্য্য

(১)

বরিশাল সহরের "টাউন্ হল্" অশ্বিনীকুমারের মৃত্যুর পরে বরিশালবাসী জনমণ্ডলীর অভিপ্রায়মতে "অশ্বিনীকুমার টাউন্ হল্" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। "স্মৃতিরক্ষা সমিতি" উক্ত 'টাউন্ হল্' নির্ম্মাণার্থ কতক অর্থ প্রদান করিয়াছেন।

(২)

স্মৃতিরক্ষা সমিতির উদ্যোগে কলিকাতার এল্‌বার্ট্ হলে মহাত্মা অশ্বিনীকুমারের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর তৈলচিত্র স্থাপিত হইয়াছে। উক্ত চিত্রের আবরণ উন্মোচনের সময়ে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্মৃতিরক্ষা সমিতির স্থায়ী সভাপতি আচার্য্য রায় মহাশয়ই সেই দিনের বিরাট্ সভায়

সভাপতি আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সঙ্গীত, উপাসনা এবং অশ্বিনীকুমারের মহচ্চরিত্রের গুণাবলী কীর্ত্তনদ্বারা এই পুণ্যানুষ্ঠান সম্পন্ন করা হইয়াছিল।

(৬)

স্মৃতি-স্তম্ভ

স্মৃতিরক্ষা সমিতির সভ্যগণের প্রচেষ্টায় কালীঘাটে কেওড়াতলা মহাশ্মশানে অশ্বিনীকুমারের চিতার উপরে "সত্য, প্রেম, পবিত্রতা" মন্ত্রাঙ্কিত একটি সুশোভন মর্ম্মর স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে।

এই স্মৃতি-স্তম্ভের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠার দিনে মহাশ্মশানে এক সভার অধিবেশন হয়। সেইদিন সহস্র সহস্র লোকের সমাগমে শ্মশান লোকারণ্যে পরিণত হইয়াছিল। এই পবিত্র কার্য্যের প্রারম্ভে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস মহাশয় সংক্ষেপে একটি উপাসনা করেন। অতঃপর দেশপূজ্য মহাত্মা গান্ধী ভক্ত অশ্বিনীকুমারের চরিত্রের বিশিষ্টতা বর্ণনা করিয়া স্মৃতি-স্তম্ভের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই সভায় দেশনেত্রী শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু সুমধুর বক্তৃতাদ্বারা অশ্বিনীকুমারের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন।

স্মৃতিরক্ষা সমিতির সভ্যগণ কলিকাতার বার্ষিক স্মৃতিসভার অধিবেশনার্থ এবং এল্‌বার্ট্ হলের তৈলচিত্র ও কেওড়াতলা মহাশ্মশানের স্মৃতি-স্তম্ভের আবশ্যকমত সংস্কারের জন্য স্থায়ী ভাণ্ডারের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

সাহিত্যপরিষৎ ভবনে তৈলচিত্র

অশ্বিনীকুমারের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ সুকুমার, সুশীলকুমার, ও সরলকুমার দত্ত তাহাদের পিতৃব্যের একখানি তৈলচিত্র সাহিত্যপরিষৎকর্ত্তৃপক্ষগণের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। পরিষদের পক্ষ হইতে এক সভার অধিবেশনে "ভক্তিযোগ" "কর্ম্মযোগ", "প্রেম" ও "দুর্গোৎসবতত্ত্ব"-প্রণেতা, দেশপূজ্য অশ্বিনীকুমারের তৈলচিত্রের আবরণ উন্মোচিত হইয়াছে। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় ঐ সভায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। সভায় দুইটি কবিতা পঠিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক, সি, আই, ই, রায় জলধর সেন বাহাদুর, যতীন্দ্রনাথ বসু ও সভাপতি মহাশয় অশ্বিনীকুমারের গুণকীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

গ্রন্থকার প্রণীত

আর কয়েকখানি পুস্তক

১।	বৌদ্ধভারত (বৌদ্ধসভ্যতার ধারাবাহিক বিবরণ)	২৲
২।	বুদ্ধের জীবন ও বাণী (৪র্থ সংস্করণ)	১৲
৩।	ভারতীয় সাধক (৩য় সংস্করণ)	১৲
৪।	শিবাজী ও মারাঠা জাতি (৪র্থ সংস্করণ)	৸০
৫।	শিখগুরু ও শিখজাতি (২য় সংস্করণ)	১৷০
৬।	পঞ্চকন্যা (২য় সংস্করণ)	৸০
৭।	বঙ্গগৌরব স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (৪র্থ সংস্করণ)	৷৵০
৮।	চরিত্র (২য় সংস্করণ)	৷৵০

প্রাপ্তিস্থান—
চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্
১৫, কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা